ভৈরবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

Scanned by CamScanner

ফুল তুলছেন আর গুনগুন করে গান গাইছেন।

বড় প্রসন্ন সকাল। ভোরের সূর্য যখন ওঠে তখন যেন আলোর প্লাবন। ঢেউয়ের মতো দিগমণ্ডল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সারারাত ধরে কুঁড়ির ফোটার সাধনা ফুলে এসে চরণ খুঁজে পায়। পাখিদের তো চাকরি করতে হয় না, তাই এত গান। তারা জানে সবকো দাতা রাম। কামারপুকুরে পুরী যাবার পথের ধারে লাহাবাবুদের যাত্রিনিবাসে সময়

Scanned by CamScanner

সময় কত বাঙালি, অবাঙালি সাধুসন্ত আসতেন। কেউ কেউ তুলসীদাসের রামচরিত মানস পড়তেন। সেইখানেই তো শুনেছি, অজগর ন করে নকরি, পন্‌ছি ন করে কাম/দাস মলুককো এই বচন হ্যায়/ সব্‌কি দাতা রাম।।

পশ্চিমে বইছে গঙ্গা তরতর করে। গেরুয়া জলের কোলে নেমে এসেছে গোলাপি আকাশ। উদার, অনন্ত। পাল তুলে ভেসে যাচ্ছে নৌকো। কই আগে তো এমন হত না! ফুল তুলতে এত কষ্ট! একটি করে ফুল ছেঁড়া মাত্রই শুনি যেন ফুলশিশুর কান্না। মা, তোমার কোল থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। গাছ যেন বলছে, ওরে টের পাচ্ছি ছেঁড়ার যন্ত্রণা। সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর। সহ্যই সাধনা। মায়ের গলার মালা হবি। আমার কোল থেকে দুলবি গিয়ে মায়ের বুকে। যন্ত্রণার অবসান। অনুভূতি কেমন করে বিশ্ব অনুভূতিতে মিশে গেল! আমার ক্ষুদ্র 'আমি'টা হঠাৎ কেমন করে 'বিরাট আমি' হয়ে গেল। আমার চন্দ্র, আমার সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, সমুদ্রতরঙ্গ, পাহাড়, পর্বত, সমভূমি, বিশ্বপ্রাণ, সব আমাতে! একেই কী শাস্ত্র বলছেন, যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে দেহভাণ্ডে!

শোনো, সেদিন কে একজন কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটছে, আমি হঠাৎ এসে পড়েছি, উঃ করে উঠলুম। কী করছিস, ওতে যে আমার মা আছে। আমার মাকে কাটছিস! গাছের যন্ত্রণায় উহু করে উঠলুম। একদিন পূজার সময় শিবের মাথায় বজ্র দিচ্ছি এমন সময় দেখিয়ে দিলে—এই বিরাট মূর্তিই শিব! তখন শিব গড়ে পূজা বন্ধ হল। ফুল তুলচি হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যে ফুলের গাছগুলি যেন এক একটি ফুলের তোড়া—সম্মুখে বিরাট পূজা হয়ে গেছে! সেই বিরাট মূর্তির উপর ফুলের তোড়া শোভা কচ্ছে! সেইদিন থেকে ফুল তুলতে কষ্ট হয়। সর্বভূতে তিনি। পূজা তো উঠেই গেছে। এই যে বেলগাছ, বেলপাতা তুলতে আসতাম। একদিন পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আঁশ খানিকটা উঠে এল,—দেখলাম গাছ চৈতন্যময়। মনে কষ্ট হল। দূর্বা তুলতে গিয়ে দেখি আর সেরকম করে তুলতে পারি না। এখন এই ফুল, বেলপাতা, দূর্বা, সবই আমাকে রোক করে তুলতে হয়।

কেন তুলি?

পূজা যে আমার সংস্কারে। মালা গাঁথা যে আমার উত্তরাধিকার। পেছন ফিরে তাকাই। অতীত। সম্পন্ন একটি গ্রাম। মধ্যবিত্ত, প্রায় দরিদ্র একটি পরিবার। পিতা সাক্ষাৎ শিব। পাঁচ সিকে পাঁচ আনা সৎ, সত্যবাদী। হোমের অগ্নিশিখার মতো তেজস্বী। আমার বাবা যখন খড়ম পরে রাস্তায় চলতেন, গাঁয়ের দোকানিরা দাঁড়িয়ে উঠত। বলত—ওই তিনি আসছেন। যখন হালদারপুকুরে স্নান করতেন, লোকেরা সাহস করে নাইতে যেত না। খপর নিত—উনি কি স্নান করে গেছেন? তিনি রঘুবীর! রঘুবীর! বলতেন, আর তাঁর বুক রক্তবর্ণ হয়ে যেত।

রামের উপাসক ছিলেন তিনি। রামাৎমন্ত্র আমিও নিয়েছিলাম। বাবার ভক্তির কথা ভাবি—তিনি ফুলগুলি নিয়ে তাঁর ইষ্টদেব রঘুবীরের পূজা করছেন, তখন আবার যেন আমার হৃদয়ে সেই ফুলগুলি উঠে, দিব্য সৌরভে আমাকে ভরিয়ে দিত।

দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণির বিশাল কালীবাড়ি। উদ্যানটি ভারী মনোরম। গদাধর ফুল তুলছেন। মাঝে মাঝে অতীত এসে উঁকি মেরে যাচ্ছে। সেই কামারপুকুর গ্রাম। মানিকরাজার আমবাগান, হালদারপুকুর, লাহাবাবুদের পান্থনিবাস। মনে পড়ছে। তবে এই মুহূর্তে ফুল, গাছ, বেলপাতা, দূর্বা, গঙ্গা, এই সবই মনে আসছে। বাবা ফুল তুলছেন সাজি হাতে। রঘুবীরের পূজা করবেন। তিনি বলতেন তাঁর অলৌকিক দর্শনের কথা। কোথা থেকে একজন হাসিখুশি মেয়ে আসত। বয়েস বছর আষ্টেক। টকটকে লাল শাড়ি। এক গা গয়না। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। ফুলন্ত গাছের ডাল নুইয়ে দিচ্ছে, যাতে সহজে ফুল তোলা যায়। কে তুমি মেয়ে? ও মা! চিনতে পারছ না ক্ষুদিরাম! আমি যে তোমার মা শীতলা!

রক্তাম্বর! গদাধরের চোখে পড়ল, বকুলতলার ঘাটে একটা নৌকো ভিড়ছে। পাটাতনে খাড়া দাঁড়িয়ে আছেন অপূর্ব সুন্দরী এক রমণী। আলুলায়িত কেশ। দীর্ঘাঙ্গী। সুঠাম শরীর। পরনে টকটকে গেরুয়া শাড়ি। ফর্সা রং। রূপ যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে।

গদাধর আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ছুটে চলে এলেন নিজের ঘরে। ভাগনে হৃদয় মামার ঘরের গোছগাছে ব্যস্ত ছিল। মামাকে ওইভাবে আসতে দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'কী হল মামা! ঝাউতলায় যাবে বুঝি!'

গদাধর দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবারই ঝাউতলায় যেতেন গাড়ু হাতে। আর প্রশ্ন করতেন, মনের ওপর যার এত আঁট, তার পেটের ওপর একটুও আঁট নেই কেন! দেহটা যেন মলে ভর্তি!

গদাধর বললেন, 'ঝাউতলা ভোরেই হয়ে গেছে। দেখে আয়, বকুলতলার ঘাটে কে এসেছে!'

'কে এসেছে?'

'তুই যা না।'

গদাধরের মুখ, চোখ ক্রমশই উজ্জ্বল হচ্ছে। জগৎছাড়া সেই ভাবটা ক্রমশ ঘিরে আসছে। সেই দৃষ্টিটা আসছে, যেটা এলে বর্তমানের পর্দাটা সরে গিয়ে দূর ভবিষ্যতের পুরোটাই দেখা যায়। ডান হাতটা উঠে যায় ওপরের দিকে, বাঁ হাতটা চলে আসে বুকের কাছে। আঙুলগুলো হয়ে যায় পদ্মফুলের মুদ্রা। তখন আর এই জগৎটা থাকে না। 'ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর'। না, ওই ভাবটা এখন এলে চলবে না। গদাধর এক চুমুক জল খেলেন।

হৃদয় ছুটতে ছুটতে এল, 'ও মামা, ও যে একজন মেয়েলোক। আর তেমনি সুন্দরী!'

'কী করছে এখন?'

'চুপ করে বসে আছে নিজের ভাবে।'

'আর নৌকোটা?'

'নৌকো টৌকো কিছু নেই।'

'তুই আবার যা, গিয়ে বল, মামা আপনাকে ডাকছে।'

'তুমি কী যে বলো মামা! লোকে যা বলে সত্যিই তোমার তাই হয়েছে, মাথার গণ্ডগোল।

ওই সুন্দরী মহিলাকে তোমার ঘরে ঢোকালে মন্দিরের কর্মচারীরা ছি ছি করবে মামা। ওসব বায়না ছাড়ো। আমি তোমার অভিভাবক।'

'তুই আমার অভিভাবক! শালা! তুই না, সেজবাবুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, একদিন আমার এই ঘরে এক সুন্দরী বেশ্যাকে ঢুকিয়েছিলিস! ভেবেছিলিস, মামা মেয়েছেলের সঙ্গে বিড়বার জন্যে খেপে গেছে।

মাঝরাতে পঞ্চবটীর গভীর জঙ্গলে উলঙ্গ হয়ে মা, মা, বলে চিৎকার করে। গঙ্গার পাঁতায় পড়ে মুখ ঘষে। থেকে থেকে পরনের কাপড় খুলে যায়! এ সব মেয়েছেলের সঙ্গে বিড়বার জন্যে! শোন, রমণীর সঙ্গে থাকি না করি রমণ।'

'সেজবাবুর যা মনে হয়েছিল!'

'পরামর্শটা কে দিয়েছিল? শালা! আমার পাগলামি সারাবার জন্যে বেশ্যা ধরে আনলি!'

'তারপর তুমি যা করলে!'

'একে সুন্দরী, তায় চোখ দুটো টানা টানা, তেমনি তাকানোর ভঙ্গি! সে আর জানবে কী করে কার কাছে এসেছে।' আমি যে মা ছাড়া কিছুই ভাবতে পারি না রে! আমি মা, মা, করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, আর হলধারীকে ডেকে দিয়ে বললাম—দাদা, দেখবে এসো, ঘরে কে এসেছে! তবে, একথা বলতেই হবে, তুই আমায় চিন্তায় ফেলে দিয়েছিস!'

'কিসের চিন্তা! তুমি কি ভাবছ আবার আমি ওইরকম করব। তোমাকে আমি চিনেছি মামা!'

'না রে, সে চিন্তা নয় রে হৃদু। আমি কি ভাবছি জানিস, আসক্তি। আসক্তির বীজ যদি অন্তরে থাকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও পতন হয়। হতে বাধ্য। মন থেকে শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে। কামিনীকাঞ্চনই মায়া। ও দুটো মন থেকে গেলে, আর বাকি রইল কি? তখন কেবল ব্রহ্মানন্দ। যা, যা ডেকে আন। বল, আমার মামা আপনাকে ডাকছে।'

'সেজবাবু, খাজাঞ্চি, এরা কিছু বললে, জানি না কিন্তু।'

ভাগনে হৃদয় গদাধরের চেয়ে বয়সে সামান্যই বড়, প্রায় সমবয়সিই। পিসিমার ছেলে। রাজপুত্রের মতো চেহারা। লম্বা, চওড়া, গৌরবর্ণ। এই অবয়বের মধ্যে অসাধারণ একটি মনও আছে। কর্তব্যপরায়ণ, ভয়শূন্য। ধীর, স্থির। যে কোনও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে। মানুষকে সুপরামর্শ দিতে জানে। গদাধরকে সে সত্যিই ভালবাসে।

হৃদয় বকুলতলার ঘাটে গিয়ে দেখল, সেই সুন্দরী সন্ন্যাসিনী ঘাটের রানার ওপর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছেন, যেন ধ্যানমগ্ন। ভাবালু দৃষ্টি। গোল, গোল সুন্দর দুটি হাত কোলের ওপর আলতোভাবে পড়ে আছে। হৃদয় পেছনদিক থেকে মুগ্ধ চোখে দেখছে। পিঠের ওপর এলোচুলের বন্যা। কার সঙ্গে তুলনা করবে? মা লক্ষ্মী, না মা সরস্বতী! এত রূপ! মা ছাড়া আর কোনও ভাব তো মনে আসছে না।

হৃদয় খুব সন্তর্পণে সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'আপনাকে আমার মামা ডাকছেন। তিনি ওই ঘরে থাকেন। খুব সাধনভজন করেন। আপনাকে ডাকছেন।'

বলামাত্রই সন্ন্যাসিনী বাধ্য মেয়ের মতো উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলো।'

হৃদয় লম্বা, সন্ন্যাসিনী হৃদয়ের চেয়ে দু-তিন ইঞ্চি আরও বেশি লম্বা। ব্যবহারে কোনও আড়ষ্টতা, কোনও জড়তা নেই। হৃদয়ের মনে হল, এক দেশের রানি, যেন আর এক দেশের রাজাকে জয় করতে এসেছে। গেরুয়া বসন মলিন নয়। এলো চুল ঘন কৃষ্ণ বৈশাখী মেঘের মতো, জটা নয়।

Scanned by CamScanner

পা দুটি দেবীর চরণের মতো। বহু পথচলার ফাটল নেই গোলাপি গোড়ালিতে। হৃদয়ের নারীদর্শনের বয়সোচিত চোখ তৈরি হয়েছে। 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ' সূত্রে মামা গদাধরের বেশ কিছু গুণ হৃদয়ের সহজাত। তার মধ্যে একটি হল, দেখে মানুষ চেনা। সন্ন্যাসিনীকে দেখে তার মনে হচ্ছে, সাক্ষাৎ জ্ঞান। মামা যেমন বলে, বিদ্যারূপিণী।

সন্ন্যাসিনী চলেছেন আগে আগে। হৃদয় একটু পেছনে। সে চলার ধরন দেখছে। কী দৃপ্ত ভঙ্গি, অথচ কী মোলায়েম। এ যেন পদ্মফুলের নালিকা দিয়ে তৈরি একটি তরোয়াল। চৈত্র মাসের রোদে ঝিম ধরছে গাছের পাতায়। গোটাকতক পায়রা ফটফট করে উড়ে গেল মা ভবতারিণীর মন্দিরের দিকে। আনমনা প্রজাপতি বাতাসে ভাসছে। বাউল বাতাস।

হৃদয় পেছন থেকে বললে, 'ওই যে সামনেই আমার মামার ঘর।'

'এইবার তুমি আগে যাও। তোমার নাম ?'

'হৃদয়।'

'বাঃ, খুব সুন্দর নাম ! যিনি রেখেছেন তিনি বোধহয় কবি !'

হৃদয় বললে, 'আপনিই আগে যান। মামা খুব উতলা হয়েছে।'

সন্ন্যাসিনী মুখ ফিরিয়ে হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন।

ঘরের ঠিক মাঝখানটিতে গদাধর দাঁড়িয়ে আছেন। গায়ে কোঁচার খোঁট। পরিধানের ধুতিটি হাঁটু ছাড়িয়েছে কি ছাড়ায়নি। দাঁড়িয়ে আছেন উত্তর মুখে। পেছনে দক্ষিণের টানা বারান্দা পুবের রোদে ভাসছে। সেই ঝলকে গদাধর উদ্ভাসিত। পশ্চিমের দেয়াল ঘেঁষে ছোট্ট তক্তাপোশ সাদা চাদরে ঢাকা। ঘরের দেয়ালে নানা চিত্রপট। লাল তেলা মেঝে পরিষ্কার ঝকঝকে।

হৃদয় সিঁড়ির প্রথম ধাপের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। মামা তো ঠিকই বলেছিল, আমার নাম করে বললে সে ঠিকই আসবে। দরজার সামনে সন্ন্যাসিনী মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। একেবারে সামনে গদাধর। সেজবাবু যাঁকে বলেন, আমার রামকৃষ্ণ।

ভৈরবী দ্বারপ্রান্তে স্থাণু। দেখছেন, অবাক হয়ে দেখছেন। হঠাৎ প্রায় ছুটে ঘরে ঢুকলেন। দু চোখে বইছে আনন্দাশ্রু। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। বিস্ময়ে অভিভূত। সহসা বলে উঠলেন, 'বাবা, তুমি এখানে রয়েছ ! গঙ্গার তীরে কোথাও তুমি আছ তা জানতুম। কতদিন ধরে খুঁজছি ! এতদিনে দেখা পেলুম। আমার কী আনন্দ, কী আনন্দ !'

গদাধর বুকে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে মৃদু হাসি। ভৈরবীকে দেখছেন। দক্ষিণের আলোয় উদ্ভাসিত মুখ। সাধনার লাবণ্যে সুন্দর। দুটো চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। শরীরে গুলঞ্চ ফুলের সুবাস। গদাধর ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'মা, তুমি আগে বোসো। এই চৌকির ওপর বোসো।'

'ওটা তোমার বিছানা।'

'মা বলেছি যে !'

'তা হলেও, শাস্ত্র তো মানতে হবে !'

'শাস্ত্র ! হ্যাঁ, শাস্ত্র তো মানতেই হবে। স্ত্রী, পুরুষ ভেদ। তবে, আত্মার তো কোনও লিঙ্গ নেই !'

'সে ব্রহ্মবিদের কাছে। সে কজন বাবা ? লক্ষে একজন। আমি মেঝেতেই বসছি।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, আসন পেতে দি।' গদাধর ব্যস্ত হলেন। আসনের বদলে একটা মাদুর বিছিয়ে দিলেন। ভৈরবী বসে বললেন, 'আমার সামনে বোসো তুমি। তোমার জন্যেই আমার এত খুঁজে খুঁজে এখানে আসা।'

গদাধর অদূরে বসেছেন। ভাবে গরগর। ওই মন্দিরে যে মাটি রয়েছেন, আঁধারের রূপ, সেইখান থেকেই সব আলোতে আসছে। কালের গর্ভের নামই কালী। সব তাঁর খেলা। গদাধর জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার কথা কেমন করে জানতে পারলে মা !'

'যদি বলি, জগদম্বার নির্দেশ, বিশ্বাস হবে ?'

'হবে না মানে ? ওইটাই তো জ্ঞান। বাকি সব অজ্ঞান। এ আমার জানা। তাঁর ইচ্ছে না হলে গাছের একটা পাতাও নাড়ানো যাবে না। সকলি তোমারি ইচ্ছা।'

'তুমি যে বিজ্ঞানী বাবা !'

'হি হি, মা এই মন্দিরের সবাই, আমার গ্রামের সবাই অন্য কথা বলে। বলে, উন্মাদ। গদাই পাগলা। কোবরেজের দাওয়াই চলছে।'

'সেইজন্যেই তো আমার আসা বাবা। নির্দেশ এসেছিল, তোমাদের তিনজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। দুজনের দেখা আমি পূর্ববঙ্গে পেয়েছি। তুমি হলে তিন নম্বর। খুঁজছি, ঘুরছি, ঘুরছি খুঁজছি, অবশেষে আজ এখানে তোমার দেখা পেলাম। বলো, তুমি আছ কেমন !'

'মা, কতদূর থেকে কত খুঁজে খুঁজে এলে, তুমি কিছু খাবে না ! একটু মিষ্টি, এক গেলাস জল !'

গদাধর ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, 'হৃদু, হৃদু।'

সন্ন্যাসিনী একটু আঙুল তুললেন। সেই ইঙ্গিতেই গদাধর শান্ত। উত্তরের দরজায় হৃদয় দাঁড়িয়ে।

সন্ন্যাসিনী বললেন, 'একবার। আমি একাহারী। আর এই যে দেখছ বাবা আমার গলায় ঝুলছে আমার ছেলে রঘুবীর শিলা, একে সেবা না করে আমি নিজে খাই কী করে ?'

'এই দেখো, তুমি সাধারণ গেরস্তদের মতো কথা বলছ। যদি ছেলেই ভাবলে তাহলে এমন নিয়ম কেন গো ! তোমার ছেলের খিদে পাবে না ! যখনতখন পাবে। ওই যে গো মন্দিরে জিভ বের করে আছে, বেটির এক একদিন এমন খিদে পায় পুজোর তর সয় না। আমি বলতুম একটু ধৈর্য ধরো তোমার পায়ে ফুলটা দি, কতক্ষণ আর লাগবে ! আগেই যদি ভোগ দিয়ে দি লোকে আমায় বলবে কী ! সে কী আমার কথা শোনার মেয়ে গা ! তার কথায় যে জগৎ চলে ! ও হৃদয়, দেখ না কি আছে !'

হৃদয় কোথা থেকে জোগাড় করে আনলেন দেবীর প্রসাদী ফলমূল, সাদা তুলতুলে মাখন, মিছরি।

গদাধর বললেন, 'বাঃ, বেশ এনেছিস, পেট ঠাণ্ডা হবে। ছেলেকে না দিয়ে মা তো খাবে না, তাহলে আগে আমি একটু খেয়েনি।'

একটুকরো মিছরিতে মাখন তুলে মুখে ফেললেন গদাধর।

'নাও মা, এইবার তুমি খাও।'

গদাধরের অপূর্ব বালক ভাব দেখে হাসছেন। হৃদয় ভাবছেন, এমন রূপসী বড়লোকের বধূ না হয়ে পরিব্রাজিকা হলেন কিসের আকর্ষণে ! মামা আমার সারদামামি সম্পর্কে বলেছিল, 'হৃদে ! ও সারদা, সরস্বতী। রূপ ঢেকে এসেছে পাছে লোকের কুনজর পড়ে।' কিন্তু এই সাধিকা রূপের আগুন জ্বেলে কোন সাহসে দেশে দেশে একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন ! হৃদয়ের মনের কথাটাই গদাধরের প্রশ্নে প্রকাশ পেল,

'মা, তুমি কে ?'

'তুমি তো সব জান বাবা। জান না !'

'আমি কেমন করে জানব, মা কি আমায় বলেছেন ! আগে বলে দিলে আমি তোমার কাছে জানতে চাইব কেন ?'

'পূর্বাশ্রমের কথা কি বলতে আছে বাবা !'

'তুমি কি সকলকে বলবে, শুধু আমাকে বলবে !'

'সব বলব। আমি তোমার জন্যেই এসেছি।'

'মা তুমি যে বললে তিনজন !'

'তুমিই যে হলে আমার শ্রেষ্ঠ তৃতীয়। পরে তোমাকে জানিয়ে দোবো তুমি কে। কেন এসেছ তুমি, কেন এসেছি আমি।'

'তা মা সেই দুজন কে ?'

'তাদের দেখা আমি বরিশালে পেয়েছি। উঁচুদরের সাধক। একজনের নাম চন্দ্র, আর একজনের নাম গিরিজা। তারা এগিয়েছে নিজেদের মোক্ষলাভের পথে।'

'আর আমি ?'

'শোনো বাবা, ওরা এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে। আর তুমি ওদিক থেকে এদিকে এসেছ।'

'ও হৃদে, সে আবার কি রে ?'

সন্ন্যাসিনী বললেন, 'সব কথা, যত কথা, সব পরে হবে। যে কথা গভীর রাতে নির্জনে বলার সে সব কথা কি এখন বলা যায় ! আমি অনেকক্ষণ এসেছি, এইবার তোমার বড় মাকে দর্শন করে আসি।'

॥ দুই ॥

'আপনি ভৈরবী ?'

'এবং ব্রাহ্মণী।'

চলেছেন, মা ভবতারিণীর মন্দিরে। ভোগরাগাদির সময়। পূজা শুরু হয়েছে। ঘণ্টা বাজছে। ভৈরবীর পাশে পাশে হৃদয়। রোদ খুব চড়েছে। শানের উঠনে পা রাখা যাচ্ছে না। ভৈরবী নির্বিকার। টকটকে গেরুয়া। পিঠ ছাপানো আলুলায়িত কেশ। সুগঠিত দীর্ঘ শরীর। গাত্রবর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের মতো।

হৃদয়ের খুব আনন্দ। এতদিনে দক্ষিণেশ্বরে তার পাগলমামার কাছে একজন এসেছেন বটে। সবাই ফিরে ফিরে চায়। মামার সঙ্গ করে হৃদয়ের দৃষ্টি খুলেছে। মানুষের তাকানোর ধরন দেখে মন পড়তে পারে। কোনও চোখে বিস্ময়, কোনও চোখে ভক্তি, কোনও চোখে লালসা, ভোগের ইচ্ছা। কোন শক্তিতে একা এই ভৈরবী দেব-দানবের পৃথিবী সামলায় !

আছে, আছে শক্তি আছে। মামার কথা মনে পড়ল হৃদয়ের। কে বলেছে মা পাথরের তৈরি নিষ্প্রাণ এক প্রতিমূর্তি। পূজা আর ধ্যান করতে

Scanned by CamScanner

করতে দেখেছি পাষাণী নয় জীবন্ত জাগ্রত এক অধিষ্ঠান। নাকে হাত দিয়ে দেখেছি, মা সত্য সত্যই নিঃশ্বাস ফেলছেন। বুঝলি হৃদে, রাতের বেলায় ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় মন্দির দেউলে তন্ন করে খুঁজেও মার দিব্যাঙ্গের কখনও কোনও ছায়া পড়তে দেখিনি। গভীর রাতে তোরা যখন সব বেহুঁশ ঘুমে। পঞ্চবটী তলিয়ে গেছে অন্ধকারে, আলো বলতে শুধু তারার মেলা, শব্দ বলতে শুধু প্রবাহিনী গঙ্গা, ক্ষণে ক্ষণে কর্কশ গলায় পেঁচার প্রহর জাগানো ডাক। ঠিক সেই সময়ে আমি শুনতে পাই, মাকালী পাঁইজর পরে বালিকার মতো আনন্দে ঝমঝম শব্দ করতে করতে মন্দিরের ওপরতলায় উঠছেন। তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে এসে দেখি, সত্যি সত্যিই মা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। আলুলায়িত কেশ। মা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন, কখনও গঙ্গা, কখনও কলকাতা। তোদের কী দুর্ভাগ্য হৃদে। এমন দৃশ্য দেখতে পাস না।

এই সকাল, এই আলো, এত লোকজন, তবু হৃদয়ের গা ছমছম করে উঠল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভৈরবী বললেন, 'কী হল! অমন কেঁপে উঠলে!'

'মামার একটা দর্শনের কথা হঠাৎ মনে পড়ল। নিরালা মন্দিরে আজকাল আমার আসতে ভয় করে।'

'কে পূজারি?'

'আগে মামাই করতেন। শাস্ত্রমতে পুজো তাঁর দ্বারা আর সম্ভব নয়। এখন পুজো করেন মামার খুড়তুতো ভাই। মামা ডাকেন হলধারী। আসল নাম রামতারক।'

আর কোনও কথা হল না। ভৈরবী মন্দিরে প্রবেশ করলেন। হলধারী পুজোয় বসেছেন। চওড়া পিঠে মোটা পইতে। মাথায় সঙ্কল্পের ফুল একটি। চারপাশে রুপোর থালায় থালায় নৈবেদ্য সাজানো। মায়ের রাঙা পায়ে জবাফুল। কয়েকজন দর্শনার্থী হাতজোড় করে বসে আছেন।

ভৈরবী প্রণাম করলেন। হৃদয় ভেবেছিলেন, তিনি অনেকক্ষণ বসে থাকবেন ধ্যানস্থ হয়ে। তা হল না। হৃদয়কে নিয়ে বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে। এরপর বিষ্ণুমন্দিরে।

ভৈরবী জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা, শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি দুটি কেন?'

মামার এক মহাকাণ্ডের কথা বলতে পারবে বলে হৃদয়ের মহা উৎসাহ।

'একটু বসুন না, সে যে অনেক কথা।'

ভৈরবী বসলেন। বেশ ভালই লাগছে তাঁর, পশ্চিমমুখী এই মন্দির। মার্বেলের মেঝেটি ভারী শীতল। পশ্চিমে সার সার শিবমন্দিরের ওপাশেই গঙ্গা। সূর্য যত ওদিকে যাচ্ছে আকাশ ততই উত্তপ্ত হচ্ছে। ঝাঁঝালো বাতাসের থেকে থেকে ঝাপটা। ভৈরবীকে বড় আপন মনে হচ্ছে। মামারও তো তাই মনে হয়েছে। পূর্বজন্ম থেকে যেন ভেসে এলেন।

হৃদয় শুরু করল সেই কাহিনী। 'শ্রীকৃষ্ণের এই যে বিগ্রহটি দেখছ মা, এঁর নাম শ্রীজগমোহন আর শ্রীরাধার নাম শ্রীজগমোহিনী। পূজা করতেন ক্ষেত্রমামা। ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তা ধরো বছর ছয়েক আগে জন্মাষ্টমীর দিন, সারাটা দিন খুব পূজা উৎসব হল। এইবার দুপুরে ক্ষেত্রমামা শ্রীজগমোহনকে শয়ন দেবেন। শ্রীজগমোহিনীকে নিয়ে পাশের ঘরে শয়ন দিয়ে এসেছেন, এইবার শ্রীজগমোহন। মেঝেতে জল পড়েছিল। পা হড়কে ঠাকুরকে নিয়ে পড়ে গেলেন। বিগ্রহের একটি পা ভেঙে দু খণ্ড হয়ে গেল। নিজেরও খুব লাগল। ঠাকুরের পা ভেঙেছে, সর্বনাশ, সর্বনাশ! খবর চলে গেল জানবাজারে রানির কাছে, মথুরবাবুর কাছে। ক্ষেত্রমামাকে তাড়িয়ে দিল। সভা বসল পণ্ডিতদের। বিধান দিলেন, ভাঙা বিগ্রহ বিসর্জন দাও গঙ্গার জলে। নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা করো।' সভার এক পাশে আমার মামা বসেছিলেন। পণ্ডিতদের যুক্তিতর্ক শুনে হাসছিলেন মুচকি মুচকি। সভা প্রায় শেষ, এমন সময় মথুরবাবু রানির সঙ্গে যুক্তি করে মামার মত জানতে চাইলেন। মামা তখন ভাবে। এই অবস্থায় মামা একেবারে অন্য মানুষ। কারও পরোয়া করে না। মামা বললে, 'রানির জামাইদের কেউ যদি পড়ে পা ভেঙে ফেলত, তবে কি তাকে ত্যাগ করে আর একজনকে তার জায়গায় এনে বসান হত—না তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হত? এখানেও সেইরকম করা হোক—মূর্তিটি জুড়ে যেমন পূজা হচ্ছে তেমনি পূজা করা হোক। ত্যাগ করতে হবে কিসের জন্যে!'

ভৈরবী খুব খুশি হয়ে বললেন, 'বাঃ, বাঃ, চমৎকার যুক্তি গো!'

'কিন্তু, পণ্ডিতসমাজের এক অংশ এই বিধান মানতে পারল না। আর, আর এক অংশ মামার এই মীমাংসায় ধন্য ধন্য করতে লাগল। মথুরবাবু মামাকে বললেন, 'কে জুড়বে?'

মামা বললে, 'আমি জুড়ব। জোড়ের দাগ তোমরা ধরতেই পারবে না।' তাই হল। কারওর ক্ষমতাই হবে না সেই দাগ ধরার। মনেই হবে না বিগ্রহের একটি পা কোনওদিন ভেঙেছিল! মথুরবাবু মানে আমাদের সেজবাবু আর রানিমা মামার এই কথায় ধন্য ধন্য করলেও শাস্ত্রঘাঁটা পণ্ডিতদের খুঁতখুঁতুনি গেল না। আর একটি মূর্তি তৈরি হল। মামার ওপর ভার পড়ল আগের বিগ্রহটির পূজা করার। আমার মামার পূজা! সে এক দেখার জিনিস!'

ভৈরবী বললেন, 'শাস্ত্র বলছেন, দেবতা হয়ে দেবতার পূজা করবে। তোমার মামা তাই করেন বাবা।'

হঠাৎ কোথা থেকে একটা ভ্রমর উড়ে এল। কুচকুচে কালো এতখানি ডুমো মতো। শুঁড় দুটো হলুদ। ফুলের পরাগ মেখে এসেছে। ভোঁ ভোঁ করে চক্কর মারছে। ভৈরবী অবাক হয়ে দেখছেন।

হৃদয় বললে, 'বাগান থেকে এসেছে। ভয় নেই কিছু বলবে না।'

'বলবে না কী? বলছে ত! কত কথা বলছে, বুঝতে পারছ না। শ্রীকৃষ্ণের বার্তা এনেছে শ্রীরাধিকার কাছে।'

ভৈরবী উঠে দাঁড়ালেন। হৃদয়ও উঠলেন। বেলা বাড়ছে। জোয়ার এসেছে গঙ্গায়। চাঁদনির ঘাটে কে একজন চিৎকার করে সাবধান করছে সকলকে, 'জলে নেমো না, জলে নেমো না।'

ভৈরবী চাতাল দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মামাকে সবাই কি বলে ডাকে?'

'দাদু নাম রেখেছিলেন গদাধর। সেজবাবু বললেন, কী তোমার নামের ছিরি! গদাধর, গদাই। আমি তোমার নাম রাখলুম রামকৃষ্ণ।'

'ঠিক নামটিই রেখেছেন, তোমাদের মথুরবাবু ভগবানের কৃপা লাভ করেছেন, আর পাঁচটা জমিদারের মতো নয়।'

'রানির খুব বিশ্বাসের জামাই। আমার মামাকে যেমন ভালবাসেন তেমন শ্রদ্ধাও করেন। মামা বলে মথুর আমার রসদদার। আমি সাধন করব, ও আমার শরীরটা বাঁচিয়ে রাখবে।'

হৃদয় দেখল তাদের দিকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে বাগানের মালী ভর্তাভারী। মামার প্রাণের মানুষ। দু-চারটে মনের কথা মামা এরই সঙ্গে কয়। সামান্য মালী হলে কি হবে, মানুষটা জ্ঞানী। রামকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক চিনেছ। একদিন হঠাৎ মামাকে প্রশ্ন করেছিল, 'বলো তো ঠাকুর, পৃথিবীতে উচ্ছিষ্ট হয়নি কী?' মামা বলেছিল 'ব্রহ্মা'। কারওর ক্ষমতা নেই ব্রহ্ম কী তা মুখে প্রকাশ করে। সেই থেকে ভর্তাভারী মামার অনুরক্ত। দরকার হলে জীবন দিয়ে দেবে।

মামার পঞ্চবটী। সাধন করবেন। গাছ লেগেছে। বেড়া দিতে হবে, তা না হলে ছাগলে, গরুতে শেষ করে দেবে। বিরাট ব্যাপার, বাঁখারি চাই, বাঁশের খুঁটি চাই। ভর্তাভারীর সঙ্গে রোজই আলোচনা হয়। সে সামান্য মানুষ, কোথায় পাবে বাঁশ, বাঁখারি, দড়ি! একদিন দুপুরে পঞ্চবটীর সামনে দাঁড়িয়ে দুজনে ভাবছেন কি করা যায় আর ঠিক সেই সময় বান এল গঙ্গায়। সেই স্রোতে এক বোঝা বাঁখারি আর এক বোঝা একই মাপের বাঁশের খুঁটি ভেসে উঠেই ডুবে গেল আবার। ভর্তাভারী দেখেনি, মামার চোখেই পড়েছে, ভর্তা দেখ, দেখ, শিগগির দেখ। ভর্তা আনন্দে সেই জোয়ারের গঙ্গায় মারলে লাফ। টেনেটুনে সব তুলে নিয়ে এল। কী আশ্চর্য! একটা বেড়া তৈরি করতে যা যা লাগবে সব ভেসে এসেছে। দড়ি, এমন কি একটা কাটারিও।

ভর্তাভারী ভৈরবীকে প্রণাম করে বললে, 'তুমি এসেছ মা!

'তুমি কে বাবা?'

'মা আমি মালী।'

হৃদয় বললে, 'মামার মনের মানুষ। প্রাণের কথা যত এরই সঙ্গে হয়।'

'হবেই তো, যে ফুলের খবর রাখে সে তো ভগবানের খবরও জানবে।'

তিনজনেই দাঁড়িয়ে। চলা বন্ধ। অদূরেই শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর। সেখান থেকে গান আর হাততালির শব্দ আসছে। গান গাইছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 'মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।' পাশ দিয়ে কে একজন যেতে যেতে ইচ্ছে করে একবার কাশল।

হৃদয় বললে, 'মহা বদলোক মা, রামধন, মামাকে একদম সহ্য করতে পারে না।'

ভৈরবী বললেন, 'সব ভেসে যাবে খড়কুটোর মতো।'

ভর্তাভারী বললে, 'বান যখন আসবে!'

ভৈরবী বললেন, 'আসবে কী! এসে গেছে!' একটু থেমে বললেন, 'ও হৃদু! আমার রঘুবীরকে যে খাওয়াতে হবে বাবা!'

'কী ব্যবস্থা করব বলুন!'

'ভোগ দিতে হবে। একটা জায়গা চাই যেখানে কাঠকুটো জ্বেলে আমি রান্না করব।'

'চলুন তাহলে মামার কাছে যাই।'

রামকৃষ্ণ মহানন্দে বসে আছেন তক্তাপোশে পা দুটি ঝুলিয়ে।

Scanned by CamScanner

জিজ্ঞেস করলেন, 'সব দেখা হল।'

'হ্যাঁ বাবা, ভারী সুন্দর জাগ্রত জায়গা! তুমিই তো এখানে খেলছ মায়ের সঙ্গে!'

'মা আমাকে খেলাচ্ছেন, এই ইন্দ্রিয়ের খাঁচাটা ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইছেন।'

রামকৃষ্ণ গানেই ছিলেন, আবার গানেই চলে গেলেন,

মা কি শুধুই শিবের সতী।
যাঁরে কালের কাল করে প্রণতি।।
ন্যাংটা বেশে শত্রু নাশে মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি।
বল দেখি মন সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাথি।।
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলই জেনো ডাকাতি।
সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধমতি।।

ভৈরবী গান শুনে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে রইলেন, 'বাবা, তোমার এত সুন্দর গলা! অনেকের অনেক গান শুনেছি এমন ভাব কারও মধ্যে দেখিনি। বাবা, আমি এইবার ভিক্ষায় বেরবো।'

'ভিক্ষা তুমি বাইরে কোথায় করবে মা। মাধুকরী তুমি এইখানেই করো! হৃদয় তোমাকে ভাণ্ডারীর কাছে নিয়ে যাক, তোমার রঘুবীরের ভোগে যা যা লাগবে সব নিয়ে নাও।'

'বেশ তবে তাই হোক, বেলা ত অনেক হল!'

রামকৃষ্ণ ভর্তাভারীকে বললেন, 'তুমি পঞ্চবটীতে ভোগ রান্নার একটা জায়গা ঠিক করে দাও। দেখো, আমার মায়ের যেন কোনও অসুবিধে না হয়!'

ইতিমধ্যেই ভৈরবীকে যে দু-চারজন দেখেছে তাদের মুখে মুখে সংবাদটি চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেছে। সাধন ভজন কেমন করেন কে জানে বাপু, রূপটি কিন্তু খাসা। এর ভৈরবটির ভাগ্য খুব ভাল। নোংরা ইঙ্গিতাদিতে মন্দির আজ মুখর। সাধারণ স্তরের কর্মচারীরা মায়ের দরবারে থাকে বটে, তাদের মন থাকে অন্যখানে— কামিনী আর কাঞ্চনে। ভৈরবী তাদের দৃষ্টিতে লোভনীয় এক কামিনী মাত্র। তার চলন, দেহসৌষ্ঠব, এই সবই আলোচনার বিষয়। আর ওই রামকৃষ্ণ মস্ত বড এক অভিনেতা। ধর্মের কল ঘুরিয়ে কেমন আখের গুচোচ্ছে! সেজবাবুকে কেমন বশ করে ফেলেছে! মন্ত্র, তন্ত্র, তাগা, তাবিজের কারবার ভালই জমবে! রানির গায়ে হাত তুলেও কেমন তরে গেল! মার, মার ব্যাটাকে, বলে তেড়ে গিয়েও কোনও কাজ হল না। জামাই আর শাশুড়ি দুটোকেই মজিয়েছে।

হৃদয় গাঁই গুঁই করে বললে, 'মামা, সেই রামধন ঘুর ঘুর করছে। আমাদের দেখে ইচ্ছে করে কাশছিল। লোকটা ভীষণ বাজে, নোংরা!'

'সেদিন ও খুব জব্দ হয়েছে আমার মায়ের ইচ্ছায়। তোকে বলা হয়নি। গঙ্গার জলে গলা ডুবিয়ে পড়ে আছি। মনে মনে ভাবছি, লোকে আমায় পাগল বলে। কিন্তু আমি মাকে দেখতে পাই, কথা বলি, তিনিও কত কি বলেন। এ সবই কি মিথ্যা, ভ্রম! ভাল আজ পরীক্ষা করা যাক। কিন্তু কি ভাবে! হঠাৎ দেখি রামধন। বাগানের পথ দিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মাকে বললুম, মা! ওই দেখো রামধন, রানির পেয়ারের লোক; আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না, কখনও আমার সঙ্গে কথা বলে না, ফিরে তাকায় না। মা, তুমি যদি সত্য হও, তাহলে রামধনকে আমার কাছে বন্ধুর মতো এখনি এনে দাও। তবে জানব যে, তুমি আমার কথা শোনো, আর সকলই সত্য বলে ধারণা হবে। যেই না এইকথা মনে হওয়া, অমনি দেখি কী, রামধন দাঁড়িয়ে পড়েছে, আমাকে দেখছে। তারপর দেখি কী তরতর করে নেমে আসছে জলের দিকে। আমি যাতে শুনতে পাই এমন দূরত্বে এসে, মৃদুস্বরে বললে, 'ভট্টাচার্য মশাই! কালীর সাক্ষাৎ পেয়ে থাকো ভাল, তা অত বাড়াবাড়ি করার আবশ্যক কি?' এই বলে তরতর করে চলে গেল। দেখগে যা, ওর সত্যি কাশি হয়েছে।'

ভাণ্ডারী ভৈরবীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সসম্ভ্রমে বললেন, 'মা, আপনি এসেছেন? সবাই বলাবলি করছে, সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী। কয়েকদিন আছেন তো!'

ভৈরবী মন্দিরের দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'ওই যে বসে আছেন মন্দিরে, নিয়ে এলেন টানতে টানতে। বললেন, যোগেশ্বরী যাও, ওখানে যে তোমাকে দিয়ে কিছু কাজ করাব।'

ভাণ্ডারী বললেন, 'এখন বলুন মা, আপনার কোন সেবায় আমি লাগতে পারি?'

গলা শুনে, সেরেস্তা থেকে বেরিয়ে এসেছেন খাজাঞ্চিমশাই, পেছনে রামধন। সত্যিই তার কাশি হয়েছে। অনবরতই কাশছে। খাজাঞ্চি কিছু বিরক্তি প্রকাশ করে বলছেন, 'এ তো তোমার পেট গরমের কাশি! ডাব খাও না, ডাবের তো অভাব নেই!'

খাজাঞ্চিমশাই ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ব্রাহ্মণীকে প্রণাম করে বললেন, 'খবর পেয়েছি, আপনি এসেছেন।'

'আমার পরিচয় তো জানেন না!'

'মায়ের আবার পরিচয় কী! মায়ের পরিচয় মা! উচ্চস্তরের সাধিকা আপনি এটুকু বোঝার মতো বোধ মা আমাকে কৃপা করে দিয়েছেন।'

ভাণ্ডারীকে আদেশের গলায় বললেন, 'দেখো, এঁর যেন কোনও অসুবিধে না হয়।'

আদেশ করে তিনি চলে গেলেন উত্তরের দরজার দিকে। কুঠিবাড়িতে যাচ্ছেন। খবর এসেছে, মথুরবাবু আসবেন।

ব্রাহ্মণী ঝুলি ধরে প্রকৃতই ভিক্ষা নিলেন, উপনয়নের সময় ব্রহ্মচারীরা যে ভাবে নেয়। পঞ্চবটীতলে ভর্তাভারী স্থান প্রস্তুত করে রেখেছিল। ব্রাহ্মণী ভোগ রাঁধতে বসলেন। হৃদয়ের এইবার ছুটি। মধ্যাহ্ন আহারের ঘণ্টা বেজে গেছে। ভর্তাভারী কিছুটা দূরে বসে আছে একটা গাছের ডাল হাতে নিয়ে। ঠিক দুপুর বেলা কাকেরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেও, যত্রতত্র আহারের অন্বেষণ বন্ধ নেই। একপাল হনুমানও আছে। আগুনের ভয়ে কেউ যাচ্ছে না সাহস করে। দূরের দর্শক হয়ে বসে আছে ডালপালার আড়ালে আবডালে। আপন ভাবে মগ্ন হয়ে রান্না করছেন ভৈরবী। আজ আর তেমন বাতাস নেই। সকলেরই এই সময়টায় বিশ্রাম। শুধু মার্তণ্ডদেব প্রখর কিরণে ভূমির শেষ জলবিন্দুটুকু শুষে নিতে চাইছেন। আর ক্লান্তি নেই আমগাছের ডালে মৌচাকের ওই মৌমাছিগুলোর। অবিরাম ওড়াউড়ি। বোলতাদের হলুদ রং রোদ পেয়ে দগদগ করছে। ভর্তাভারী প্রকৃতি দেখার চোখ নিয়ে বসে আছে মৌজসে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে ভৈরবীর দিকে। গনগনে আঁচের মতো রূপ। পঞ্চবটীর ছায়ায় সীতাঠাকরুণ। এক বালতি গঙ্গাজলে গোটাকতক তুলসী পাতা ভাসছে। একটু উঁচুতে সিংহাসনে বসে আছেন রঘুবীর। ভৈরবী মায়ের ঝুলিটিতে কি নেই! সবই আছে। চন্দন কাঠ। চন্দন ঘষার গোল পিঁড়ি। ভোগ নিবেদনের থালা, বাটি, গেলাস।

রঘুবীরকে সব নিবেদন করে ভৈরবী পূজায় বসেছেন। ভর্তাভারীর মনে হল হঠাৎ চারপাশ যেন থম মেরে এল। ফিস ফিস করে যেটুকু বাতাস বইছিল, সে বাতাস আর বইছে না। কানায় কানায় ভরা গঙ্গায় কোনও স্রোত নেই। চিক চিক করে যে কটা পাখি ডাকছিল এতক্ষণ, সব চুপ মেরে গেছে। রঘুবীরের সামনে ভৈরবী স্থিরাসনে। চোখ বুঝে সম্পূর্ণ ধ্যানস্থ। পীতাম্বর ভাণ্ডারী পঞ্চবটীতে ঠিকদুপুরে নতুন কী হচ্ছে দেখার জন্যে আসছিল কুঠিবাড়ির দিক থেকে। ভর্তাভারীকে গাছের ডাল হাতে ওই ভাবে বসে থাকতে দেখে গলা চড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'কি রে শুকনো ডাঙায় মাছ ধরছিস না কী!'

ভর্তা ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে ফিস ফিস করে বললে, 'চুপ।'

পীতাম্বর ভয়ে ভয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, ছায়াশীতল পঞ্চবটীতলের দৃশ্য। দেবী বসেছেন পূজায়। একেবারে স্থির। শ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে কি না সন্দেহ। দু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা। পীতাম্বর ভয়ে ভয়ে সরে পড়ল। পাপের পৃথিবী তবু সহ্য হয়, পুণ্যের পৃথিবী অসহ্য। এত গভীর পাশে দাঁড়ালেও মনে হয় ডুবে গেলুম বুঝি। রাতের বেলা পঞ্চবটীর ত্রিসীমানায় আসার সাহস এই মন্দিরের খুব কম কর্মচারীরই আছে।

রানি রাসমণি যাবেন কাশীধামে, বাবা বিশ্বনাথ দর্শনে। চব্বিশখানা নৌকো। ছমাসের রসদ। সাতটা নৌকোয় শুধু খাদ্যদ্রব্য। একটা নৌকোয় চারটে গাভী। তীর্থযাত্রীরা খাঁটি গোদুগ্ধ সেবন করবে। একটা নৌকোয় থাকবেন রানি স্বয়ং, তাঁর তিন কন্যা ও পরিবারবর্গ। দুটো রক্ষীদের জন্যে। দুটোতে ভৃত্যবর্গ আর পরিচারকরা। চারটে নৌকো আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের জন্যে। দুটোতে জমিদারীর কর্মচারীরা। একটিতে রজক। আর একটিতে চারটি গাভীর খাদ্য খড়-বিচালি। চব্বিশটি নৌকোর বিশাল এক বহর কলকাতার ঘাটে প্রস্তুত। সাজো সাজো রব। বিপদসঙ্কুল জলপথে রানি যাবেন তীর্থে। কাল প্রত্যূষে শুভ মুহূর্তে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়ে যাত্রা। আর আজ রাতে রানির স্বপ্নদর্শন— মা কালী স্বয়ং সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'কোথায় যাবি রাসমণি, কোথাও তোকে যেতে হবে না। ভাগীরথীতীরে মনোরম প্রদেশে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজো আর ভোগের ব্যবস্থা কর, আমি ওই মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়ে তোর নিকট নিত্য পূজা গ্রহণ করব।'

ভোর হল কলকাতার আকাশে। রানি ঘোষণা করলেন, তীর্থযাত্রা স্থগিত। বহর খুলে দাও। যত খাদ্য দ্রব্য রসদ সব বিতরণ করে দাও নিঃস্ব ও দরিদ্রদের মধ্যে। সঞ্চিত ধনরাশি সরিয়ে রাখলেন। আদিষ্ট মন্দির নির্মাণে লাগবে।

গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল। রানি বালি উত্তরপাড়ায় জায়গার অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে বিধিনির্দিষ্ট স্থানটি পেলেন দক্ষিণেশ্বরে। কূর্মাকৃতি এই ভূখণ্ড। একটি অংশের মালিক ছিলেন এক সাহেব। কলকাতার সুপ্রিম

Scanned by CamScanner

কোর্টের অ্যাটর্নি হেস্টি সাহেব। অপর অংশে ছিল কবরখানা আর গাজিপীরের স্থান। এ তো শ্মশান! রাতের বেলায় উত্তরের ঝোপে শকুনছানা ভূতের শিশুর মতো ককিয়ে কাঁদে। প্রেত যে নেই জোর গলায় কে বলতে পারে! এই অঞ্চলটি রাতের বেলায় যার অতি সড়গড় তার নাম রামকৃষ্ণ। উন্মাদের আবার ভূতের ভয় কী।

পীতাম্বর চলে যেতেই এসে হাজির হরি সানাইদার। নহবতে উঠবে। শিল্পী মানুষ। সব সময় সুরেই থাকে, রাতের দিকে একটা আকার যোগ করে এই যা। ভর্তাভারীকে বললে, "বৃন্দাবনী সারঙ্গ-এর সময় হল রে!' হঠাৎ চোখ পড়ল দূরে ব্রাহ্মণীর দিকে। আরও কিছু বলার ছিল, আরোহণ, অবরোহণ। থেমে গেল। দু'হাত জোড় করে নমস্কার করে চলে গেল। এইবার একটু দিবানিদ্রা হবে গঙ্গার ফুরফুরে বাতাসে।

ভর্তাভারীর পাশে এসে এইবার বসল হৃদয়। মধ্যাহ্নের আহারটি বেশ ভালই হয়েছে আজ। গরম ভাত ঘৃতসিক্ত। একতাল আলুভাতে, নিমপাতা ভাজা, সুস্বাদু সোনামুগের ডাল, রোহিত মৎস্য, পায়েসান্ন। হৃদয় অবাক হয়ে দেখছে, ব্রাহ্মণী পাষাণ মূর্তির মতো বসে আছেন ধ্যানাসনে। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। পঞ্চবটী মশা আর মাছির আড়ত ; কিন্তু এই মুহূর্তে তারা সব অদৃশ্য।

যখন এদিকে এইসব হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ তখন তাঁর ঘরটিতে বসে আছেন আত্মভোলা হয়ে। পিতার দেওয়া কুষ্ঠি রাশি অনুসারে নাম, শম্ভুচন্দ্র। তাঁর স্বপ্নদর্শন অনুসারে নাম গদাধর। গদাধর থেকে রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণও ধ্যানস্থ। হঠাৎ তাঁর মনে হল, কী একটা আকর্ষণ তাঁকে পঞ্চবটীর দিকে টানছে। বসে থাকাই দুঃসাধ্য। মুহূর্তে বাস্তবজগৎ অন্তর্হিত। ঘোর লাগা মানুষের মতো রামকৃষ্ণ যেন ভেসে চলেছেন পঞ্চবটীর দিকে।

হৃদয় আর ভর্তাভারী দুজনেই হাঁ করে দেখছে, এইবার কী হয়। ভৈরবী ব্রাহ্মণী ধ্যানে অনড়। মামা সোজা পুজোর জায়গায় নৈবেদ্যর সামনে গিয়ে বসেছে। মুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণের এক পুরুষ। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। রামকৃষ্ণ সব তুলে তুলে, চেখে চেখে খেতে শুরু করলেন। ব্রাহ্মণীর ধ্যান কিন্তু ভাঙল না। হৃদয় ভাবছে এ কি অদ্ভুত লীলা! পূজা শেষ হওয়ার আগেই দেবতার ভোগ মানুষ খেয়ে ফেলছে।

রামকৃষ্ণ খাচ্ছেন, অনেকটাই খেয়ে ফেলেছেন, এমন সময় ভৈরবী চোখ মেলে তাকালেন। রঘুবীরের পাশে শ্রীরামকৃষ্ণ। দুজনেরই অর্ধবাহ্য দশা। পরিবেশে ফিরে আসতে সময় লাগছে। শ্রীরামকৃষ্ণ হুঁশে এসে লজ্জিতভাবে বললেন, 'এই দেখো, আত্মহারা হয়ে কি অন্যায়টাই না করে ফেললুম! কে জানে বাপু কেন এমন করি! এইটাই আমার একটা রোগ।' করুণ মুখে রামকৃষ্ণ তাকিয়ে আছেন ব্রাহ্মণীর আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে। ধ্যান প্রশান্ত মুখে সামান্যতম বিরক্তি নেই। মাতৃস্নেহে উজ্জ্বল। দু চোখে টলটলে জল।

ব্রাহ্মণী বললেন, 'বেশ করেছ বাবা। এ কাজ তুমি করনি, তোমার ভেতরে যিনি আছেন তিনি করেছেন। ধ্যান করতে করতে আমি যা দেখেছি, তাতে নিশ্চয়ই বুঝেছি, কে এরকম করেছে আর কেনই বা করেছে। আমি বুঝেছি, আর আমার আগের মতো বাহ্যপূজার প্রয়োজন নেই। আমার সব পূজা এত দিনে সার্থক হল।'

বাকি প্রসাদটুক ব্রাহ্মণী পরম ভক্তিভরে খেয়ে ফেললেন। উঠে দাঁড়ালেন। পঞ্চবটীর ছায়া অদৃশ্য হচ্ছে সূর্য যত পশ্চিমে ঢলছে। গঙ্গার দিকে তাকানো যাচ্ছে না। ঢেউ ভাঙা সূর্য-কিরণে চোখ ঝলসে যাচ্ছে। রঘুবীর শিলাটিকে কোলে নিয়ে ব্রাহ্মণী চলেছেন বকুলতলার ঘাটের দিকে।

রামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় চললে মা!'

ব্রাহ্মণী বললেন, 'বিসর্জন দিতে।'

হৃদয় লাফিয়ে এল, 'সে কী!'

ব্রাহ্মণী বললেন, 'জীবন্ত রঘুবীর আমার সামনে। শিলাখণ্ডে আর কি বা প্রয়োজন! শিলায় এতকাল যাঁর পূজা ধ্যান করেছি, তিনি আজ নরশরীরে দর্শন দিলেন।'

ভৈরবী ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন জলের কিনারায়। ছল ছল, কলকল প্রবাহিনী গঙ্গা। সূর্য প্রায় অস্তাচলে। শিলাটিকে বিসর্জন দিয়ে ভৈরবী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন স্তব্ধ হয়ে। দীর্ঘকালের দেবতা আমার, অনেক পূজা নিয়েছ। কি রূপে দর্শন দিলে তুমি রঘুবীর!

॥ তিন ॥

এবার সব নিরিবিলি, নিশ্চিন্ত। মন্দির, দক্ষিণেশ্বর গ্রাম ধীরে ধীরে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। যদু মল্লিকের বাগানে একটু আগেও গান বাজনা হচ্ছিল। এখন থেমে গেছে। চারপাশ নীরব, নিথর, এখন। ঘরের একপাশে ভৈরবীর জিনিসপত্র। তালপাতার ব্যাগে পাট করা কয়েকখানি গেরুয়া শাড়ি, পূজার যাবতীয় জিনিস। আর একটিতে শুধু ধর্মগ্রন্থ। তালপাতার এই ধরনের ব্যাগকে বলে খুঙ্গি।

ভৈরবী বসে আছেন আপন মনে একপাশে। গুন গুন করে একটি কীর্তনের সুর ভাঁজছিলেন। রামকৃষ্ণ বাইরের বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। মৃদু মৃদু হাততালির শব্দ। দিবসের শুরু আর শেষ তাঁর কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। দিনের জন্ম, দিনের মৃত্যু। এই সময় শৈশবের কথা খুব মনে পড়ে। পিতার কথা, বাল্যবন্ধুদের কথা।

ঠিক এই সময়টায়, নিশার এই থকথকে অন্ধকারে একটি প্রশ্ন বড় উত্যক্ত করে, আমি কে? শম্ভুচন্দ্র, গদাধর, রামকৃষ্ণ। নাম! নাম তো আসল পরিচয় নয়। তুমি কে? পিতার অধিক বয়সের সন্তান। পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গয়াধামে গিয়েছিলেন। সেখানে একদিন রাতে স্বপ্নে দেখলেন, চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী এক দিব্যমূর্তি। তিনি বলছেন, 'দেখো, আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করব।' আর আমার মায়ের কি হল! দেশের বাড়ির একেবারে কাছেই যে শিবমন্দির আছে, সেই শিবমন্দিরের দিক থেকে ঘনীভূত একটি বায়ু তাঁর উদরে প্রবেশ করল। সেই সময় তাঁর সঙ্গে দুই সঙ্গিনী ছিলেন। তাঁর একজনের নাম ধনী। মা চন্দ্রমণি তাঁর এই অদ্ভুত অনুভূতির কথা দুই সঙ্গিনীকেই জানালেন। কি একটা এল!

এ সবই ওদিকের কথা। এদিকে যে শরীরটা রাসমণির এই কালীবাড়িতে পড়ে রয়েছে সে কে? কোথায় সেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী দিব্য পুরুষ, কোথায় সেই জটাজুটধারী ত্রৈলোক্যনাথ। এই যন্ত্রণাকাতর মানুষটা কে! মথুরবাবু হঠাৎ একদিন কুঠিবাড়ি থেকে ছুটে এল, আমি যেখানে পায়চারি করছি সেইখানে। আমার পা দুটো জাপটে ধরে কাঁদছে, 'তুমি এ কি করচ? তুমি বাবু, রানির জামাই, লোকে তোমায় এমন করতে দেখলে কি বলবে? স্থির হও, ওঠ।' সে কি তা শোনে! তারপর যখন ঠাণ্ডা হল, তখন জানা গেল ব্যাপারটা কি! বললে— 'বাবা, তুমি বেড়াচ্ছ আর আমি স্পষ্ট দেখলুম, যখন এদিকে এগিয়ে আসছ, দেখচি তুমি নও, আমার ওই মন্দিরের মা! আর যেই পেছন ফিরে ওদিকে যাচ্চ, দেখি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব! প্রথম ভাবলুম, চোখের ভ্রম হয়েছে ; চোখ ভাল করে পুঁছে ফের দেখলুম— দেখি তাই! এইরকম যতবার করলুম দেখলুম তাই! বলছে আর কাঁদছে। কি মুশকিল! যত বলি, 'আমি তো কিছু জানি না, বাবু', সে শুনতেই চায় না। ভয় হল, পাছে এ কথা কেউ জেনে গিন্নিকে, রানি রাসমণিকে বলে দেয়! সেই বা কি ভাববে হয়তো বলবে কিছু গুণটুন করেছে।

তবু সেই এক জিজ্ঞাসা, কে আমি?

রামকৃষ্ণ উদভ্রান্তের মতো ঘরে ঢুকলেন। ভৈরবী বসে আছেন খুশ মেজাজে।

রামকৃষ্ণের উত্তেজিত প্রশ্ন, 'বলতে পার মা?'

'কি বাবা?'

'আমি কে?

ভৈরবী স্নিগ্ধ গলায় বললেন, 'তুমিই বলো না, তুমি কে?'

'আমি উন্মাদ।'

'বোসো, আমার কাছে বোসো।'

কোনও রকম সঙ্কোচ নেই গদাধরের। একটি মাত্র লণ্ঠনের মৃদু আলোয় ঘরটি স্নিগ্ধ গম্ভীর। ধুনো আর গুগ্‌গুলের গন্ধ। গঙ্গার বাতাসে গাছপালার পাতায় ঝুস ঝুস শব্দ। যে গদাধর রমণী দেখলে পালিয়ে যান তিনি নিরীহ একটি বালকের মতো বসে আছেন ভৈরবীর পাশটিতে। ভৈরবী গদাধরের পিঠে হাত রেখেই বললেন, 'এত উত্তাপ!'

'কবিরাজের কত ওষুধ খাওয়ালে, কিছুতেই কিছু হল না। মাঝে একটু কমেছিল, আবার যে কে সেই! যেখানে বসি সেই জায়গাটা যেন পুড়ে যায়। চাদরে বসতে ভয় করে যদি পুড়ে যায়। কেন এমন হয়! গঙ্গার জলে শরীর ডুবিয়ে পড়ে থাকি।'

'কী করে হবে বাবা! নরশরীরের ওষুধে দেবশরীর কখনও সারে! এর ওষুধ আমার শাস্ত্রে আছে। ফলে আমি তোমার শরীর শীতল করে দোবো নিমেষে।'

'কিন্তু আমি কে?'

'তুমি কে সেইটাই তোমাকে আর দেশের সবাইকে জানাবার জন্যেই আমি এসেছি বাবা!'

'আমার আরও অনেক প্রশ্ন আছে মা!'

'করো, একে একে করো, আমি তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দোবো।'

'সবাই যখন সব কিছু করে আমি তখন শুধু মা, মা করি কেন?'

'তুমি প্রমাণ করতে এসেছ, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। ঈশ্বরকে

Scanned by CamScanner

জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান। যাঁকে সাধারণ মানুষ মনে করে অধরা, তুমি তাঁকে ধরে প্রমাণ করে দেবে ঈশ্বর বড় কাছের মানুষ। এই তোমার আমার মতো। ঈশ্বরকে দেখা যায়। অবাঙ্মনসোগোচর বেদে বলেছেন। এর মানে বিষয়াসক্ত মনের অগোচর। এ মনের গোচর নয় বটে, শুদ্ধ মনের গোচর। এ বুদ্ধির গোচর নয়— কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি গেলেই শুদ্ধবুদ্ধি হয়। তখন শুদ্ধমন শুদ্ধবুদ্ধি এক। ঋষি মুনিরা কি তাঁকে দেখেননি। অবশ্যই দেখেছেন। তাঁরা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎকার করেছিলেন।'

'তুমি দেখছ মা ?'

'এই তো দেখছি আমার পাশে বসে আছেন তিনি।'

'এ তোমার প্রেম !'

'এই তো, তোমার কথা তুমিই বলে দিলে। তোমারই শাস্ত্র তোমারই পেছন পেছন যাবে। সাধকের অভাবে শাস্ত্রসকল হয়ে আছে মৃত অক্ষরমালা। পণ্ডিতদের অহংকার আর অভিমানে টীকা আর টিপ্পনির আয়তন বেড়েছে। তুমি সেই শাস্ত্রের প্রাণ। ওই যে আমার বইয়ের বান্ডিল, এবার নড়েচড়ে উঠবে। শাস্ত্র তোমাতে আবার তুমিই শাস্ত্রে। তত্ত্বজ্ঞান অশুদ্ধচিত্তে উদিত হয় না। আবার ধর্ম বিনা চিত্তশুদ্ধি অসম্ভব। ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয়ের চোখে দেখা যাবে না। দিব্যচক্ষুর প্রয়োজন। গীতায় শ্রীভগবান বিশ্বরূপ দর্শন করাবার আগে অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দান করলেন, দিব্যংদদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম। আমি তোমাকে সেই চোখ দিচ্ছি সখা যার দ্বারা তুমি দেখবে, ঐশ্বরং যোগং। ঐশ্বর অর্থাৎ যা ঈশ্বর।'

'এ চোখে দেখা যায় না, সাধন করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়— তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে তাঁকে দ্যাখে— সেই কর্ণে তাঁর বাণী শোনা যায়। আবার প্রেমের লিঙ্গ যোনি হয়। এই প্রেমের শরীরে আত্মার রমণ হয়।'

'এ কথা কে বলছেন গদাধর ! তিনিই বলছেন। তুমিই তিনি, তিনিই তুমি। প্রেমের শরীরে আত্মার রমণই তন্ত্র। আমি ভৈরবী, তোমাকে সেই তন্ত্রদীক্ষা দানের জন্যেই আমার ভেসে আসা। মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো। তাবৎ কিঞ্চিন্নসিদ্ধ্যেত যন্ত্রমন্ত্রার্চনাদিকং। যোগ ছাড়া কুণ্ডলিনীর গমনাগমন সিদ্ধ হয় না। কুণ্ডলিনী মূলধারে নিদ্রিতা, তিনি জাগ্রতা না হলে যন্ত্রমন্ত্র পূজা প্রভৃতি কিছুই সিদ্ধ হয় না।'

'তন্ত্র বলে ভগবতী তনু। সকলের অতীত মহাকারণ, মুখে বলা যায় না।'

'এই তো বাবা, তুমি তো সবই জানো।'

'মা যে আমাকে বলে বলে দেয়।'

'দেখো বাবা, তোমার সিন্দুকে তোমারই জিনিস সব ভরা আছে, মা যখন যেটি প্রয়োজন খুলে খুলে তোমাকে এগিয়ে দিচ্ছেন।'

'ঠিক বলেছ মা। মা সেদিন আমাকে বলে দিলেন, দেখো, ভক্ত একটি, ভগবান একটি ; আমি একটি, তুমি একটি ; শরীর যেন সরা। এই শরীরমধ্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ জল রয়েছে, ব্রহ্ম সূর্যস্বরূপ। তিনি এই জলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন। ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে।'

'এতো তুমি পুরাণের মত বললে ! ভাগবত কি বলছেন জান বাবা, আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চিৎজ্জগত্যাং জগৎ। এই বিশ্ব, এই বিশ্বের যা কিছু আমরা দেখতে পাই, সবই আত্মার অর্থাৎ ঈশ্বরের সত্ত্বা ও চৈতন্যের দ্বারা ব্যাপ্ত।'

'আমি কী ভাবে বলি জানো, সমুদ্র আর তার ঢেউ। সমুদ্রে ঢেউ উঠল কিছুক্ষণ নেচে-কুঁদে আবার সমুদ্রেই মিলিয়ে গেল।'

'এ তো তুমি শঙ্করাচার্য বললে। পড়েছ ষট্‌পদী স্তোত্রম ?'

'না, না, পড়াশোনা আমার নেই। মনে সব ফুটে ওঠে, ফুলের মতো।'

'এটাও একটা লক্ষণ।'

'কিসের লক্ষণ ? পাগলের ?'

'সে যখন প্রমাণ করব, তখন জানবে।'

'শঙ্কর কী বলেছেন ?'

'ওই একই কথা, সত্যাপি ভেদাপগমে নাথ, তবাহং ন মামকীনস্ত্বম। সামুদ্রোহি তরঙ্গকচন সমুদ্রো ন তরঙ্গঃ ॥ সমুদ্রের ঢেউ উঠল, নাচল। ভিত্তি কিন্তু সমুদ্র। সমুদ্রের ঢেউ, ঢেউ-এর সমুদ্র নয়।'

গদাধর উত্তেজিত, 'এ কথা আমার। আমি বলি। হলধারীর সঙ্গে তর্ক করি।'

'শঙ্কর আর তুমি একই জায়গায় গেছ, একজন জ্ঞানের পথে, একজন ভক্তির পথে। একটু আগে তুমি খুব উতলা হয়েছিলে, আমি কে, আমি কে করে। এইখানে তার উত্তর, হে নাথ ! তোমা হতেই আমার জন্ম। যতক্ষণ আমার অহং, বিশেষত্ব, ব্যক্তিত্ব, ততক্ষণ আমি তোমার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে, তোমার আশ্রয়ে, তোমার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে জগৎনাট্যে আমার নির্দিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছি। অভিনয় শেষ হলেই তোমাতে মিলিয়ে যাই। তখন আমার অস্তিত্ব—তোমাতে অভেদে বর্তমান থাকে। আমি তোমার, তুমি আমার নও।'

পদশব্দ এগিয়ে আসছে। ব্যক্তিত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। লণ্ঠনের মৃদু আলো। গঙ্গার বাতাসে কাঁপছে। দেয়ালে এক জোড়া ছায়া। গদাধর একটি বালকের মতো বসে আছেন। পাশেই ভৈরবী। নিশ্চেষ্ট, শিথিল। দেশে দেশে কত ঘোরাঘুরি, শরীরের কমনীয়তা এতটুকু কমেনি। যৌবনে ভাঁটা পড়েনি।

দরজার সামনে মথুরামোহন। থমকে গেছেন। ভাবতেও পারেননি রামকৃষ্ণের ঘরে এক নারী এই সময় থাকবেন। মৃদু আলোতে যা দেখছেন, তাইতেই মনে হচ্ছে লছমিবাই কোথায় লাগে। বাবা কি তাহলে টলে গেলেন !

গদাধর নিজের ভাবেই বললেন, 'সেজবাবু কখন এলে ? ভেতরে এসো না ! দেখো কে এসেছে ! আমার মা এসেছে।'

মথুরামোহন জুতো ছেড়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, তোমার মা তো মন্দিরে !'

'সে ভবতারিণী। এ আমার মা যশোদা। আমার সব সারিয়ে দেবে বলেছে।'

'তোমার হয়েছেটা কি যে সারাবেন !'

'কিছু তো একটা হয়েছে, তা না হলে কবিরাজের কাছে গেলে কেন ?'

'সে তো দেখলে, অতবড় কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ বলে দিলেন, তোমার বায়ুরোগ। বিটকেল গন্ধ যত মালিশের তেল। কিন্তু মনে আছে, সেইখানেই একদিন উপস্থিত ছিলেন পূর্বাঞ্চলের এক পণ্ডিত কবিরাজ। তিনি হৃদয়কে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কি কোনও যোগ অভ্যাস করেন। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে যোগী। সে কথা না শুনলে তুমি, না শুনল তোমার হৃদয়, গঙ্গা কবিরাজের কথা ছেড়েই দাও।'

ভৈরবী এইবার মুখ খুললেন। 'বাবা মথুরামোহন জগদম্বার নির্দেশে তুমিও এখানে আমিও এখানে। যার নাম তুমি রামকৃষ্ণ রাখলে সেই তোমাকে অমর করবে। এই শরীরে তোমারও যেমন ইষ্টদর্শন হয়েছে, আমারও আজ হয়েছে। এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।'

গদাধর হাততালি দিয়ে মহানন্দে বললেন, 'বুঝেছি, এইবার বুঝেছি। ও সেজবাবু একটু বোসো না।' মথুরবাবু ভালবাসেন বলেই জানবাজারের জমিদারি, রাতের কলকাতার আমোদ প্রমোদ ছেড়ে ছুটে ছুটে আসেন। না এসে পারেন না। এই রামকৃষ্ণ এক অদ্ভুত আকর্ষণে বেঁধে ফেলেছে। দুষ্ট লোকে বলে, মথুরামোহন শেষে তোমার এই হল ! গ্রামের এক অর্ধোলঙ্গ বামুন বশীকরণ মন্ত্র ঝেড়ে তোমার মতো এক দুঁদে মানুষকে বশ করে ফেললে ! কখনও মনে হয় রামকৃষ্ণ আমার বাবা, কখনও মনে হয় রামকৃষ্ণ আমার ছেলে। মন্দিরে তার পুজো দেখে রানিকে বলেছিলুম, পাষাণ প্রতিমা এইবার সত্যিই জাগবে। কলকাতার পণ্ডিতসমাজের পুরোহিতরা উপেক্ষা করেছিলেন, কৈবর্তের কালী, কে দেবে অন্নভোগ। সেই কালী এইবার কালকে জাগাতে চলেছে !

সেজবাবু বসলেন, 'বলো, কী এত বুঝলে যে অমন হাততালি !'

'তাহলে আমি ঘটনাটা বলি !'

'বলো, তুমি যা বলবে সব শুনব ?'

'এই বছর দেড়েক আগে, কামারপুকুর থেকে পালকি করে সিহড়ে হৃদয়ের বাড়িতে যাচ্ছি। পথটা ভারী সুন্দর গো, যেন ভগবানের বাগান ! নীল আকাশ, বিশাল বিশাল মাঠ, সবুজ ধানখেত, বড় বড় অশ্বত্থগাছ, ছায়া, পাখির ঝাঁক, ফুলের গাছ, ফুলন্ত লতা। হঠাৎ দেখি কি, আমার দেহ থেকে কিশোরবয়স্ক দুটি সুন্দর বালক বেরিয়ে এল। কখনও তারা পালকির পাশেপাশে যাচ্ছে, কথা বলছে, হাসছে ইয়ারকি করছে, আবার কখনও চলে যাচ্ছে দূরে বনফুলের সন্ধানে। এই কাছে, তো এই দূরে। অনেকক্ষণ এই খেলা হল, শেষে দুজনেই ঢুকে পড়ল আবার আমার শরীরে !'

ব্রাহ্মণী বললেন, 'বাবা, তুমি ঠিক দেখেছ, আমি একটু আগে যা বলেছি এই দর্শন তারই সমর্থন। এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব— শ্রী নিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এবার একসঙ্গে এসে তোমার ভেতর রয়েছেন। সেইজন্যেই তোমার ওইরকম দর্শন হয়েছিল। চৈতন্য-ভাগবতের দুটো শ্লোক শোনো—

অদ্বৈতের গলা ধরি কহেন বারবার
পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার।
কীর্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার ॥
অদ্যাবধি গৌরলীলা করেন গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥'

Scanned by CamScanner

মথুরবাবু বললেন, 'আপনি তো সাধারণ নন। আমার তো জানতে ইচ্ছে করছে এ দেশের মেয়েরা পর্দানসীন, লেখাপড়াও শেখে না, এ যুগের মেয়ে হয়ে আপনি কি ভাবে এমন বিদুষী হলেন। আপনার চেহারা বলছে, আপনি খুব বড় পরিবারের মেয়ে। সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন ?'

'শোনো সেজবাবু, শোনার যখন মন হয়েছে, ভাগবতের এই শ্লোকটি শোনো,

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকলপং গুরুকর্ণধারং।
মায়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

মথুরবাবু বললেন, 'সংস্কৃতের স-ও যে জানি না।'

'চুরাশি লক্ষ যোনিতে ঘুরে ঘুরে অবশেষে এই মনুষ্যজন্ম। মানুষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভগবানের ক্রমবিবর্তন শক্তি শুধু কাজ করেছে। তখন আত্মশক্তি প্রয়োগের সুযোগ ছিল না। এখন সেই সুযোগ মিলেছে। যখনই আমি মানুষ হয়েছি তখনই আমার প্রতিষ্ঠা হয়েছে ক্রমোন্নতির সোপানে। এটি আমি পেলাম নিজের চেষ্টায় নয়, তাঁর কৃপায়। হো গয়া অ্যাইসি। তাহলে আমার চেষ্টা ছাড়াই যা পেয়েছি তা সুলভ, আমি এখন মনে করছি সুলভ, আসলে এটি দুর্লভ। এর জন্যে চুরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করতে হয়েছে। প্রতিটি যোনিতে অল্প অল্প উন্নতি হতে হতে পরিশেষে মরদেহ, অতএব সুদুর্লভ। তাহলে তিনটি বিশেষণ, আদ্যং, সুলভং সুদুর্লভং। এখন কি করা উচিত মানুষ তোমার। গুরু কর্ণধারং। হালটি ছেড়ে দাও গুরুর হাতে। তিনি তোমাকে ঠিক পৌঁছে দেবেন ভগবান পাদপদ্মে। এখন গুরু তুমি পাবে কোথায়। গু শব্দের অর্থ ধর্ম রু হল দান করা। তোমাকে কে চেনাবেন তোমার চরৈবেতি ধর্ম। ভগবানই মিলিয়ে দেবেন গুরুকর্ণধার যথাসময়ে। এইবার অনুকূল বায়ুর যে প্রয়োজন। তাও আছে। তিনিই তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন, অন্তর্বহিস্তনুভূতামশুভবিধুন্বন্, সব অশুভ ভগবানই দূর করেন।'

মথুরবাবু প্রশ্ন করলেন, 'সবই যদি ভগবান করেন, তাহলে মানুষের আর কি করার থাকে ?'

অবশ্যই আছে। নৌকোর পাল কে টাঙাবে, কে টানবে দাঁড়! শাস্ত্র একেই বলছেন— সংরাধন। ছান্দোগ্য শ্রুতি স্পষ্ট করে বলছেন, যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবওরং ভবতি। ধৈর্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি আর বিশ্বাস সম্বল করে দৃঢ় পদে এগোনোর নামই সংরাধন।'

'সবাই তো তা করবে না।'

'তারা আত্মঘাতী— পুমান ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।'

'আমি একটা গান গাইব সেজবাবু ?' গদাধর প্রস্তাব করল।

মথুরবাবু বললেন, 'তোমার গান, সে ত পরমধন! অমন গান কে গাইতে পারে বাবা!'

রামকৃষ্ণ উঠে দাঁড়ালেন। লণ্ঠনের আলো কল ঘুরিয়ে কমিয়ে দিলেন। কৃষ্ণপক্ষের রাত। গঙ্গার হু হু বাতাস। শুকনো পাতা উড়ছে। তারই শব্দ। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণ গাইছেন। মথুর লক্ষ করলেন রামকৃষ্ণ বেশ রোগা হয়ে গেছেন।

মন রে কৃষি কাজ জানো না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা।
কালী নামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না ॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তিবারি সেঁচে দেনা।
একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না ॥

রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না— গাওয়া মাত্রই রামকৃষ্ণের সেই ভাবটা এল, ডান হাত আকাশের দিকে, বাঁ হাত বুকের কাছে, আঙুলগুলি দলবদ্ধ। মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত, যেন অলৌকিক কোনও দর্শন চলেছে। দেহকাণ্ড স্থির। হাত জোড় করে বসে আছেন ভৈরবী আর মথুরবাবু। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় ঘরটি রহস্যময়। উদ্যানে রাতের ফুল ফুটেছে। গন্ধ উড়ে আসছে গঙ্গার বাতাসে। মথুরবাবু এই ভাবের কথা শুনেছিলেন আজই প্রথম দর্শন হল। তিনি স্তম্ভিত। দৈবাদিষ্ট হয়ে রানি একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কে জানত সেখানে এমন লীলা হবে!

ভৈরবী মৃদুস্বরে বললেন, 'অন্তরে আনন্দ আস্বাদ বাহিরে বিহ্বল।'

ভৈবরী শ্রীচৈতন্য ভাগবত থেকে সার্বভৌমের চৈতন্যস্তুতির শ্লোক বিশেষ সুর করে বলতে লাগলেন, 'অচিন্ত্য অগম্য প্রভু তোমার বিহার। তুমি না জানালে জানিবার শক্তি কার ॥'

॥ চার ॥

সকালের মন্দির। নারায়ণ শাস্ত্রী আজ চণ্ডীপাঠ করছেন। মথুরবাবু ধোপদুরস্ত হয়ে কুঠিবাড়ি থেকে মন্দিরের দিকে চলেছেন। খাজাঞ্চিমশাই পাশে পাশে আসছেন আর একই কথা বারে বারে, 'উত্তর দিকের ওই জমিটা।'

মথুরবাবু একটু উষ্ণ হয়েই বললেন, 'সাতসকালেই কি জমি জমি করছ! এমন একটা জায়গায় রয়েছ, এই সময়টায় ঈশ্বরচিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা আসে কী করে!'

খাজাঞ্চিমশাই আমতা আমতা করে বললেন, 'সায়েব কোম্পানির ওই বারুদঘর পরে মহা সমস্যা করবে সেজবাবু। আগুন লাগলে মন্দিরটন্দির সব উড়ে যাবে। মামলা ছাড়া উপায় নেই!'

'মামলা করতে হলে করতে হবে, অনেক মামলাই আমরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে করেছি। মামলার কথা মামলার জায়গায় হবে। আপনি আপনার কাজে যান। রামধন দেওয়ানের সঙ্গে পরে কথা হবে।'

মথুরামোহনের চোখ চলে গেছে ভৈরবীর দিকে। তিনি পশ্চিমের পথ ধরে মন্দিরের দিকে চলেছেন। পিঠে ছড়িয়ে আছে এলোচুল। টকটকে গেরুয়া শাড়ি। এত রূপ! মামলার কথায় মনের ঈশ্বরভাবনা বিক্ষিপ্ত হচ্ছে বলে রেগে গিয়েছিলেন। এখন ভৈরবীর রূপ দেখে জানবাজারের মথুরামোহন জেগে উঠল। কীটের নড়াচড়া। রূপে আর গুণে অসামান্যা। রামকৃষ্ণ বলেছে। মন্দিরের সবাই বলছে। তিনি গুণের কিছু কিছু পরিচয় ইতিমধ্যে পেয়েছেন ; কিন্তু একা একজন মহিলা, সুন্দরী মহিলা সংসার ত্যাগ করে দুরূহ তন্ত্রসাধনা করলেন, ভারতের যত্রতত্র ঘুরে বেড়ালেন, ষোড়শীর সেই শরীর কেউ ভোগ করেনি, এ কি বিশ্বাস করা যায়! ধর্মের জগতের বাইরে বিশাল অধর্মের জগৎ। হাঙর, কুমির লাট খাচ্ছে। এমন ভোগের জিনিস পরখ না করে ছেড়ে দেবে! ভৈরবী! তোমার চরিত্র সম্বন্ধে যে সন্দেহ জাগছে। আমি মথুরামোহন, আলো আর অন্ধকার, দুটো জগতেই আমার যাওয়া আসা আছে। দক্ষিণেশ্বরে যেমন আসি, মেছুয়াবাজারেও সেই রকম যেতে হয় কারণে অকারণে। লেঠেল জোগাড় করতে হয় অন্য জমিদারের মাথা ফাটাবার জন্যে। আদালতে যেতে হয় সরকারকে শায়েস্তা করতে। আবার ঝাড় জ্বেলে শ্যামপেনের ফোয়ারা ছোটাতে হয় সায়েবদের রসেবশে রাখতে।

ভাবতে ভাবতেই মথুরামোহন বাঁধানো চাতাল অতিক্রম করে চলে এসেছেন মায়ের মন্দিরে। ঠিক সেই সময় ভৈরবী বেরিয়ে আসছেন দর্শন শেষে। হঠাৎ মথুরামোহনের মুখ ফসকে বেরিয়ে এল অশালীন একটি প্রশ্ন— কণ্ঠস্বরে সামান্য বিদ্রূপ— 'ভৈরবী, তোমার ভৈরব কোথায় ?'

নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনাল। তবু করে যখন ফেলেছেন আর ফেরবার উপায় নেই।

ভৈরবীর কোনও ভাবান্তর নেই মুখে। সকালের মতোই প্রসন্ন। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বিরাটকায় মথুরামোহনের মুখের দিকে। এমন সরাসরি তাকানোয় মথুরবাবুর খুব অস্বস্তি হচ্ছে। তার চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস খুব কম মানুষেরই আছে। এই দৃষ্টিতে তার ভেতরটা যেন খুলে যাচ্ছে। সব গোপনীয়তার উদ্ঘাটন। মথুরামোহন ভৈরবীর দিকে আর তাকাতে পারছেন না।

ভৈরবী স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'ওই যে।'

শ্রীশ্রী জগদম্বার পদতলে শায়িত শবরূপী মহাদেবকে দেখালেন আঙুল তুলে।

মথুরবাবু বললেন, 'ও ভৈরব তো অচল।'

ভৈরবী এইবার অতি ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন, 'যদি অচলকে সচল করতেই না পারব, তবে আর ভৈরবী হয়েছি কেন ?'

মথুর লজ্জিত, অপ্রতিভ, নির্বাক।

ভৈরবী ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। নারায়ণশাস্ত্রী দৃপ্ত কণ্ঠে, বিশুদ্ধ উচ্চারণে চণ্ডীপাঠ করছেন—

রসে রূপে চ গন্ধে চ শব্দে স্পর্শে চ যোগিনী।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব রক্ষেন্নারায়ণী সদা ॥

হৃদয় প্রচুর ফুল আর ফুলের মালা নিয়ে আসছে, প্রায় বেসামাল অবস্থা। যে দেখছে সেই প্রশ্ন করছে, কী ব্যাপার ? আজ তো কোনো পার্বণ নেই। এত ফুল কি হবে হৃদয়ও জানে না। ভৈরবী মহাখুশি। হৃদয়কে বললেন, 'বাঃ, খুব ভাল ফুল পেয়েছে। এইবার চাই চন্দন। একটু আধটু নয়, অনেকটা।'

হৃদয় বললে, 'সেও আমি আনছি।'

'সোজা চলে এসো তোমার মামার ঘরে।'

হৃদয় চন্দনকাঠ, চন্দন ঘষার পিঁড়ি বের করেছে হলধারী জিজ্ঞেস করলেন, 'টেনেটুনে ওসব বের করছ কেন, পুজোর জিনিস।'

'ভৈরবী মা-র লাগবে।'

'কেন লাগবে ?'

'জানি না। আমাকে নিয়ে যেতে বলেছে নিয়ে যাচ্ছি।'

Scanned by CamScanner

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস ?'

'গদাই মামার ঘরে।'

'তাহলে ওটাও একটা মন্দির হতে চলেছে।'

'মামা ! তুমি পুজো করছ করো না। সব ব্যাপারে মাথা না-ই বা ঘামালে !'

'কোনও মানুষ যদি নিজেকে ভগবান ভাবে আমার হাড়পিত্তি জ্বলে যায়।'

'গদাইমামার পুজো দেখে তুমি মুগ্ধ হয়ে আমার সামনেই বলেছিলে— রামকৃষ্ণ এইবার আমি তোকে চিনেছি।'

'বলেছিলুম বুঝি ? সে আমার মতিভ্রম হয়েছিল।'

'গদাইমামা তোমাকে বলেছিল, দেখ, আবার যেন গোলমাল হয়ে না যায়। তখন তুমি বেশ জোর গলায় বলেছিলে, এবার আর তোর ফাঁকি দেবার যো নেই, তোতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরীয় আবেশ আছে। এবার একেবারে ঠিকঠাক বুঝেছি।'

'ওই যে বললুম, ভীমরতি। সেই বয়েস হয়নি তবু হয়েছে !' বলে, ভাবে আমি পরনের কাপড় ফেলে দি, ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে পৈতে ত্যাগ ! কত জন্মের পুণ্যে মানুষের ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হয়। আবার আমাকে বোঝাতে আসে, তুমি শাস্ত্রে যা যা পড়ছ, সে-সব অবস্থা আমার উপলব্ধি হয়েছে, আমি ওসব কথা বুঝতে পারি। ব্যাটা গণ্ডমূর্খ ! বলে কি না শাস্ত্রের কথা বুঝতে পারি। মূর্খ কোথাকার, কলিতে কল্কি ছাড়া ঈশ্বরের আর কোন অবতারের কথা, কোন শাস্ত্রে লেখা আছে। এনে দেখা ! আমি সেইদিন বুঝে গেছি, ঈশ্বর নয় ওর ঘাড়ে চেপেছে ব্রহ্মদৈত্য।'

'এটা আবার কোনদিন বুঝলে ?'

'এই তো কিছুদিন আগে, দুপুরবেলা, পঞ্চবটীর দিক থেকে আসছি, দেখি একটা গাছের উঁচু ডাল থেকে ছরছর করে জল পড়ছে। ওপর দিকে তাকালুম, একটা কাপড় ঝুলছে, পাশের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে উলঙ্গ গদাই, সেই অবস্থায় মূত্র ত্যাগ করছে। ওটা কি আর মানুষ আছে !'

'তাহলে সেদিন আবার পায়ে ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করলে কেন ?'

এইবার হলধারী নীরব। মায়ের মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর হৃদয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'এই মাকে আমি মনে করতুম তামসী, মৃত্যুস্বরূপিণী, ঘোরা, উল্লঙ্গিনী, সৃষ্টি ধ্বংসকারিণী। বলে ফেলেছিলুম, তামসী মূর্তির উপাসনায় আধ্যাত্মিক উন্নতি কখনও হতে পারে কি ? তুমি ঐ দেবীর আরাধনা করো কেন ? চুপ করে শুনলে। মুখটা কেমন হয়ে গেল। ধীরে, ধীরে চলে এল এই কালীমন্দিরের দিকে। কিছুক্ষণ পরেই ছুটে এল পাগলের মতো। কী করছে বোঝার আগেই চড়ে বসল আমার কাঁধে, তুই মাকে তামসী বলিস শালা। মা কি তামসী ? মা যে সব— ত্রিগুণময়ী, আবার শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী। কি জানি হৃদু, সে আমাকে কি যে একরকম করে দিলে, আমি সব ভুলে তার ভেতর সাক্ষাৎ ঈশ্বরপ্রকাশ দেখতে পেলুম। সামনে ছিল ফুলচন্দন। দিয়ে দিলুম পায়ে।'

ভৈরবী জিজ্ঞেস করলেন, 'এত দেরি হল হৃদু। যত বেলা বাড়বে ফুল যে তত শুকিয়ে যাবে। শুকিয়ে গেলে তো কাজ হবে না।'

'হলধারী মামার নানা প্রশ্ন।'

রামকৃষ্ণ মেঝেতে বসেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'সব ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছিস ত হৃদু। ও বাকসিদ্ধ। রেগে গিয়ে যা বলবে, তাই হবে। মনে আছে, আমাকে বলেছিল, তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে। আমার মুখ দিয়ে সত্যিই রক্ত উঠল।'

ভৈরবী বললেন, 'সে আবার কি ! কী এমন করেছিলে যে তোমাকে শাপ দিলেন !'

'হলধারীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এমন যে এই ভাব তো এই ঝগড়া। ও কিন্তু খুব পণ্ডিত। অনেক লেখাপড়া। আসলে ও বৈষ্ণব। বৈষ্ণবতন্ত্রমতে পরকীয়া প্রেমসাধনের একটা ব্যাপার আছে। হলধারী গোপনে ওইসব করত। কিন্তু জানাজানি হয়ে গেল। জানাজানির পর কানাকানি। আড়ালে হাসাহাসি। কেউ সাহস করে সামনে কিছু বলত না। বাকসিদ্ধ। যা শাপ দেবে তাই হবে। লোকে দাদার নিন্দামন্দ করছে, আমার মনে বড় লাগল। একদিন ভাবের ঘোরে খুব তিরস্কার করলুম। আমার ওপর ভীষণ রেগে গিয়ে বললে, 'তুই আমার চেয়ে বয়সে ছোট হয়ে আমার অবজ্ঞা করলি, তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে।' অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলুম শুনলে না।' ভৈরবী চন্দন ঘষতে ঘষতে শুনছিলেন, বললেন, 'তারপর কী হল !'

'দশ বারোদিন পরে একদিন রাত আন্দাজ আটটা নটার সময় হঠাৎ মনে হল তালুটা খুব সড়সড় করছে। তারপর দেখি কি মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। সিমপাতার রসের মতো মিসকালো রং— এত গাঢ় যে, কতক বাইরে পড়তে লাগল আর কতক মুখের ভেতরে জমে গিয়ে সামনের দাঁতের ফাঁক বেয়ে বটের জটের মতো ঝুলতে লাগল। মুখের ভেতর কাপড় ঠেসে ধরলুম তাও থামল না। তখন খুব ভয় হল। খবর পেয়ে সবাই ছুটে এল। হলধারী তখন মন্দিরে সেবার কাজ সারছিল, সেও এসে পড়ল শশব্যস্তে। তাকে বললুম, 'দাদা শাপ দিয়ে তুমি আমার এ কি অবস্থা করলে, দেখো দেখি !' সে কাঁদতে লাগল।

ভৈরবী শিল থেকে আঙুল দিয়ে চেঁছে চেঁছে চন্দন তুলছেন পাথরের বাটিতে। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি, 'তারপর' ?

'তারপর ঠাকুরবাড়িতে সেদিন একজন প্রাচীন বিজ্ঞ সাধু এসেছিলেন। গোলমাল শুনে তিনিও আমাকে দেখতে এলেন। রক্তের রং আর মুখের ভেতরে যে জায়গাটা থেকে ওটা বেরিয়েছে তা পরীক্ষা করে বললেন, ভয় নেই। রক্ত বেরিয়ে যাওয়ায় খুব ভালই হয়েছে। তুমি যোগ সাধনা করতে। এইটাই তার প্রমাণ। হঠযোগের চরমে জড়সমাধি হয়, তোমারও তাই হতে চলেছিল। সুষুম্নাদ্বার খুলে গিয়ে শরীরের রক্ত মাথায় উঠছিল। মাথায় না উঠে ওটা যে এইভাবে মুখের ভেতর দিয়ে বেরবার পথ আপনাআপনি করে নিয়ে বেরিয়ে গেল, তাতে বড়ই ভাল হল ; কারণ জড়সমাধি হলে আর কিছুতেই ভাঙত না। তোমার শরীরটা দিয়ে জগন্মাতার বিশেষ কোনও কাজ আছে, তাই তিনি তোমাকে এইভাবে রক্ষা করলেন।'

ভৈরবী বললেন, 'বাবা ! আমি থাকলে ওই একই কথা বলতুম। হলধারীবাবার শাপ তোমার পক্ষে বরই হয়েছে।'

ভৈরবীর চন্দনবাটা শেষ হল। হৃদয় বুঝতে পারছে না, এরপর কি হবে ! কোন দেবতার পূজা হবে ! রামকৃষ্ণ বসে আছেন। ভৈরবী তাঁর কাছে গিয়ে সারা শরীরে চন্দন মাখাতে লাগলেন। তুলোর মতো নরম একটি শরীর। জপ আর ধ্যান করে করে বক্ষদেশ টকটকে লাল।

রামকৃষ্ণ শিশুর মতো প্রশ্ন করলেন, 'আমাকে এত চন্দন মাখাচ্ছ কেন মা !'

'তোমার শরীরের এই জ্বলে গেল, পুড়ে গেল ভাবটা কমে যাবে। মহাপ্রভুরও এমন হত। তাঁকে ফুলের মালা পরানো হত, চন্দনচর্চিত করা হত !'

'মহাপ্রভুর কী কী হত মা আমার যে খুব জানতে ইচ্ছে করছে !'

অপূর্ব দেখাচ্ছে রামকৃষ্ণকে। গলায় দুলছে জুঁই ফুলের গোড়ের মালা। কানের দুপাশে দুলছে মালা। কোলের ওপর রাশীকৃত ফুল। কপালে চন্দনের ফোঁটা। বড় ফোঁটাটিকে কেন্দ্রে রেখে ছোট ছোট ফোঁটা নেমে এসেছে দুপাশের গালে। তিনি বসে আছেন আসনে জীবন্ত এক বিগ্রহের মতো।

মথুরবাবু এসে পড়েছেন। থমকে দাঁড়িয়ে আছেন দরজার বাইরে। কিছু আগে মন্দিরে ভৈরবীর সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি খুব লজ্জা পেয়েছেন। নিজেকে তিরস্কার করেছেন। রামকৃষ্ণের একটি কথা বারে বারে মনে এসেছে— মুলো খেলে মুলোর ঢেকুরই ওঠে। বিষয়ীর মন মাছির মতো, মধুতেও বসে, আর যদি পচা ঘা পায় তখনি মধু ফেলে পচা ঘায়ে গিয়ে বসে। যার চোখে যে-রঙের চশমা দুনিয়াটাকে সে সেই রঙেরই দেখে।

মথুর বললেন, 'বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে। রামকৃষ্ণ পুজা।'

ভৈরবী বললেন, 'ভবিষ্যৎ কি দেখতে পাচ্ছ মথুর ?'

এই মথুর সম্বোধনের মধ্যে এমন একটা তীব্র ব্যক্তিত্ব ছিল, যে নিমেষে মথুরামোহনের জমিদারি অহঙ্কার গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ল। রানির মৃত্যুর পর মথুরামোহনই সব। কলকাতার মাথাঅলা লোকদের তিনি একজন। রানি তাঁকে নিজের হাতে তৈরি করেছেন। আর দুই জামাইকে পারেননি। মথুরামোহনে তিনি দেখেছিলেন অন্য এক থাকের মানুষকে ! বিলাসিতা নয় মথুর, ধর্মে বসে কর্ম এই হবে তোমার ধর্ম। রানি তাঁর মধ্যে ভরে দিয়েছিলেন শৌর্য, বীর্য। ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন উচ্চ চিন্তা। সেই শক্তির স্পর্শে মথুরামোহন সামান্য এক জমিদার নন, এক মহাযজ্ঞের হোতা। এই মন্দির নির্মাণের সেই দিনগুলির কথা মথুরামোহনের মনে পড়ছে। আজ রানি নেই সেদিন তিনি ছিলেন পাশে। রামকৃষ্ণ যা বলেন তাই ঠিক। রানিকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন। মথুরকে বলেছিলেন, রানি কে তা জানো ! জগন্মাতার অষ্টনায়িকার এক নায়িকা। মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী অপরাজিতা নন্দিনী নারসিংহী কৌমারী। রানি হল মঙ্গলা, সাক্ষাৎ মা দুর্গা।

মথুর নিরুত্তর। ভৈরবী জোর গলায় বললেন, 'ভবিষ্যৎ !'

মথুর ভেতরে ভেতরে চমকে উঠে অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এসেই বললেন, 'আপনি কিছু মনে করেননি তো মা !'

'মাকে কেউ আপনি বলে ! কী মনে করব মথুর ! কেন মনে করব ! তোমার ভবিষ্যৎ যে আমার চোখের সামনে খেলছে !'

'আমি গুবরে পোকা গোবরে থাকি। ওই বাবা আমাকে বলেছে।'

Scanned by CamScanner

'বাকিটা বলেনি বুঝি ! আমার জন্যে রেখে দিয়েছে ! বেশ আমিই বলি তাহলে। এক গুবরে পোকার সঙ্গে এক মৌমাছির খুব বন্ধুত্ব হয়েছে। মৌমাছি রোজই গুবরে পোকাকে বলে, ভাই ! আমি কেমন ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াই আর তুমি দিনের পর দিন গোবরে মুখ জুবড়ে পড়ে আছ, আমার ভাল লাগে না। চলো না আমার সঙ্গে ফুলের দেশে। সুন্দর গন্ধ, সুস্বাদু মধু। গুবরের রোজই এক উত্তর, ফুলের দেশ আবার কী আমার এই গোবরের দেশে আমি বেশ আছি ! মৌমাছি বড়ই নাছোড়বান্দা। গুবরেকে ফুলের দেশে নিয়ে যাবেই। মৌমাছির ঘ্যানঘ্যানানিতে বিরক্ত হয়ে গুবরে একদিন বললে, ঠিক আছে, চলো। দেখে আসি তোমার ফুলের দেশ।

'মৌমাছি গুবরেকে বিশাল একটা গোলাপবাগানে এনে সবচেয়ে তাজা, সবচেয়ে বড় একটা গোলাপে বসিয়ে দিলে। মৌমাছি নিজে ফুলে ফুলে উড়ছে আর একবার করে এসে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করছে, কি ভাই ! কেমন লাগছে ?

'গুবরের সেই একই উত্তর, কই, তেমন তো কিছু বুঝছি না, সেই একই গোবরের গন্ধ, আর স্বাদ।

'মৌমাছির খুব আশ্চর্য লাগছে। ব্যাপারটা কী ! এত সুন্দর গোলাপের গন্ধ গুবরে পাচ্ছে না !

'যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর ! মৌমাছি খুব কাছে গিয়ে গুবরেকে পরীক্ষা করে দেখে কী, বিষয়ী তো, তাই খুব হিসেব, অচেনা দেশে যাচ্ছে, খেতে পাবে কি পাবে না, তাই চোখে মুখে নাকে করে খানিকটা গোবর নিয়ে এসেছে। ফুলের দেশে এলে কি হবে, গোবরই খাচ্ছে, গোবরই শুঁকছে, গোবরই দেখছে। ফুলের সম্ভোগ হবে কী করে ! মৌমাছি তখন একটা কৌশল করলে। বললে, ভাই গুবরে, পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, এখানে যে গঙ্গাস্নান করতে হয়। চলো, তোমাকে স্নান করিয়ে আনি। গুবরেকে বেশ করে স্নান করাতেই তার সব গোবর ধুয়ে গেল। মৌমাছি তখন তাকে নিয়ে এল এক পদ্মবিলে। সবচেয়ে বড় একটা পদ্মফুলে বন্ধুকে বসিয়ে দিয়ে বললে, কী কেমন লাগছে এবার !

'গুবরে বললে, আহা কী গন্ধ !

'মৌমাছি বললে, হুল ফোটাও, হুল ফোটাও। গুবরের হুল ফোটাতে খুব কষ্ট হচ্ছে। গোবরে থাকার ফলে হুল ভোঁতা মেরে গেছে। কষ্টে সৃষ্টে যাঁহাতক ফোটাল, পদ্মমধু একেবারে মাথায় গিয়ে চড়েছে। গুবরে একেবারে বুঁদ। অর্ধবাহ্যদশা। সাড়া শব্দ নেই আর। মৌমাছির খুব আনন্দ। সে এবার ফুলে ফুলে উড়তে লাগল আর গুন গুন করে গাইতে লাগল। একসময় দিন শেষ হল। পদ্মটি মুড়ে গেল। গুবরে রয়ে গেল সেই পদ্মের ভেতরেই। পরদিন সকালে শিবমন্দিরের পুরোহিত এসে সবচেয়ে বড় প্রস্ফুটিত সেই পদ্মটিকে তুলে নিয়ে গেলেন মন্দিরে শিবপূজার জন্যে। গুবরে পোকাটি যে ভেতরে বসে আছে, তা আর লক্ষ করলেন না, চাপিয়ে দিলেন শিবের মাথায়। বেলা যখন একটা দেড়টা হবে তখন গুবরে পোকার হুঁশ হয়েছে। দেখছে যে সে শিবের মাথায় চড়েছে। তখন বন্ধুর ওপর খুব শ্রদ্ধা হয়েছে। ভাবছে, বন্ধুর কি কেরামতি ! ছিলুম গোবরগাদায়, আর চড়িয়েছে একেবারে শিবের মাথায় ! বেলা বাড়ল। পূজারি এইবার মন্দির পরিষ্কার করবেন। ফুল সব শুকিয়ে এসেছে রোদের উত্তাপে। সব ফুল একত্র করে ভাসিয়ে দিলেন গঙ্গায়। গুবরে পোকা পদ্মে বসে স্রোতে ভেসে চলেছে। এদিকে মৌমাছি বন্ধুকে অনেকক্ষণ দেখতে না পেয়ে চিৎকার করে ডাকছে, বন্ধু, বন্ধু ! বহুদূর থেকে গুবরে সেই ক্ষীণ ডাক শুনে উত্তর দিচ্ছে আর ভেসে যাচ্ছে— 'ভাই, তোমার কৃপায় আমি ফুলের দেশ দেখেছি, মধু খেয়েছি, শিবের মাথায় চড়েছি ; এখন গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে সাগরে চলেছি, আর আমায় ডেকো না।' মথুর তুমি বুদ্ধিমান, হয়তো বুঝলে !'

'বুঝেছি মা। অনেক আগেই বুঝেছি। আমাকে গোখরোতে ধরেছে।'

'এই তো, ঠিক কথাটি বলে ফেলেছে বাবা। বৈদ্যের মধ্যে যেমন তিনটি, অধম, মধ্যম ও উত্তম। গুরুও সেই রকম। রামকৃষ্ণ সেই মৌমাছিরূপী উত্তম গুরু। বিষয়াসক্ত গুবরেদের শিবের মাথায় চড়াতে এসেছে।'

রামকৃষ্ণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমি গুরুটুরু হতে পারব না, গুরুগিরি আর বেশ্যাগিরি এক।'

ভৈরবী বললেন, 'ঠিকই তো। তুমি গুরু হবে কেন, তুমি রামকৃষ্ণ হবে। তুমি হাসবে, তুমি কাঁদবে, তুমি কথা বলবে, তুমি চিৎকার করে মানুষকে ডাকবে, ওরে কে কোথায় আছিস আয়। তুমি গুরু হতে যাবে কোন দুঃখে ! তুমি না জান কামিনী, না চেন কাঞ্চন। তুমি ধর্ম হবে।

সূর্য চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্মের প্রচার ॥
এইমত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমঃ নাশ করি করে বস্তুতত্ত্বজ্ঞান ॥

আমি বলেছি তোমাকে, এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।'

রামকৃষ্ণ অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আমি অতসব বুঝি না ! আমি বুঝি, ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। ঈশ্বরই কর্তা, আর সব অকর্তা। এ সংসার তাঁর মায়া। আর সেই মায়া হল কামিনী-কাঞ্চন। আমি দুটোকেই ত্যাগ করেছি। মাইরি বলছি। রমণীর স্তন আমার চোখে মাতৃস্তন। মেয়েদের দেখামাত্রই আমার বালকভাব হয়। তাই দূরে সরে থাকি। আমার ভাব তো কেউ বুঝবে না, মন্দ ভাববে। আর কাঞ্চন ! আমার হাতে একটা টাকা ফেলে দেখো। আমি শিউরে উঠব। আমার সবকটা আঙুল বেঁকে যাবে। আমি কি বলি জানো, মন মুখ এক করতে হবে। ঈশ্বর মন দেখেন। তুমি জানো, মায়ের সামনে বসে রানি বিষয়চিন্তা করছিল বলে আমি এক চড় মেরেছিলুম।'

মথুরাবাবুর চোখ চিক চিক করছে। এই মুহূর্তে খুব শক্ত হতে না পারলে দু-এক ফোঁটা গাল বেয়ে গড়িয়েও পড়তে পারে। রানিমার কথা ভীষণ মনে পড়ছে। এই মন্দির যখন তৈরি হচ্ছে, পাশে এসে দাঁড়াতেন। জিজ্ঞেস করতেন, কোথায় কী হবে মথুর। আমি সব দেখাতুম, এই দেখ মা, তোমার মন্দিরের বিশাল আঙ্গিনা, দৈর্ঘ্য, ৪৪০ ফুট, প্রস্থ, ২২০ ফুট। গঙ্গার দিকে উত্তর থেকে দক্ষিণে সার সার দ্বাদশ শিবমন্দির। ওইখানে হবে স্নানঘাট, ঘাট সংলগ্ন একটি প্রশস্তঘর। স্নান সেরে রমণীরা বস্ত্র পরিবর্তন করবেন। এপাশে ছয়, ওপাশে ছয় শিবমন্দিরের মাঝখানে স্নানঘাট থেকে সরাসরি মন্দিরে আসার পথ। বিপরীতেই মাতৃমন্দির। সামনে নাটমন্দির। মাতৃমন্দিরের পেছনেই রাধাগোবিন্দের মন্দির। ওইখানে সিংহ-দুয়ার, নহবতখানা, অতিথিশালা, ভোগরন্ধনশালা, বলিপীঠ, দুধপুকুরের সোপান, প্রধান ফটক। সব শুনতে, শুনতে রানিমার চোখে স্বপ্ন লাগত। আমাকে বলতেন, তাড়াতাড়ি করো মথুর, সময় বড় কম। আট বছরের দিনরাত পরিশ্রমের ফল এই মন্দির। বিশ্বকর্মার বিশাল কর্মযজ্ঞ। খরচ হল ন থেকে দশলাখ টাকা।'

মথুরামোহনের গলা ক্রমশই ভারী হচ্ছে। বুঝতে পারছেন ভাবাবেগ আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। সব আছে, আকাশ, বাতাস, নদী তরঙ্গ, রজতখন্ডের মতো শুভ্র মন্দির শীর্ষ, রানিমার প্রিয় বেড়ালেরা। তিনি কোথায় ! আসনে উপবিষ্ট মাল্যচন্দন বিভূষিত তাঁর অতি প্রিয় গদাধর। মথুরামোহন বললেন, 'কোথায়, আর ক'বছরেই বা রইলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠা হল ১৮৫৫ সালের মে মাসে, আর রানি চলে গেলেন ১৮৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তোমাকে আমি বলেছি মথুরা, রানি আমাদের অষ্টনায়িকার এক নায়িকা। সামান্য ভেব না তাকে। অত শক্তি সে পেল কোথা থেকে। এসেছিল তার কাজে। চলে গেল কাজ শেষ করে। এই যে এসেছেন আর এক শক্তি। চারিবেদ মূর্তিমতী, যোগেশ্বরী, শ্রী শ্রী যোগমায়ার অংশ সম্ভূতা।'

মথুরামোহন বললেন, 'তোমার চপেটাঘাতে রানির কি রকম চৈতন্যোদয় হয়েছিল জানো। বড়জামাই রামচন্দ্রের সঙ্গে মামলা চলছিল তহবিল তছরুপের। এই মন্দির তৈরির সময় যতটুকু দায়িত্ব তার উপর ছিল, দেখা গেল সেইটুকু করতেই অনেক টাকা এদিক ওদিক হয়ে গেছে। রানিমা বিশ্বাস করে রামচন্দ্রকে বেশ কিছু গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিও রাখতে দেন। সেই টাকা দিয়ে রামচন্দ্র স্ত্রীর নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঋণপত্র কিনেছিলেন। রানিমাকে দিয়ে অনেক সাদা কাগজে সই করিয়ে রেখেছিল সুদ তুলে নেওয়ার জন্যে। নিজে কিছুই করত না, অথচ রানিমার কাছ থেকে চোদ্দো হাজার টাকায় বেলেঘাটায় যে কমিশন এজেন্সি খুলেছিলেন তার লভ্যাংশের একটি পয়সাও রানিকে দেননি। এই রকম আরও সব গরমিল বেরলো। রানিমার সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হতে হতে শেষে মামলা। রানির অ্যাটর্নি উইলিয়াম টমাস ডেনম্যান। তুমি যেদিন রানিমাকে চড় মারলে, সেদিন মা ওই মামলার কথাই ভাবছিল।'

ভৈরবী হাসতে হাসতে বললেন, 'কি গো, তুমি তো আচ্ছা, মেয়ের গায়ে হাত তুললে !'

গদাধর বললেন, ' আমি কি করব ! দুখণ্ড মন দেখলে আমি চণ্ড হয়ে যাই। আমাকে বললে, বাবা, একটা গান গাও। আমি গাইছি, কোন হিসাবে হরহৃদে, আহা রানির বড় প্রিয় গান, কতবার শুনিয়েছি। রানি পুজোর জন্যে ফুল বাচছিল মাথা নিচু করে। দেখছি, গানের ভাবে অন্য রকমের একটা তরঙ্গ আসছে। জগদম্বার দিকে তাকিয়ে দেখছি মুখে একটা বিরক্তির ভাব। তখন রানির দিকে নজর গেল। বিষয় চিন্তা ভেতরে ভেতরে কুরকুর করছে। আমার কি, আমার আবার কিসের ভয়। পর পর

Scanned by CamScanner

দুটো চড়। আহা, সেও তো কিছু কম ছিল না গো, কালীপদ অভিলাষিণী। সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করে বললে, বাবা, বড় অন্যায় করে ফেলেছি।'

'তুমি কি জানো ছোট্ ঠাকুর, তোমার সেই শাসনের ফল কী হল। এখান থেকে জানবাজারে ফিরেই আমাকে তলব, মথুর ওদের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নাও। সে কি কথা, চার বছর ধরে এত বাদানুবাদ, এত খরচ! এক কথায় মামলা খারিজ। একটা সোলেনামায় দুপক্ষের সই, মামলা খারিজ। এ তোমার মেয়ে জামাইয়ের জন্যে দুর্বলতা নয়। এ হল গদাধরের চড়ে চৈতন্যের উদয়। আর কেন, গুটিয়ে ফেল মন। সময় হয়ে এসেছে। তারপরেই কী আদেশ হল জানো? জানো না। তুমি তো দক্ষিণেশ্বরের গাছে গাছে হুপ হাপ করে বেড়াও, তুমি আর কি জানবে! তুমি বরানগরে দশমহাবিদ্যার মন্দিরে গিয়েছিলে, মনে পড়ছে?'

'খুব পড়ছে। তুমিই ত আমাকে নিয়ে গেলে গো।'

'আমাকে কি বলেছিলে?'

'বলেছিলুম, মথুর, মায়ের দেবালয়ের এই হীনদশা আমার যে সহ্য হচ্ছে না। নিত্য ভোগের একটা মাসিক বন্দোবস্ত করে দাও।'

'তুমি কি জানতে ঠাকুর, প্রতিষ্ঠাতা রামরতন দত্তরায় রানিমার চিরশত্রু ছিলেন। যশোরের জগন্নাথপুর তালুক নিয়ে নড়াইলের এই জমিদারের সঙ্গে কম লাঠালাঠি হয়েছে, কম রক্তপাত! রানিমার বিশ্বস্ত লেঠেল মহাবীরকে পেছন থেকে ছুরি মেরে পাঁকে পুঁতেছিল। গ্রামকে গ্রাম আগুন লাগিয়ে ছারখার করেছিল। শেষমেশ আদালত। দু বছর মামলা লড়ে হেরে গেল। রানিমা গঙ্গার পশ্চিমকূলে উত্তরপাড়া, বালিতে মন্দির নির্মাণের জন্যে যখন জায়গা কিনতে চাইলেন তখন দশআনি ছআনির এই জমিদাররাই বাগড়া দিয়েছিলেন। রানির তৈরি ঘাট দিয়ে তাঁরা গঙ্গায় নামবেন না। রানিমা মন্দির নির্মাণ করলে গঙ্গা বন্ধ হয়ে যাবে। তবু রানিমা আমাকে বললেন, ছোট্ ঠাকুরের ইচ্ছা, তোমাকে বলেছেন, তুমি সব ব্যবস্থা এখনি করে দাও মথুর। সত্যি কথা বলব ঠাকুর, আমার নিজের একটু কিন্তু, কিন্তু ছিল। আমার নিজের মান অপমান বোধ প্রবল। তুমি শুনলে অবাক হবে, যিনি আমাকে জামাই নয় ছেলে ভাবতেন, তাঁর ওপর সামান্য কথায় অভিমান করে বউ নিয়ে জানবাজার ছেড়ে ফরাসডাঙ্গায় চলে গিয়েছিলুম, তিনি নিজে গিয়ে আমাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। আমার কিন্তু ভাব দেখে রানি বলেছিলেন, মথুর মানুষের কোনও অহংকারই থাকে না। জানাব, আজ যা আছে, কাল তা নেই। মৃত্যুই একমাত্র সত্য। চিতায় রাজা আর ভিখারি সকলি সমান। দত্তরায় মশাইয়ের অত অহংকার, অত জাঁকজমক, মৃত্যুর পর দেখ আজ কি অবস্থা, দেবতার ভোগ হয় না। জিজ্ঞেস করলুম কতটা কি করব মা? নিজেই বলে দিলেন, মাসে দু'মন চাল আর নগদ দুটো করে টাকা।'

গদাধর বললেন, 'সেজবাবু! তুমি কিন্তু একটু কৃপণ আছ বাপু!'

মাথুর হাসলেন, 'জগদম্বা তোমার একটা খুব ভাল করেছেন, মুখের কোনও আখঢাক রাখেননি। শোনো বাবা, আমি কৃপণ নই, হিসেবি। যা নিয়ে রানির সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে ফরাসডাঙ্গায়, সেটা ছিল হিসেব। রানী আমাকে বলেছিলেন, আমার স্বামীর কষ্টের উপার্জন বেহিসেবি খরচে উড়িয়ে দেবার অধিকার কারও নেই মথুর।' গদাধর বললেন, 'আমারও সেই এক কথা। সংসারী মানুষের একটা হিসেব থাকবে; কিন্তু কৃপণ হবে না।'

মথুর বললেন, 'শোনো, শোনো রানিমার শেষ কথাটা শোনো। ওই দশমহাবিদ্যা থেকেই এল। রানিমা থমথমে মুখে বললেন, মথুর রামরতনের মৃত্যুর পর দশমহাবিদ্যার অবস্থা যদি এই হয়ে থাকে তাহলে আমার মৃত্যুর পর দক্ষিণেশ্বরের কি হবে!'

মথুরামোহন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'বুঝতে পারলুম না, এই সব কথা কেন! যাওয়ার সময় কি হয়ে গেছে! শুধু দক্ষিণেশ্বর নয় তোমার কথাও বললেন, জেনে রাখো মথুর, গদাধর সাধারণ মানুষ নয়। সে কে তোমরা পরে জানতে পারবে, তখন এও জানতে পারবে আমি কেন এসেছিলুম!

গদাধর জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী বললে?'

'আমি বললুম, আমি কথা দিচ্ছি মা, আমি বা আপনার মেয়ে, যে যতদিন জীবিত থাকব ততদিন এই মন্দিরের দেখাশোনায় কোনো অবহেলা থাকবে না। আমরা আর আমাদের বংশধরেরা মায়ের সেবা করবে। আর ছোট্ ঠাকুর! তাকে দিয়ে মা জগদীশ্বরী অনেক কাজ করাবেন, লোকে যে যাই বলুক, এ আমার গভীর বিশ্বাস!'

হৃদয় বসেছিল নীরবে। সেজবাবুর সামনে সহজে সে মুখ খোলে না। মামার শিক্ষা। একদিন যখন বেশ মেজাজে ছিল, বলেছিল হৃদু, তুই সংসারী, একটা কথা জেনে রাখ, কাজে লাগবে তোর, 'এই কয়েকটির কাছ থেকে সাবধান হতে হয়! প্রথম বড়মানুষ। টাকা লোকজন অনেক, মনে করলে তোর অনিষ্ট করতে পারে; তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়। হয়তো যা বলে, সায় দিয়ে যেতে হয়! তারপর কুকুর। তেড়ে আসে কি ঘেউ ঘেউ করে, তখন দাঁড়িয়ে মুখের আওয়াজ করে ঠাণ্ডা করতে হয় তাকে। তারপর ষাঁড় গুঁতুতে এলে, তাকেও মুখের আওয়াজ করে ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর মাতাল। যদি রাগিয়ে দাও, তাহলে বলবে, তোর চোদ্দোপুরুষ, তোর হেন তেন—বলে গালাগালি দেবে। তাকে বলতে হয়, কি খুড়ো কেমন আছ? তাহলে খুব খুশি হয়ে তোর কাছে বসে তামাক খাবে।'

সেজবাবু কম বড়লোক! চেয়ার জোড়া চেহারা। এই পাকানো গোঁফ, মাথায় টুপি, হাতে হাড়ের হাতল লাগানো ছড়ি। দামি আলোয়ান। তবু হৃদয় না বলে পারল না, 'রানিমা যেদিন স্বর্গারোহণ করলেন, সেই সময়টায় মামার কি অবস্থা! চোখে ঘুম নেই একটু। সারা রাত মন্দিরে ছটফট করছে। আমি যেমন পাহারায় থাকি। রাত ক্রমশই গভীর হচ্ছে। মন্দিরের চাতালে হঠাৎ মামা একবার শিউরে উঠল। তরতর করে নেমে গেল মন্দিরের উঠনে। ভোরের আলো ফুটব ফুটব করছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, চলে গেল রে হৃদে—অষ্ট সখীর এক সখী এসেছিল মায়ের কাজ করতে। কাজ মিটে গেছে—মা এসে নিয়ে গেল তাকে সঙ্গে করে।'

গদাধর বললেন। 'মন্দিরে মায়ের সামনে বললুম, মা রানির কী হবে? সেও তো আমাকে তার ছেলে বলত। কী হবে এইবার! মা হাসতে হাসতে বললে, কী আবার হবে? আমার জিনিস আমি ফিরিয়ে নোবো। ও নিয়ে তুই কিছু ভাবিসনি। তুই যেমন আছিস তেমন থাক।'

দেওয়ান রামধন সেজবাবুর খোঁজে এসে অদ্ভুত দৃশ্য দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পাগল রামকৃষ্ণ দেবতা সেজে বসে আছে। মানুষটা সত্যিই একটু অন্যরকম। হয়তো কথাটা ঠিক 'যে দেশে রজনী নেই' সেই দেশেরই মানুষ এক। সেজবাবু যার বশে এত, তার তো এতদিনে সোনার থালায় ভাত খাওয়ার কথা। বিষয়আসয় ছেড়ে দিবারাত্র মা, মা। আবার হঠাৎ দেশে গিয়ে বিয়ে করে বসল এক বালিকাকে। এই রঙ্গরস, তো এই অচৈতন্য।

মথুরবাবুর চোখ গেল রামধনের দিকে। জমিদারি গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কি চাই তোমার? এখানে উঁকিঝুঁকি মারছ কেন?'

'আজ্ঞে, সরকারি বারুদখানার হাবিলদার কুঁয়ার সিং কিছু একটা বলতে এসেছে।'

'আমাকে?'

'মনে হয় গদাধরকে।'

মথুরবাবু এক ধমক লাগালেন, 'গদাধর! গদাধর কে! রামকৃষ্ণ বলতে মানসম্মানে লাগে? আমি হিসেবের খাতায় দেখলুম, তুমি রামকৃষ্ণকে কখনও, কখনও চাকর বলেও উল্লেখ করেছ। শুনে রাখো, রামকৃষ্ণ কারও চাকর নয়। আমরা সবাই রামকৃষ্ণের সেবক। আর এই মা-টিকে চিনে রাখো, ইনি আমাদের সম্মানিত অতিথি। কোনওরকম ত্রুটি যেন না হয় এঁর সেবার।'

রামধন হাত জোড় করে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। কুঁয়ার সিং যে দাঁড়িয়ে আছে।'

মথুরবাবু বললেন, 'নিয়ে এসো এখানে।'

কুঁয়ার সিং লম্বা চওড়া মানুষ। নানকপন্থী শিখ। ভক্তমানুষ। রামকৃষ্ণে তিনি গুরু নানককে দর্শন করেছেন। ভালবাসেন, ভক্তি করেন। সৈনিকের পোশাক পরা কুঁয়ার সিং ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। রামকৃষ্ণকে কখনও এমন ফুলসাজে আগে দেখেননি। সুন্দরী সন্ন্যাসিনী পাশে। সামনে রাজকীয় সেজবাবু।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'দেখ, আমাকে কি করে দিয়েছে!'

সিংজি হাসতে হাসতে বললেন, 'বহুত আচ্ছা লাগছে। আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। কাল সাধুসেবা হবে। তোমাকে আসতে হবে।'

সিংজি হাত জোড় করে নমস্কার করলেন সকলকে।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'এবার কিন্তু আমি আলাদা বসব।'

সিংজি বললেন, 'সেটা আমার ব্যাপার। তোমার সেবা আমি করব।' কুঁয়ার সিং চলে গেল।

মথুর বললেন, 'কী ব্যাপার! মনে হল তোমার ভক্ত।'

'ও একটা পাগল!'

'তা বলেছ ভাল! পাগলে পাগল চেনে। পাগলামির তো কিছু দেখলুম না, দেখলুম মিলিটারি পোশাকে এক ভক্ত।'

'ভক্ত তো বটেই। গুরু নানককে খুব মানে। সাধন ভজন করে। মাঝে মাঝে সাধু সেবা করে।'

Scanned by CamScanner

'তা এর মধ্যে পাগলামির কি দেখলে।'

'একদিন আমাকে কি বলছে জানো, সমাধি হলে সাধারণ মানুষ আর ফিরে আসতে পারে না। সমাধিতেই দেহ চলে যায়। আমি নিজে দেখেছি, তোমার সমাধি হয়; কিন্তু তুমি বেঁচে আছ। জিজ্ঞেস করলুম, তাতে কি হয়েছে? আমি ওসব জানি না কিছু। মাঝে মাঝে আমার এমন হয়ে যায়। তখন বললে, তুমি গুরু নানক, আবার জন্মেছ। একমাত্র গুরু নানকই পারতেন সমাধি থেকে ফিরে আসতে। তাই আমার ওপর খুব ভক্তি।'

'তুমি ওটা কি বললে, আলাদা বসব।'

'আরে সে তো তখন আমার ঘোর উন্মাদ অবস্থা। কোনও কিছুর ঠিক নেই। অসাড়ে পড়ে থাকি একদিন, দুদিন, তিন দিন। সেই সময় কুঁয়ার একদিন বললে, 'চলো বাবা, সাধুসেবা হোগা'। আমিও চলে গেলাম। গিয়ে দেখি, অনেক সাধু এসেছে। আমি বসেছি। কেউ কেউ আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করছে। যেই জিজ্ঞেস করা, আমি উঠে আলাদা বসতে গেলুম। ভাবলুম, অত খবরে কাজ কি। তারপর যেই সকলকে পাতা পেতে খেতে বসালে, কেউ কিছু না বলতে বলতে আমি আগে খেতে লাগলুম। সাধুরা কেউ কেউ বলতে লাগল শুনতে পেলুম, 'আরে এ কেয়া রে!'

মথুর হাসছেন, 'তোমার কাণ্ড বাবা। আমি ছাড়া কে বুঝবে! আজ সকালে মিছরির সরবৎ খেয়েছ?'

'না, কেন খাব?'

'কেন খাবে না, তোমার গা জ্বালা করে, মিছরির ব্যবস্থা করে দিলুম, হৃদয় দেয়নি বুঝি! ভুলে গেছে!'

ভৈরবী উত্তর দিলেন, 'গাত্রদাহের ব্যবস্থা এই যে করে দিয়েছি। হাত দিয়ে দেখো, অঙ্গ শীতল।'

'এইতেই গা জ্বলুনি সেরে যাবে!'

'শোনো বাবা, আমাদের শাস্ত্রে আছে সাধকের অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের কথা, স্তম্ভ রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গ কম্প বিবর্ণতা অশ্রু মূর্চ্ছা স্বেদ, আর আছে প্রেমের গভীরতার দশটি দশার বর্ণনা, চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, ক্ষীণতা, মলিনতা, প্রলাপ, পীড়া, উন্মত্ততা, মোহ, মৃত্যু। মহাপ্রভুর দিব্যভাবের প্রকাশে শচীদেবী ব্যাকুল, এ কি হল আমার ছেলের,

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥
আপনা আপনি কহে মনে মনে কথা।
ক্ষণে বলে ছিণ্ডোঁ ছিণ্ডোঁ পাষণ্ডীর মাথা॥
ক্ষণে গিরা গাছের উপর ডালে চড়ে।
নামিলে নয়ন দুই ভূমিতলে পড়ে॥
দন্ত কড়মড়ি করে মালসাট মারে।
গড়াগড়ি যায় কিছু বচন না স্ফুরে॥

হৃদয় মহা উৎসাহে বললে, 'সব মিলে যাচ্ছে, সব মিলে যাচ্ছে, মামার লক্ষণের সঙ্গে।'

ভৈরবী বেশ জোর গলায় বললেন, 'সেজবাবু আমি প্রমাণ করব ইনি কে, শাস্ত্র প্রমাণ। আপনার সাহায্য চাই।'

মথুরামোহন বললেন, 'তুমি যা বলবে!'

ভৈরবী বললেন, 'গদাধর তাঁকে দর্শন করেছে। একটাই ডাক, মা। মা বলে ডাকতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। ডাক দেখি মন ডাকার মতো কেমন শ্যামা থাকতে পারে।'

রামকৃষ্ণ উঠে দাঁড়ালেন, আর পারলেন না নিজেকে আসনে ধরে রাখতে। গলায় দুলছে ফুলের মালা। তিনি গাইছেন,

ডাক দেখি মন ডাকার মতো কেমন শ্যামা থাকতে পারে।
কেমন শ্যামা থাকতে পারে, কেমন কালী থাকতে পারে॥
মন যদি একান্ত হও, জবা বিল্বদল লও,
ভক্তি-চন্দন মিশাইয়ে (মার) পুষ্পাঞ্জলি দাও॥

দুহাত তুলে নাচছেন আর গাইছেন। মথুর স্তম্ভিত। ভৈরবীর চোখে জল। রামকৃষ্ণ পাছে টলে পড়ে যান তাই হৃদয় এসে দাঁড়িয়েছে পাশে।

গান থামল। রামকৃষ্ণ বললেন, 'জল'।

মথুরামোহন বললেন, 'মিছরির জল দাও, ওটা ওষুধ।'

ভৈরবী বললেন, 'এই সেই মহাপ্রভু। এই সেই প্রেমাভক্তি, এই সেই গামছা নিঙড়ানো ভাব, এই সেই আঁকুপাঁকু। একটি শ্লোকে আক্ষেপ করছেন, নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা/ পুলকৈর্নিচিতং বপু, কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি॥ হে প্রভু, কবে তোমার নামগ্রহণ করলেই নয়ন গলদশ্রু, বচন গদ্‌গদ্ আর দেহ পুলক কণ্টকিত হবে। সে কবে হবে প্রভু।'

রামকৃষ্ণ ভাবস্থ। মথুরামোহন উঠবেন। বিষয়কর্মে যাবেন। ফিটনে চেপে কলকাতা থেকে কারা সব এলেন। ভৈরবী সেই মুহূর্তে বললেন, 'আমি তন্ত্রসাধনা করাতে এসেছি। বিষ্ণুক্রান্তায় যে চৌষট্টিটি তন্ত্র আছে, একে একে আমি সব কটির সাধন করাব। রামকৃষ্ণের এখন যা অবস্থা, সে অবস্থায় তন্ত্রসাধন ছাড়া আর কোনও পথ নেই। এতদিন যা করেছে নিজের মতো করে, নিজের আবেগে, এইবার শাস্ত্র ধরে এগোতে হবে।'

মথুরা প্রশ্ন করলেন, 'সাধনার তো বাকি কিছু নেই। আবার কেন?'

'কারণ আছে মথুরবাবু। তা না হলে মা কেন পাঠাবেন আমাকে। আমি কেন, এইবার একে একে অনেকেই আসবেন। প্রমাণ করতে হবে তো, সাধনের পেছনে পেছনে শাস্ত্র ধাবিত হয়। এর জীবন থেকে এমন একটা সত্য বেরবে যা অভূতপূর্ব, যা সনাতন ধর্ম, যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যা গীতা।'

মথুরবাবু বললেন, 'মা, তুমিও এক বিস্ময়। রানিমার এই কালীতীর্থে কত অলৌকিক ঘটনা যে ঘটবে!'

'আমি কে জানার দরকার নেই, আমি কি সেইটা জানো। এই রামকৃষ্ণ যে একাধারে রাম আর কৃষ্ণ সেইটি আমি প্রমাণ করব গীতার সপ্তম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটি দিয়ে, যেখানে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ/ প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥ শ্রীভগবানকে আশ্রয় করে দৃঢ়ব্রত হয়ে ভজন করলে পরমতত্ত্বকে জানা যায়; অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্বই জানা যায়। আর মরণকালেও তা ভুল হয় না। গদাধর যে কথা তুমি বলে এসেছিলে, এবার করে দেখালে। আগামী কাল শুধুমাত্র তোমাকে আশ্রয় করে থাকলেই উপনিষদের সেই পরম সত্যকে জানতে পারবে। এই মায়ার জগতে তিনিও আছেন, তুমিও আছ। মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা তার নিজের ভেতর থেকে জাল বার করে আবার সেই জালে নিজেও থাকে।'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'এ কথা তো আমার!'

'তোমারই তো। তুমি মুণ্ডকোপনিষদে বসে বলেছে, যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতেচ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।' মথুর বললেন, 'আমি এইবার আসি, তা না হলে আমার চাকরি চলে যাবে।'

'এসো মথুর। তোমার শেষটাও আমি দেখতে পাচ্ছি। রং ধরেছে।'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি আমাকে তন্ত্র করাবে?'

'হ্যাঁ গো দেখবে না সেই সদাশিবকে। মূলাধারে সেই নিদ্রিতাযোগিনীকে। শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দমগনাকে। যোগনিদ্রাধরং শম্ভুং স্মেরাণণসরোরুহম। বিপরীতরতাসক্তাং মহাকালেন সন্ততম॥'

ভৈরবী আর এগোতে পারলেন না রামকৃষ্ণ ধরে ফেলেছেন। হৃদয় দেখতে পাচ্ছে মামার চোখেমুখে সেই অলৌকিক দ্যুতি। দণ্ডায়মান দীর্ঘ শরীর দুলছে,

অশেষব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড-প্রকাশিতমহোজ্জ্বলাম।
শিবাভির্ঘোররাবাভি-র্বেষ্টিতাং প্রলয়োদিতাম্॥
কোটিকোটিশরচ্চন্দ্র-ন্যক্কৃতানখমণ্ডলাম্।
সুধাপূর্ণশীর্ষহস্ত-যোগিনীভির্ধিরাজিতাম॥

সেই ভীষণ উন্মত্ত ভাব আসছে। যেখানে বাস্তব হয়ে যায় স্বপ্নবৎ। কোথায় শরীর, চারপাশে কারা, সব ভুল হয়ে যায়। এক পা এখানে, তো আর এক পা ওখানে। রামকৃষ্ণ আবার চলে গেলেন গানে,

কখন কি রঙ্গে থাকো মা শ্যামা সুধা-তরঙ্গিনী।
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে, অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী॥
লম্ফে ঝম্পে কম্পে ধরা, অসিধরা করালিনী-
তুমি ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা, ভয়ঙ্করা কালকামিনী॥
সাধকের বাঞ্ছা পূর্ণ করো নানারূপধারিণী।
কভু কমলের কমলে নাচো মা, পূর্ণ ব্রহ্ম-সনাতনী॥

একটা ঢেউয়ের মতো রামকৃষ্ণ ছুটলেন মন্দিরের দিকে। তাঁর গমন পথ থেকে সবাই ভয়ে ছিটকে পালাচ্ছে। একটা জ্যোতির্মণ্ডল ঝড়ের বেগে ধাবিত। হৃদয় পেছনে, তার পেছনে ভৈরবী মাতা।

হলধারী পূজার আসন থেকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'আজ একেবারে সত্যিই অবতার।'

রামকৃষ্ণ থমকে গেলেন। দুহাতে মালাটি ধরে বললেন, 'কোন অবতারের কথা বলছ দাদা! এ তোমার স্তুতি নয় নিন্দা। আমি সাধক, সা. রে. গা. মা. পা. ধা. নি, আমি সাধতে এসেছি, বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র, ভাগবত, কোরাণ, বাইবেল, গ্রন্থসাহেব। দাদা, আমি উপাধি চাই না, আমি মাকে চাই। তোর জগৎজোড়া কোল পাতা মা, আমি বসে আছি সেই কোলে।'

রামকৃষ্ণ ঢুকে গেলেন গর্ভমন্দিরে। চলে গেলেন মায়ের সিংহাসনের আড়ালে। হলধারী আবার আচমন করলেন। গঙ্গার দিক থেকে দণ্ডি খাটতে খাটতে আসছেন এক মধ্যবয়সী মহিলা। মনে হয়, মানত ছিল।

Scanned by CamScanner

এক ভক্ত নাটমন্দিরে বীরদর্পে মন্ত্রপাঠ করছেন। ভারিক্কি চেহারার প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক তাঁর নাতিটির হাত ধরে গুটগুট করে হেঁটে চলেছেন চাতাল ধরে। নাটমন্দিরে চরণদাস বাবাজি গানের আয়োজন করছেন। মন্দিরে সদাই উৎসব।

রামকৃষ্ণ প্রতিমার আড়াল থেকে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করলেন, যেন কালো মেঘের আড়াল থেকে হঠাৎ চাঁদ বেরিয়ে এল। উদ্ভাসিত হাসি। গলার মালাটি খুলে হৃদয়ের গলায় পরাতে পরাতে বললেন, 'নে নে মালা পর।' এগিয়ে গেলেন ভৈরবীর কাছে, কানে কানে বললেন, 'দিয়েছে, মা অনুমতি দিয়েছে।'

বলেই রামকৃষ্ণ আত্মভোলা পথিকের মতো গুটগুট করে এগিয়ে চললেন গঙ্গার দিকে।

হৃদয় বললে, 'ও কি, ওদিকে চললে কোথায় ?'

রামকৃষ্ণ একটু দূর থেকে বললেন, 'আমি চান করব।'

'সকাল তো একবার করেছ।'

'আবার করব। বেশ করব।'

'এতবার চান করলে সর্দিকাশি হবে। গঙ্গায় এখন জোয়ারের জল।'

হৃদয় দ্রুত এগিয়ে গিয়ে মামার হাত ধরেছে। বোঝাতে চাইছে, এতবার চান ভাল নয়।

রামকৃষ্ণ বলছেন, 'বায়ু, পিত্ত, কফ, এই তিন নিয়ে মানুষ। আমার কফের ধাত নয়, বায়ু আর পিত্তই প্রধান।'

'বেশ তোমার যতবার খুশি চান করো ; কিন্তু তেল মাখতে হবে। চান যে করবে, তোমার গামছা কোথায় ? গামছা নিয়ে আসি, চান করার কাপড় নিয়ে আসি। একটু অপেক্ষা করো।'

কে কার কথা শুনবে ! গদাধর চলে গেলেন এক গলা জলে। ভরা গঙ্গার জল ঘাটের সিঁড়িতে ছলাত ছলাত করছে। কখনও ভেসে ভেসে যাচ্ছে পুজোর ফুল, কখনও শ্মশানের পোড়া কাঠ। গঙ্গা রামকৃষ্ণের বড় আপনার। সেই গোমুখ থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে তীর্থ ছুঁয়ে ছুঁয়ে। কাশীতে স্নান করালে বিশ্বনাথকে, নবদ্বীপে মহাপ্রভুকে, হালিশহরে রামপ্রসাদকে কোলেই তুলে নিলে। কত পুণ্যাত্মার শরীর ধোয়া এই জলপ্রবাহ অবিরত প্রবাহিত সাগর মুখে। ভরা কোটালে বান আসে সাগরের বার্তা নিয়ে। স্রোতের সে কী উদ্দাম গতি, ঢেউয়ের সে কী আস্ফালন, বিশালের অঙ্গ ছুঁয়ে, বিরাটের বার্তা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি গদাধর। উৎস থেকে অবরোহণের পথে আরও অনেক নদী আমাতে এসে মিলেছে, তারপর সবাই একত্র হয়ে নাচতে নাচতে চলে গেছি সমুদ্রের দিকে। পথ ভিন্ন গন্তব্য এক। মহাপ্রভুর সংকীর্তনের দল। সর্ব জাতির সব বিশ্বাসের মানুষের সমাহার, নেচে নেচে চলেছে প্রেমের সাগরে, আচণ্ডালে যাঁর উদার বুক পাতা। নদীর কলতানে গদাধর শুনছেন যেন মন্ত্র।

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানা পথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব ॥

নানা রুচি, সরল বক্র নানা পথ। সব পথেই শত যাত্রী। সব নদীই যেমন সাগরে লীন হয়, তেমনি ভিন্ন বিশ্বাসী, বিভিন্ন পথযাত্রী মানুষও, হে দেব ! তোমাতেই উপনীত হয়।

বিশাল এক নৌকো মাঝনদী দিয়ে ভেসে চলেছে। বিশাল পালে, ভরা বাতাস। পালে নানা রঙের কাপড়ের টুকরো জোড়া। রামকৃষ্ণ দেখছেন। হঠাৎ মনে হল, তাই তো ! পেয়েছি, পেয়ে গেছি তত্ত্ব। যত মত, তত পথ ! সব সাধনের শেষে তিনি।' যেমন জল ! রামকৃষ্ণ অঞ্জলিতে জল নিলেন, জল ঝরছে, জলে জলপড়ার শব্দ। আবার নিলেন, আবার ঝরে গেল। এ বেশ খেলা। এই জল, দেশ, কাল, পাত্রভেদে নানা নাম। একটা পুকুরের চারটে ঘাট। এক ঘাটে হিন্দুরা জল নিচ্ছে, তারা বলছে, 'জল'। আর এক ঘাটে মুসলমান, তারা বলছে, 'পানি'। আর একঘাটে খ্রিস্টান, তারা বলছে, 'ওয়াটার'। আর একঘাটে আর এক সম্প্রদায়, বলছে 'অ্যাকোয়া'। বস্তু সেই এক জল। সকলেই ঈশ্বরকে ডাকছে, তাঁর কাছেই যাবে বলে পথে নেমেছে।

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতিচ।

যত বেদ, সাংখ্য, যোগ, পশুপতিমত, বৈষ্ণবশাস্ত্র, মানুষের শাস্ত্রচেতনা, শাস্ত্র ভেদবুদ্ধি থাক না। আছে বলেই তো যে যার পথ ধরে এগোচ্ছে। সব শেষে সেই তিনি। যাঁর নাম ঈশ্বর, তাঁর নামই রাম, হরি, আল্লা, ব্রহ্ম। অনন্ত মত, অনন্ত পথ।

একটি নৌকো উত্তর দিকে যাচ্ছে সংকীর্তনের দল নিয়ে। খুব হরি নাম হচ্ছে।

রামকৃষ্ণ হঠাৎ শিবভাবে মাতোয়ারা হলেন। হরিদ্বার থেকে আসছেন গঙ্গা বিশ্বনাথের চরণ ছুঁয়ে। হর হর মহাদেও রবে। উঠে পড়লেন জল থেকে। হৃদয় একনিষ্ঠ পাহারাদার। খেয়ালি মামা চলেছেন শিবমন্দিরের দিকে। শিবমহিম্নঃস্তোত্রের আবৃত্তি চলেছে। হৃদয় একেবারে পেছনে। সর্বাঙ্গ দিয়ে জল ঝরছে। ভিজে কাপড় শরীরে সেঁটে আছে। চওড়া পিঠ কাঞ্চন বর্ণ। তার ওপর রোদ পড়েছে। মুক্তোর বিন্দুর মতো এক একটি জলের দানা। ভিজে চুল মাথায় পাট হয়ে বসে গেছে। হৃদয় মোহিত। এ কোনও মানুষ না দেবতা ! সাক্ষাৎ শিব স্নান করে যেন নিজেরই অর্চনা করছেন। একেই কি শাস্ত্র বলছেন, দেবভূত্বা দেবং যজেৎ !

রামকৃষ্ণ নন্দীশ্বর শিবমন্দিরে ঢুকেছেন। হৃদয় দাঁড়িয়ে আছে উঠনে। অতবড় স্তোত্র রামকৃষ্ণের কণ্ঠস্থ। অপূর্ব কণ্ঠ, অপূর্ব উচ্চারণ, মহিম্নঃ পারং তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী ... স্রোত্র যত এগোচ্ছে রামকৃষ্ণ ততই উজ্জ্বল, ভাস্বর হচ্ছেন, ততই পরিবেশ মুক্ত হচ্ছেন। কোথায় কে, পৃথিবী একটি ছায়া মাত্র, সামনে মহেশ্বর। ক্রমে স্তোত্রের এই অংশটি এল,

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনি পত্রমুর্বী ॥
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥

নীল পর্বত যদি কালি হয়, সাগর যদি মসিপাত্র হয়, পারিজাত বৃক্ষের শ্রেষ্ঠশাখা যদি কলম হয়, পৃথিবী যদি লেখবার পত্র হয়, আর এই আয়োজন নিয়ে স্বয়ং সরস্বতী যদি চিরকাল ধরে লিখতে থাকেন, তাহলেও হে ঈশ্বর তোমার সমস্ত গুণের ইয়ত্তা করা যাবে না।

এই অংশে এসে রামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে আর্ত চিৎকারে ভেঙে পড়লেন, 'মহাদেব গো ! তোমার গুণের কথা আমি কেমন করে বলব !' দুচোখে হু হু জলের ধারা। এমন কান্না হৃদয় কোনও দিন দেখেনি। দুগাল বেয়ে পাহাড়ি ঝর্নার মতো ঝরছে। বুক বেয়ে মন্দিরের মেঝেতে। মেঝে ভিজে গেছে। কান্নার স্বরে, পাগলের মতো গদগদ আলাপে, অদৃষ্টপূর্ব আচরণে মন্দিরে মহা শোরগোল। ভৃত্য, কর্মচারীরা ছুটে এসেছে। সকলেই বেশ মজা পেয়েছে, পাগল আর কি করে ! একজনের বাঁকা মন্তব্য, 'ছোট ভট্‌চাজের পাগলামি আবার শুরু হয়েছে, আজ একটু বেশি বাড়াবাড়ি। ভাগনে মধ্যম নারায়ণ মাথায় থাবড়ে দাও।' আর একজন আশঙ্কা প্রকাশ করলে, 'দেখ, শেষে শিবের ঘাড়ে না চেপে বসে। হাত ধরে টেনে আনতে পারছিস না !' কে একজন বিকৃত সুরে বলতে লাগল, 'কত রঙ্গ জানো যাদু, কত রঙ্গ জানো !'

সব কলরব হঠাৎ নিস্তব্ধ। ফিসফাস, 'অ্যায়, সেজবাবু, সেজবাবু।'

কর্মচারীরা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল। মথুরবাবু সামনে এসে দাঁড়ালেন পর্বতের মতো। রামকৃষ্ণের মহাভাব দেখে মুগ্ধ। এ কী অদ্ভুত লীলা ! মানুষের ভাগ্য কত ভাল হলে এই রকম একটি দৃশ্যের সাক্ষী হওয়া যায় !

পীতাম্বর হঠাৎ মোসায়েবি করার জন্যে বললে, 'বাবু ! টেনে বের করে আনব ? আচ্ছা বাড়াবাড়ি !' মথুরবাবু রুদ্র মূর্তিতে বললেন, 'কে হে তুমি অর্বাচীন ! মাথার ওপর তোমার কটা মাথা আছে যে টেনে বের করবে ! গায়ে একবার হাত দিয়ে দেখো না !'

পীতাম্বর কেঁচো।

ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণ প্রশমিত। হুঁশ আসছে। বাহ্য জগতের বোধ ফিরছে। বাইরে তাকিয়ে দেখছেন, স্বয়ং মথুরবাবু, চারপাশে মন্দিরের যত কর্মচারী।

রামকৃষ্ণ একটি বালকের মতো ভয়ে ভয়ে শিবমন্দির থেকে বেরিয়ে এসে, অপরাধীর মতো মুখ করে মথুরবাবুকে বললেন, 'হ্যাঁ গো, বেসামাল হয়ে আমি কি কিছু করে ফেলেছি ?'

মথুরবাবু এগিয়ে গেলেন। রামকৃষ্ণ সামনে সামান্য ঝুঁকে মন্দিরের উঁচু রকে দাঁড়িয়ে আছেন দুহাতে কোমরের কাপড় সামলাচ্ছেন। মথুরবাবু দাঁড়িয়ে আছেন নীচের উঠনে। তাঁর হাতের নাগালে রামকৃষ্ণের চরণ দুখানি। পাতলা, ফর্সা, অতি কোমল। আঙুলগুলি যেন করবীর কলি।

মথুরবাবুর চোখে জল। তিনি রামকৃষ্ণের চরণে কপাল স্পর্শ করলেন। প্রণাম শেষে বললেন, 'না বাবা, তুমি স্তব পাঠ করছিলে ; পাছে এরা না বুঝে তোমায় বিরক্ত করে, তাই আমি এখানে দাঁড়িয়েছিলুম পাহারায়।'

রামকৃষ্ণ সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। পরিধানের ভিজে কাপড় প্রায় শুকিয়ে এসেছে। কোনও দেহবোধ নেই। প্রশান্ত মুখচ্ছবি।

মথুরবাবু বললেন, 'চলো বাবা, ঘরে চলো, অনেকখানি বেলা হয়েছে।'

কুঠিবাড়ির দিকে এগোচ্ছেন দুজনে। প্রবল প্রতাপ মথুরামোহন আর জগৎ তুচ্ছকারী, ভাবোন্মাদ রামকৃষ্ণ। ঝাঁ ঝাঁ রোদে দগ্ধ হচ্ছে দক্ষিণেশ্বর উদ্যান। মিহি বাষ্প উঠছে গঙ্গাবক্ষ থেকে। মায়ের নাটমন্দিরের ছাদের আলসেয় ধ্যানস্থ ভৈরবমূর্তি যেন টসটস করে ঘামছেন। শানিত রোদে নারকেল গাছের পাতায় বর্শাফলকের ঝিলিক। হৃদয়কে একদিন গুহ্যকথা

Scanned by CamScanner

বলেছিলেন রামকৃষ্ণ, 'মার নাটমন্দিরের ছাদের আলসেতে যে ধ্যানস্থ ভৈরবমূর্তি আছে, ধ্যান করতে যাবার সময় তাঁকে দেখিয়ে মনকে বলতাম, মন ! ওইরকম স্থির নিস্পন্দভাবে বসে মার পাদপদ্ম চিন্তা করতে হবে। তারপর ধ্যান করতে বসা মাত্রই শুনতে পেতুম, শরীর আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমস্ত গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে পায়ের দিক থেকে ওপরে খটখট করে শব্দ উঠছে, একটার পর একটা গ্রন্থিগুলো আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কে যেন ভেতরে ওই ওই জায়গা তালাবন্ধ করে দিচ্ছে। যতক্ষণ ধ্যান করতাম ততক্ষণ শরীর যে একটুও নড়েচড়ে আসন পরিবর্তন করে নেবে, কি ইচ্ছামাত্র ধ্যান ছেড়ে উঠে যাবে, সে সামর্থ্য থাকত না। আগের মতো খটখট শব্দে এবার ওপরের দিক থেকে নীচে পা পর্যন্ত, ওই গ্রন্থিগুলো আবার যতক্ষণ না খুলে যাচ্ছে, ততক্ষণ কে যেন একভাবে জোর করে বসিয়ে রাখত।

হৃদয় প্রশ্ন করেছিল, 'ধ্যান করতে বসে তুমি কী দেখো মামা ?'

রামকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় হৃদয়কে একান্তে বলেছিলেন, "প্রথমে জোনাকির ঝাঁকের মতো জ্যোতির্বিন্দু, কখনও বা কুয়াশার মতো চতুর্দিকে পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতি। আবার কখনও গলিত রুপোর মতো উজ্জ্বল জ্যোতিঃতরঙ্গ। সব যেন ভেসে যাচ্ছে। চোখ বুজেও দেখতুম, চোখ চেয়েও দেখতুম। কি যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে না পেরে ব্যাকুল হয়ে মাকেই বলতুম, 'মা, আমার কি হচ্ছে, কিছুই বুঝি না, তোকে ডাকবার মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না ; যা করলে তোকে পাওয়া যায়, তুইই তা শিখিয়ে দে আমাকে। তুই না শেখালে কে আর আমাকে শেখাবে মা ! তুই ছাড়া কে আর আমাকে শেখাবে মা, আমার আর কে আছে !" এই সব গুহ্যকথা তোকেই বললুম। খবরদার ! পাঁচ কান করিস না !"

মথুরবাবুর সঙ্গে কুঠিবাড়ির সিঁড়ির কাছে এসে রামকৃষ্ণ বালকের মতো আব্দার করলেন, 'সেজবাবু ! আজ দুপুরে আমি তোমার সঙ্গে খাব !'

রামকৃষ্ণ এতক্ষণ ছিলেন মথুরের গুরুদেবতা, এইবার বালক।

মথুর বললেন, 'নিশ্চয় বাবা, তুমি আজ আমার সঙ্গেই খাবে।'

রামকৃষ্ণ মথুরের অঙ্গলগ্ন হয়ে উৎকণ্ঠার গলায় বললেন, 'কী হল বলো তো !'

'কী আবার হল !'

'আজ ভোরে ঝাউতলায় গেছি, যেই বসেছি, লিঙ্গমুখ দিয়ে একটা পোকা বেরিয়ে গেল।'

'সে কী !'

'কেন এমন হল ?'

মথুরবাবু কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর হাসতে হাসতে বললেন, 'বুঝেছি, তোমার কামকীট বেরিয়ে গেছে।'

'গেছে ! শালা, খুব জ্বালাচ্ছিল ক'দিন !'

'তোমার কাম !' বিরাটদেহী মথুরামোহন হা হা করে হাসতে লাগলেন।

বাসনমাজার ঘাটের পাশে ফলবাগিচার ধারে প্রতিদিনের মতো নারায়ণসেবা হচ্ছিল। সমবেত কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে মথুরামোহনের হাসি মিশে গেল, 'জয় মা রানি রাসমণি !'

মথুরামোহনের মন নিমেষে অতীতমুখী। গঙ্গা নিয়ে কোম্পানির সঙ্গে মামলা। গঙ্গার ধীবররা মাছ ধরে। তাদের একমাত্র জীবিকা। ইংরেজ সরকারের হুকুমে মাছ ধরা বন্ধ। জলে নামলেই যন্ত্রণা। জাল কাড়া, প্রহার সবই চলতে লাগল। রানিমার কাছে কেঁদে পড়ল জেলেরা। রানির বুদ্ধির কাছে হার মানতে হল সরকারকে। অর্থলোভী ইংরেজ কিছু না বুঝেই রাসমনিকে দশ হাজার টাকার বিনিময়ে ঘুসুড়ি থেকে মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত গঙ্গার অংশ ইজারা দিয়ে দিলে ! রাতারাতি দুপাশ মোটা লোহার শিকল দিয়ে নিজের অংশ ঘিরে দিলেন রানি। এইবার যাও জাহাজ কোন দিক দিয়ে যাবে যাও ! আবার আদালত ! সরকারের মাথায় হাত। আদালতের রায় রানি আইনমোতাবেক কাজ করেছেন। কিছুই করার নেই আদালতের। একটা রাস্তাই খোলা আছে, রফা। দশ হাজার টাকা ফেরত আর অবাধ মাছ ধরার অনুমতি। সারা বাংলায় মানুষের মুখে মুখে সেই এক গান,

ধন্য রানি রাসমণি রমণীর মণি।
বাঙ্গলায় ভাল যশ রাখিলে আপনি ॥
দীনের দুঃখ দেখে কাঁদিলে আপনি।
দিয়ে ঘরের টাকা পরের জন্যে বাঁচালে প্রাণী ॥
যে যশ রাখিলে তুমি হইয়ে রমণী।
ঘরে ঘরে তোমার নাম গাইল দিবসরজনী ॥

মথুরামোহনের চটকা ভাঙতেই প্রশ্ন, 'ছোট্ ঠাকুর। রানিমা যে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, রাখতে পারব ? আমার দ্বারা কিছু হবে !'

রামকৃষ্ণ এক লহমায় ভিন্ন মাত্রায় চলে গিয়ে বললেন, 'সেজবাবু, এখানে অনেক কিছু হবে। ভাল মন্দ বহুলোক আসবে। মথুর ! এখান থেকে একটা ঢেউ উঠবে। সেই ঢেউ বহুদূর যাবে। আমি সেই শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

'তুমি তো সব পার বাবা, আমার একবার ভাবসমাধি করিয়ে দাও না !'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'ভেবে দেখি। তুমি বললে, আমি তো না করে পারি না। এই সেদিন তুমি বললে, বাবা, এই অর্ঘ্যটা তুমি মায়ের পায়ে দিয়ে দাও। আমিও দিয়ে দিলুম কোনও প্রশ্ন না করে। পরে জানতে পারলুম, ওটা কামনার ফুল। মোকোদ্দমায় জেতার বাসনা। মাকে তোমার জন্যে আদালতে যেতে হল মথুর !'

মথুরামোহন এতটুকু বিচলিত না হয়ে বললেন, 'বাবা, তুমিই তো বলছ, সর্প হয়ে দংশ তুমি ওঝা হয়ে ঝাড়। মামলাও যাঁর, আদালতও তাঁর।'

'সে যদি তুমি তাঁকে দর্শন করে থাকো তবেই অতটা যেতে পার।'

'করিনি কে বললে, এই তো তিনি আমার সামনে।'

গদাধর হাসতে হাসতে বললেন, 'মঠের সাধুর সেই গল্পটা জানো মথুর !'

'তুমি আগে কাপড় বদলে এসো। খেতে বসে সব শুনব।'

ভৈরবী একা বসে আছেন রামকৃষ্ণের ঘরে। ভাণ্ডার থেকে সিধে নিয়ে এসেছেন। একটি মাটির সরা। চাল, আলু, পটল, ডাল, এক মুঠো কাঁচালঙ্কা, একটা পুরুষ্ট কাঁচকলা, একটা পেঁপে, এক ডগা লাউশাক, এক টুকরো কুমড়ো। ভৈরবীর হাতে একটা চিরুনি, সেইটাই নাড়াচাড়া করছেন আনমনে।

রামকৃষ্ণ ঘরে ঢুকছেন। কাপড় বেসামাল। দুহাতে ধরে আছেন কোনও রকমে। আজকাল হাতে কিছু ধরে রাখতে পারেন না, আঙুল গলে পড়ে যায়। হলধারীকে কেন এমন হয় জিজ্ঞেস করায় বলেছিল, শাস্ত্রে একে বলে 'গলিত হস্ত'। গঙ্গায় পিতৃপুরুষের নিত্য তর্পণ করতে গিয়ে দেখেছেন জল থাকছে না হাতে।

রামকৃষ্ণের একটা পা এখানে তো আর একটা পা ওখানে, প্রচুর মদ্যপান করলে যেমন হতে পারে। ভৈরবী তাড়াতাড়ি উঠে হাতের বেড় দিয়ে ধরলেন। বরফের মতো শীতল। পাথরের শিবলিঙ্গকে আলিঙ্গনের অনুভূতি। সাবধানে তক্তাপোশের ধারে বসালেন। হৃদয় এসে গেল।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'আমাকে সাজিয়ে দাও।'

হৃদয় বললে, 'সাজিয়ে কী হবে ? এখুনি তো সব খুলে ফেলবে !'

'তোকে যা বলছি তাই কর। আজ আমার রাজবাড়িতে ভোজ।'

'তুমি কী বলে যেচে নেমন্তন্য নিলে। তোমার লজ্জাশরম সব গেছে।'

'সত্যি বলছিস, আমার লজ্জা শরম চলে গেছে ! ওরে হৃদে ! লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে নয়, তিন থাকতে নয়। পাশমুক্ত শিব, পাশবদ্ধ জীব। জন্মাবধি জীব ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি আর অভিমান, এই অষ্টপাশে বদ্ধ হয়ে আছে। ভৈরবী ! বলো না গো ! তুমি তো মূর্তিমতী চারবেদ। এ কী, তোমার লাউ, কুমড়ো যে গড়াগড়ি যাচ্ছে !'

রামকৃষ্ণের চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে ভৈরবী বললেন, 'সব জোগাড় করে এনেছিলুম, আর আমার রাঁধার ইচ্ছে নেই।' ভৈরবী দাঁড়িয়ে আছেন রামকৃষ্ণের সামনে। রামকৃষ্ণ বসে আছেন তক্তাপোশের ধারে পা ঝুলিয়ে। ভৈরবীর সান্নিধ্যের জন্যে তাঁর হাঁটু দুটি ভৈরবীর জানু স্পর্শ করে আছে। দীর্ঘদিনের পরিচর্যার অভাবে চুলে জট ধরেছে। চিরুনি সামনের দিকে টনলেই রামকৃষ্ণের মাথাটি ভৈরবীর উন্নত বক্ষদেশে একটি অবোধ বালকের মাথার মতো আশ্রয় পাচ্ছে। দুজনেই নির্বিকার। একজনের সন্তান ভাব, আর একজনের বালক ভাব। ছেলে পাঠশালে যাবে, মা তার কেশবিন্যাস করে দিচ্ছে। মাথার আগুপিছু বন্ধ করার জন্যে ভৈরবী মাথাটা বুকেই টেনে নিলেন। ঘাড়ের দিকের জট ছাড়াচ্ছেন। চুল দু একটা উঠে আসছে চিরুনির দাড়ায়।

রামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন রাঁধলে না !'

'ভেবেছিলুম, তুমি যা ভালবাস, তাই রাঁধব। ফোড়ন দেওয়া ডাল, কুমড়ো দিয়ে লাউশাকের চচ্চড়ি। মা যশোদা হয়ে আমার গোপালকে আমার রঘুবীরকে খাওয়াব। কে খায়, কে খায় বলে চোখ বুজিয়ে থাকব। আমার হাতে ধরা ভাতের নাড়ুটি খেয়ে গোপাল খিলখিল করে হাসবে।'

যশোদা বলামাত্রই ঠাকুর ভাবের ঘরে চলে গেলেন। দামবন্ধন লীলার সেই দৃশ্যটি ভাসছে চোখে। কামারপুকুর তাঁর বাল্যের বৃন্দাবন। গয়াবিষ্ণু, চিনে শাঁখারি, কেউ সমবয়সি, কেউ যুবক, কেউ প্রবীণ। পাঠশালা পালিয়ে মানিকরাজার আম্রকাননে পৌরাণিক পালার মহলা। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে রাখাল বালকদের সঙ্গে গোচারণ, আলের পথে কোঁচড় থেকে মুড়ি খেতে খেতে হাঁটা। ঈশান কোণে উঠেছে মিশকালো মেঘ। সেই মেঘের কোলে এক সার বকের মালা। সহসা অচৈতন্য। আলোর ওপর সংজ্ঞাহারা কিশোর। ঠোঁটের কোণে সাদা একটি মুড়ি। চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে কোঁচড়ের বাকি মুড়ি, যেন একরাশ ঝরা টগর। যশোদার মতো ধনী কামারনী। 'কড়ে রাঁড়ী অপুত্রক ধনী কামারিনী। না বিহায়ে হৈল এবে রামের

Scanned by CamScanner

জননী।' কামারপুকুর-বৃন্দাবনে মা যশোদার অভাব ছিল কি!

কোথায় কী সব মিলে যাচ্ছে যেন! মহাপ্রভুর শৈশবচপলতায় ব্রাহ্মণদের গঙ্গাস্নান একটা ত্রাসের ব্যাপার হত। আহ্নিক করতে করতে বর্ষীয়সী রমণী তিরস্কার করছেন গদাধরকে, 'তোরা এ ঘাটে আসিস কি করতে! পুরুষদের ঘাটে যেতে পারিস না! এ ঘাটে মেয়েরা স্নান করে কাপড় ছাড়ে। জানিস না, মেয়েদের উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে নেই!'

সাঁতার কাটছিল বালক। পা ছোড়ার জল লাগছিল গায়ে।

প্রশ্ন করলে, 'দেখলে কী হয়!'

প্রবীণার কঠোর তিরস্কার, ডেঁপো ছেলে, অসভ্য ছেলে। দাঁড়া, তোদের বাপ মাকে বলে দোবো। সেদিনের মতো গদাধর আর তার শ্রীদাম, সুদাম, বলরামেরা শান্ত। তিন দিন পরে গদাধর ধরেছেন সেই বৃদ্ধাকে, 'কই গো, কিছুই তো হল না আমার?'

'কি হল না তোর?'

'তুমি বললে, মেয়েদের ল্যাংটো দেখতে নেই! গাছের আড়াল থেকে পরশু চারজনকে, কাল দুজনকে, আজ আটজনকে দেখেছি। কই আমার তো কিছু হল না।'

বৃদ্ধা হাসতে হাসতে বললেন, 'কি দুষ্ট ছেলেরে তুই, চল তোর মায়ের কাছে।'

মা বোঝালেন, 'তোমার কিছু হবে না বাবা, কিন্তু অমন করলে মেয়েদের অপমান করা হয়। তাঁরা তো সকলেই আমার মতো, তোমার মা। তাঁদের অপমান, মানে আমারই অপমান। অমন কাজ আর কখনও কোরো না।'

নারী দর্শন মাত্রেই যাঁর মাতৃভাব জাগ্রত হয়, তিনি তো মাতৃযোনি। ভৈরবীর বুকে মাথা রেখেছেন আর মনে পড়ছে কামারপুকুরে লাহাবাবুদের বাড়িতে ভাগবত পাঠের কথা। শিশু কৃষ্ণের স্তন্যপানের ইচ্ছা হয়েছে। মা যশোদা তখন ভীষণ ব্যস্ত। উননে ফুটন্ত দুধ। সরে গেলেই উতলে পড়ে যাবে। বালককে বলছেন, বাবা, একটু দাঁড়া আসছি, আসছি। বালক কৃষ্ণ রেগে গেছেন। রেগে ঘরের বাইরে। উঠনে। সেখান থেকে এক টুকরো পাথর তুলে মায়ের দিকে ছুড়লেন। পাথরের টুকরো মায়ের গায়ে না লেগে, লাগল গিয়ে একটি ননী ভাণ্ডে। ভেঙে চুরমার। মেঝেতে সব ছড়িয়ে পড়ল। মা যশোদা দাসীদের নিয়ে সেই ননী উদ্ধারে ব্যস্ত। বালক কৃষ্ণ তখন পাশের একটি ঘরে প্রবেশ করেছেন। সেই ঘরে থরে থরে সাজান ননী ভর্তি কলস। বালক এক একটির ঢাকা খুলছে আর হাত ঢুকিয়ে মহানন্দে ননী খাচ্ছে। মুখে, বুকে, সারা গায়ে মাখামাখি। এ ঘর থেকে ও ঘরের দৃশ্য দেখছেন মাতা যশোদা। ছেলের ওপর রাগ করবেন কি, মনে মনে হেসেই খুন। সখী রোহিণীকে বলছেন, দেখ দেখ কাণ্ড দেখ! যশোদা হাতে একটা ছোট্ট লাঠি নিয়ে নিঃশব্দে পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কপট ক্রোধে বললেন, বড্ড বেড়েছিস, দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোর মজা! পেছন ফিরে তাকিয়ে মাকে দেখেই বালক কৃষ্ণ তাঁর ফাঁক দিয়ে গলে দে ছুট। এইবার মা যশোদা ছেলেকে তাড়া করেছেন।

রামকৃষ্ণের সেই বর্ণনাটি মনে পড়ছে। মাতা যশোদা ঈষৎ পৃথুলা। ব্যসদেব লিখছেন,

ক্ষৌমংবাসঃ পৃথুকটিতটে বিভ্যতি সুপ্রণদ্ধং।
পুত্রস্নেহ স্নুতকুচযুগং জাতঃ কম্পঞ্চ শুধূঃ॥

মা যশোদার পরিধানে পট্টবস্ত্র। কটিদেশে মেদের রেখা। সুতোর বিনুনি দিয়ে প্রস্তুত একটি সুশোভন কোমরবন্ধনী শোভা পাচ্ছে সেখানে। বাৎসল্য ভাবের প্রগাঢ়তায় উন্নত স্তনদ্বয় ফোঁটা ফোঁটা দুগ্ধ বর্ষণ করছে। বক্ষসংলগ্ন বস্ত্র ভিজে যাচ্ছে। মাতা যশোদা দামাল পুত্রকে আজ বাঁধবেন। ছুটছেন। শরীর তরঙ্গায়িত।

ভৈরবীর পরিধানেও পট্টবস্ত্র। পৃথুকটিত। এই তো সেই মাতা যশোদা। এই তো সেই দুগ্ধগন্ধ। রামকৃষ্ণের চোখে ভাবাশ্রু।

গৃহী হৃদয় ভাবছে, মামার এ কী হল? পঁচিশ বছরের যুবক। সদ্য বিবাহিত! সুন্দরী, যৌবনবতী, মধ্যবয়সী রমণীর সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা। কে বলতে পারে, এর মধ্যে প্রেম আছে কি কাম আছে!

রামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মীরা দেখা করতে এসেছেন শ্রীরূপের সঙ্গে। শ্রীরূপ বলে পাঠালেন, রমণীর মুখদর্শন করবেন না। মীরা তাচ্ছিল্যের গলায় বললেন, ও নিজেকে পুরুষ ভাবে বুঝি! জগতে কৃষ্ণ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনও পুরুষ আছে বলে তো আমার জানা নেই!'

হৃদয় লজ্জিত। মনে কুভাব এসেছিল। নিজের মা ছাড়া অন্য কোনও রমণীকে সত্যই যে মা ভাবা যায় এ বোধ নেই তার। রমণী মাত্রেই কামিনী সে যে নিজের কামবোধের জন্যেই, হৃদয় বুঝলেও মন যে মত্ত হস্তী! কোন শৃঙ্খলে বাঁধবে! মামা এই যে দাঁড়িয়ে আছেন ভৈরবীর পাশে, কে বলবে পুরুষ! শরীরের এমনই লাবণী। সকালে সাজি হাতে মামা যখন বাগানে ফুল তুলছিলেন, তখন ভৈরবী বলছিলেন, দেখো হৃদয় ঠিক যেন শ্রীমতী রাধিকা! সব সময় বাঁ পাটা আগে পড়ছে। কৃষ্ণকে পেতে হলে রাধিকা হতে হবে।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'কী করা যায়! হৃদু কি সেজবাবুকে বলে আসবে।'

ভৈরবী বললেন, 'কী বলে আসবে?'

'আমি তোমার কাছে বসে তোমার রান্না খাব। কিন্তু তাতে যে সত্য ভ্রষ্ট হব! যদি বলে ফেলি যে, ঝাউতলায় যাব, তো, না পেলেও গাড়ু হাতে ঘুরে আসি। এমনই আমার সত্যের আঁট।'

ভৈরবী বললেন, 'তুমি আজ সেজবাবুর সঙ্গে খাও। রাতে আমার কাছে খাবে।'

'আমি লুচি খাব, কুমড়োর ছক্কা।'

'যা খেতে চাইবে। সরের নাড়ু তৈরি করব।'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'কী জানি কেন, কোথা থেকে আমার একটা রাক্কুসে খিদে এসেছে। তুমি ভাল ভাল অনেক কিছু রাঁধবে তো!'

শ্রীরামকৃষ্ণ শিশুর মতো আবদার করলেন।

ভৈরবী বললেন, 'দুধের সর তুলে কাঠের জ্বালে ঘি তৈরি করব। গোবিন্দভোগ চালের ভাতে সেই ঘি। ছোট ছোট বড়ি ভাজা, নারকোল ভাজা, বেগুন ভাজা।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আমি লুচির সঙ্গে বেগুন ভাজা খাব। কাঁচালঙ্কা দিয়ে।'

॥ পাঁচ ॥

'তোমার সঙ্গে দুচারটে জরুরি কথা আছে ছোট ঠাকুর।'

মথুরবাবু বসে আছেন তাঁর আয়তন অনুযায়ী বিশাল এক চেয়ারে। চেয়ারটি সায়েব মিস্ত্রির তৈরি। বসে আছেন গঙ্গার দিকে মুখ করে। পাশে একটি ফরসি। নলটি অলস হাতে ধরা। মাঝে, মাঝে ঠোঁটে ঠেকাচ্ছেন। ফিকে গোলাপি পাতলা, সুগন্ধি ধোঁয়া বাতাসে ভেসে যাচ্ছে।

রামকৃষ্ণ সারা ঘরে আনন্দময় পুরুষের মতো পায়চারি করতে করতে বললেন, 'বলো, কি তোমার কথা?'

'দু'দণ্ড বোসো না আমার সামনে। ভোমরার মতো অমন ভোঁ ভোঁ করে উড়ে বেড়ালে কাজের কথা হয়?' রামকৃষ্ণ মেঝেতে বসতে গেলেন, মথুরামোহন ফরসির নল ফেলে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। দুহাতে রামকৃষ্ণের দুটি হাত ধরে নিজের চেয়ারে বসাতে বসাতে বললেন, 'তোমার শরীর স্পর্শ করলেই নিজের শরীর অবশ হয়ে যায়! কোথা থেকে এই শক্তি পেলে বাবা!'

রামকৃষ্ণ চেয়ারে বসে বললেন, 'মাগ ছেলের জন্যে লোকে ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে, তাঁর জন্যে এক ফোঁটা চোখের জলও কি কেউ ফেলে? কাঁদো, কাঁদো, বুক মোচড়ানো কান্না। তিনটে টান এক করে ফেল, তুমিও শক্তি পাবে।'

মথুরামোহন পায়ের কাছে বসলেন।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'আবার তুমি অমন করে বসলে, দীনহীনের মতো। তুমি না মথুরানাথ, মথুরার রাজা!'

'তোমাকে তো আমি বলেছি ঠাকুর, কখনও তুমি পিতা আমি সন্তান, কখনও আমি পিতা তুমি সন্তান। এখন তুমি পিতা। এইবার বল তিনটান কাকে বলে? সেই দুপুর থেকে এখন পর্যন্ত এই ফরসিতে তিনশো টান মেরেছি।'

'সে টান নয় গো! এ আলাদা টান, সন্তানের উপর মায়ের টান, সতী-স্ত্রীর স্বামীর ওপর টান, আর বিষয়ীর বিষয়ের ওপর টান।'

'শোনো বাবা, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি, তুমি কী আমাকে চিনেছ?'

'চিনব না মানে, মা আমাকে সব দেখিয়ে দেখিয়ে দেন। মার কাছে আব্দার করেছিলুম, মা, আমাকে শুকনো সাধু করিস নি, রসেবশে রাখিস। মা দেখিয়ে দিলেন, এই দেহটা রক্ষার...

'আবার তুমি এই দেহ বলছ, ওরা বলে বলুক, এই দেহ বললেই কি আর দেহের অহঙ্কার যায়! ওটা ওদের আদিখ্যেতা? তুমি বলো, আমার।'

রামকৃষ্ণ মধুর হেসে বললেন, 'বেশ, তাই বলি, মা দেখিয়ে দিলেন, আমার শরীর রক্ষার জন্যে চারজন রসদদারকে আমার সঙ্গে পাঠিয়েছেন, তার ভেতর তুমিই প্রথম, তুমিই সবার আগে। দৈবনির্দিষ্ট সম্বন্ধ। মথুরানাথ, তোমাকে আমি চিনব না, তা কখনও হতে পারে।'

রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হচ্ছেন। দেহবোধির বাইরে চলে যাচ্ছেন ক্রমশ, 'মথুর, তুমি যতদিন আছ, আমি ততদিন এখানে আছি।'

মথুর শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। তিনি জানেন, সাক্ষাৎ জগদম্বাই

Scanned by CamScanner

ঠাকুরের শরীর অবলম্বনে তাঁকে ও তাঁর পরিবারবগকে সর্বদা রক্ষা করছেন। রামকৃষ্ণের কথায় বুঝলেন, তার অবর্তমানে রামকৃষ্ণ তার পরিবারবর্গকে ত্যাগ করবেন। মথুর দীনভাবে রামকৃষ্ণকে বললেন, 'সে কি বাবা, আমার পত্নী আমার পুত্র দ্বারকানাথও যে তোমাকে বিশেষ ভক্তি করে!'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'বেশ, তোমার পত্নী আর দোয়ারি যতদিন থাকবে, আমি ততদিন থাকব।' ভবিষ্যতের ছায়ায় বর্তমান বিষণ্ণ হয়ে গেল। কে যাবে, কে থাকবে, কে আবার আসবে কালের স্রোতে ভেসে!

মথুরামোহন জিজ্ঞেস করলেন, 'আবার কি আসতে হবে আমাকে?'

'হ্যাঁ মথুর, তোমার ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয়নি। তুমি আবার আসবে রাজা হয়ে।'

'আচ্ছা ঠাকুর বলতে পার, কাম কি করে যায়! এত চেষ্টা করি, তবু মাঝে মাঝে।'

শোনো, শোনো ভগবদ্দর্শন না হলে কাম একেবারে যায় না। আবার ভগবানের দর্শন হলেও শরীর যতদিন থাকে ততদিন একটু-আধটু থাকে, তবে মাথা তুলতে পারে না। তুমি কি মনে করো আমারই একেবারে গেছে? এক সময় মনে হয়েছিল যে কামটাকে জয় করেছি। তারপর পঞ্চবটীতে বসে আছি, আর এমনি কামের তোড় এল যে আর যেন সামলাতে পারি না। তারপর ধুলোয় মুখ ঘসড়ে কাঁদি আর মাকে বলি, মা, বড় অন্যায় করেছি, আর কখনও ভাবব না যে কাম জয় করেছি! যেই স্বীকার করলুম, সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবটা চলে গেল। সবাই যখন বললে, ভটচায উন্মাদ হয়ে গেছে, ভূতে ধরেছে, তখন আমি কি করতুম জান! শিবলিঙ্গ বোধে নিজের লিঙ্গ পুজো করতুম। জীবন্ত লিঙ্গ পূজা। একটা আবার মুক্ত পরান হত।'

'কি হবে বলতে পার, তোমাকেও দেখি নিজেকেও দেখি, ভগবানের সঙ্গ করেও ভোগবাসনা যাচ্ছে না!'

'ওটা নিয়ে বেশি ভেব না। কলিতে মনের পাপ, পাপ নয়। আর মনে একবার আধবার কখনও কুভাব এসে পড়ে তো— 'কেন এল' বলে বসে বসে তাই ভাবতে থাকবে কেন? ওগুলো কখনও কখনও শরীরের ধর্মে আসে যায়— শৌচ-পেচ্ছাপের চেষ্টার মতো মনে করবে। শৌচ-পেচ্ছাপের চেষ্টা হয়েছিল বলে লোকে কি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসে? তুচ্ছ জ্ঞান করবে, হেয় জ্ঞান করবে। মনে আসতে দেবে না। খুব হরি নাম করবে, প্রার্থনা করবে।

মথুরামোহন অল্পক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'দেখো বাবা, তোমার আর আমার মধ্যে কোনও রাখঢাক নেই। তোমার ভেতরের কথা তুমি আমাকে বলো, আমার ভেতরের কথা আমি তোমাকে বলি। আমার ধারণা, তোমার ভেতরে আর কিছু নেই— সেই ঈশ্বরই আছেন। দেহটা কেবল খোল মাত্র— যেমন বাইরে কুমড়োর আকার কিন্তু ভেতরের শাঁস-বিচি কিছুই নেই। কিন্তু আমার ভেতরে পাপ আছে, পবিত্র হবার বাসনাও আছে। তোমার কাছে সত্য বলছি, ভৈরবীকে প্রথম দিন আমি চরিত্রহীনাই ভেবেছিলুম। সুন্দরী মহিলা, একা একা দেশ বিদেশে ঘোরে, পুরুষের লালসা কি ছেড়ে কথা বলবে! একজন নারীর প্রতিরোধের ক্ষমতা কতটুকু?'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি ঠিক মতো পড়তে পারনি মথুর। ভৈরবী বিদ্যার সাক্ষাৎমূর্তি, মূর্তিমতী সরস্বতী, যোগমায়া।'

মথুর বললেন, 'তুমি তো বেশ ঝটঝট করে বলো বাবা, আমার কি অত শাস্ত্রজ্ঞান আছে! যোগমায়া কাকে বলে?'

'শোনো তাহলে, যোগমায়া হলেন আদ্যাশক্তি। পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। যা কিছু দেখছ সবই পুরুষ-প্রকৃতির যোগ।'

'ঠিক বলেছ।'

'শিব কালীর মূর্তির দিকে তাকাও। শিবের ওপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন। শিব শব হয়ে পড়ে আছেন। কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন। এই সমস্তই পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাই শিব শব হয়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়। আবার রাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্তিরও মানে ওই। ওই যোগের জন্যেই বঙ্কিমভাব। সেই যোগ দেখাবার জন্যেই শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তা, শ্রীমতীর নাকে নীলপাথর। আবার শ্রীকৃষ্ণ পীতবসন ও শ্রীমতী নীলবসন পরেছেন। বুঝলে মথুর, যোগমায়ার এমনি মহিমা— তিনি ভেলকি লাগিয়ে দিতে পারেন। বৃন্দাবন লীলায় যোগমায়া ভেলকি লাগিয়ে দিলেন। তাঁরই বলে সুবোল কৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতীর মিলন করিয়ে দিয়েছিলেন। যোগমায়ার কম আকর্ষণী শক্তি!'

'ইনি তোমার সঙ্গে কার মিলন ঘটাবেন? তুমি তো মিলিত হয়েই আছ।'

'মিলন ঘটাবে শাস্ত্রের সঙ্গে। আমার সাধনার রেলগাড়ি কোন কোন ইস্টিশান ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে সে বলে বলে দেবে। কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রতা হয়ে চক্রের পর চক্র অতিক্রম করে সহস্রারে সদাশিবের সঙ্গে মিলিত হবে।'

মথুরবাবু বললেন, 'তবু জিজ্ঞেস করি বাবা, তোমার কোনও ভয় নেই তো! অসম্ভব সুন্দরী যে!'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'বাত তো ঠিকই আছে, কাজলকি ঘরমে যেত্তা সেয়ান হোয়ে/ থোড়া বুঁদ লাগে পর লাগে/ যুবতীকা সাৎমে যেত্তা সেয়ান হোয়ে/ থোড়া কাম জাগে পর জাগে॥ এখন কথা হল মথুর, আমি পুরুষ না প্রকৃতি!'

মথুরামোহন বললেন, 'এই কথাটি ঠিক। তোমাকে কে বুঝবে বাবা! আমি একটু একটু বুঝেছি। যে লছমি বাঈ বড় বড় মাথা চিবিয়ে খেয়েছে, সে বহুত রোক করে বলেছিল, একবার নিয়ে এসো না, তারপর দেখছি কি করতে হয়! ও সব চরিত্রের গরম অনেকেই দেখায়। সেই লছমি বাঈ পরে আমাকে যা-তা বলেছিল!'

রামকৃষ্ণের বালকের মতো কৌতূহল, 'কি বলছিলে, কি বলছিল?'

'বললে না বুঝেসুঝে কাকে নিয়ে এসেছিল, ছি ছি, এমন কাজও করে। ইনি তো দেবতা। আমরা ওঁর মাথা খাব কী, উনিই তো আমাদের মাথা খেয়ে গেলেন, আর কী ব্যবসা করতে পারব! তিনটে মেয়ে তো অজ্ঞান হয়ে পায়ে পড়ে গেল। আর সারা রাত আমি থেকে থেকে কাঁদি।'

রামকৃষ্ণ হাসছেন খিল খিল করে।

মথুর বললেন, 'কি করেছিলে?'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'দর্শন করেছিলুম। দেখি একজন নয় ঘরভর্তি মা। কেউ খাটে, কেউ খাটের বাজু ধরে, কেউ জানলার কাছে, ঘরের মাঝখানে, ঘরের কোণে।'

'তারপর?'

'তারপর আমার শরীরের সমস্ত গ্রন্থী খটখট শব্দে রুদ্ধ হতে লাগল। ধোঁয়ায় সব আচ্ছন্ন। মা ভবতারিণীর মন্দিরে যেন আরতি হচ্ছে। সামনে মা জগদম্বা। সেই শরীরে ওই মায়েরা টপাটপ সব ঢুকে গেল।'

'তারপর?'

'তারপর তুমি জানো।'

রামকৃষ্ণ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন।

মথুর বললেন, 'কি হল, আমার যে আরও অনেক কথা আছে!'

'চলো না, এমন সুন্দর দিন, পঞ্চবটীতে গিয়ে বসি। কতক্ষণ গঙ্গা দেখিনি।'

দুজন পঞ্চবটিতে গিয়ে বসলেন পাশাপাশি। উদার আকাশ, উদার বাতাস। ঝাঁক ঝাঁক পাখি নানা সুরে ডাকতে ডাকতে এই গঙ্গার দিক থেকে গাছের ডালে বসে, তো পরক্ষণেই উড়ে যায় গঙ্গার দিকে। পৃথিবীর মূল সুরটাই হল আনন্দের। দুঃখ মানুষের তৈরি।

রামকৃষ্ণ হঠাৎ বললেন, 'মনে আছে তোমার, হঠাৎ মনে হল দাস্যভাবে সাধন করব। শ্রেষ্ঠ দাস কে? হনুমান। প্রভু কে? শ্রীরামচন্দ্র। নিজের ওপর আরোপ করলুম হনুমান ভাব। আমি মহাবীর।'

মথুর বললেন, 'জানি, জানি। পেছনে ঝুলছে কাপড়ের লেজ। গাছের ডালে ডালে হুপ হাপ করছ, আর হনুমানের মতোই কাঁচা কাঁচা ফল খোসাশুদ্ধ খেয়ে ফেলছ?'

'একেবারে হনুমান। অন্য কিছু খেতেই পারতুম না। চোখ দুটো সর্বদাই চঞ্চল। মেরুদণ্ডের শেষ ভাগটা প্রায় এক ইঞ্চির মতো বেড়ে গিয়েছিল। গাছের ডালে বসে গম্ভীর স্বরে অনবরত চিৎকার করতুম, রঘুবীর রঘুবীর!'

'এইভাবে আগে কেউ কখনও সাধনা করেছে! কোথা থেকে এসব পেলে তুমি?'

'আমার ভেতর থেকে। মা আমাকে বলে বলে দেন। দেখিয়ে দেন, ধরা যায়। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, সব সত্য।'

'কী পেলে?'

'একদিন বসে আছি এইখানে, এই পঞ্চবটীতলে। ধ্যান বা চিন্তা কোনও কিছুই করিনি। এমনি বসে আছি। এমন সময় নিরূপমা জ্যোতির্ময়ী এক স্ত্রীমূর্তি উত্তরের ঠিক ওই জায়গাটায় এসে দাঁড়ালেন। পুরো জায়গাটা আলোয় আলো হয়ে গেল। সেই আলোয় এখানকার গাছপালা, গঙ্গা সব উদ্ভাসিত। সে যে কী অলৌকিক আলো মথুর। ভাল করে দেখে বোঝার চেষ্টা করলুম, কে, দেবী না মানবী। ত্রিনয়ন যখন নেই, তখন দেবী নয় মানবী। কিন্তু মুখটা যে ভারী সুন্দর। প্রেম-দুঃখ-করুণা সহিষ্ণুতাপূর্ণ সেই মুখের মতো অপূর্ব ওজস্বী গম্ভীরভাব দেবীমূর্তিতেও সচরাচর দেখা যায় না। প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। মোহিত হয়ে গেছি

Scanned by CamScanner

আমি। সেই দেবী মানবী উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন ধীর মন্থর পায়ে। স্তম্ভিত হয়ে ভাবছি, কে ইনি ? এমন সময় একটা হনুমান কোথা থেকে সহসা উ-উপ শব্দ করে তাঁর পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ল, আর তখনই আমার ভেতর থেকে কে বলে উঠল, চিনতে পারছিস না, জনম-দুখিনী সীতা, জনকরাজনন্দিনী সীতা, রামময়জীবিতা সীতা। তখন মা, মা, বলে তাঁর পায়ে পড়তে যাব কি, তিনি বিদ্যুৎবেগে আমার ভেতরে এসে প্রবেশ করলেন। আমার বাহ্যজ্ঞান আর রইল না। যখন জ্ঞান হল, তখন ঘোর রাত। সেই প্রথম, ধ্যানে নয়, চর্মচক্ষে দিব্যদর্শন। জনম-দুখিনী সীতাকে সবার আগে দর্শনের কি মানে জানো মথুর ! আজন্ম দুঃখভোগ।'

মথুরামোহন কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইলেন। এই পঞ্চবটী ! অবাস্তব, অস্বাভাবিক তো কিছু নেই। তবু গা ছমছম করছে। কুঠিবাড়িতে ভূত আছে। অনেকেই বলেছে। সাহেব ভূত। মথুরামোহন ভূত বিশ্বাস করেন না ; কিন্তু রামকৃষ্ণ বিশ্বাস করে। ছোট ঠাকুর, হৃদয়, রামলাল সবাই শুনেছে। গভীর রাতে কেউ একজন চামড়ার জুতো পায়ে খটখট করে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছে। দরজা খুলছে, জানলা খুলছে। ঠাকুরের যুক্তি মথুরামোহন উড়িয়ে দিতে পারেননি। যে জগৎটা তুমি দেখছ, সেটাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, আবার অভ্রান্ত সত্য তাই বা জোর গলায় বলি কেমন করে। এ তো পরিবর্তনশীল। এখানে এক সময় বাগান, কারখানা, কুঠিবাড়ি ছিল। সেই বাগান আজ অন্য বাগান, বিশাল কালীমন্দির, লোকজন, ভক্ত-সমাগম। আবার কালে এও থাকবে না। তাহলে মানুষই সত্য ভূত মিথ্যা এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

মথুর বললেন, 'তুমি কেন বললে দুঃখের জীবন ! আমি কী তোমাকে ঠিক দেখছি না ! আজ সকালে আমি তোমার জন্যে কী কী ব্যবস্থা করেছি জানো !'

দুজনেরই কথা বন্ধ হয়ে গেল। অদ্ভুত এক দৃশ্য ! ভাবে বিভোর। গেরুয়া শাড়ির অঞ্চলভাগ লুটিয়ে যাচ্ছে, খেয়াল নেই। এলোচুল। লাল রুদ্রাক্ষের মালাটি বুকের ওপর দুলছে। হাতে একটি থালা। থালায় সাজান মিষ্টান্ন। ভৈরবী আসছেন। মুখে এমন একটা অদ্ভুত ভাব যেন মাতা যশোদা। তিনি আসছেন, হাতে মাখম রোটি। কোথায় পঞ্চবটী ! এ যে বৃন্দাবন !

জাগো বংশীবারে ললনা জাগো মোরে প্যারে।
রজনী বীতি ভোর ভয়ে হ্যায় ঘর ঘর খুলে কিবারে।
গোপী দহী মহাত সুনিয়ত হ্যায় কঁগনাকে ঝন্‌কারে ॥
উঠো লালজি ভোর ভয়ে হ্যায় সুর নর ঠারে দ্বারে।
গ্বাল বাল সব করত কুলাহন জয় জয় শব্দ উচারে ॥
মাখম রোটি হাতমে লীনী গউত্তনকে রখবারে।

মথুরামোহন প্রথমে বুঝতে পারেননি, কে এই সুন্দরী আলোকজ্জ্বল, সন্ন্যাসিনী। বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইনি কি সেই।' ভাবস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ কোনও রকমে বললেন, 'সেই'। তিনি ক্রমশই বদলাতে শুরু করেছেন। ভৈরবী মাতা যে তরঙ্গ ঠেলছেন তার অভিঘাতে শ্রীরামকৃষ্ণ রূপান্তরিত হচ্ছেন। রামকৃষ্ণ থেকে শ্রীকৃষ্ণ। ভৈরবী আরও কাছে এলেন। অন্য দেহ, অন্য দৃষ্টি, অন্য চেতনা। রামকৃষ্ণের পাশে কে, সে বোধও লুপ্ত। তিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখছেন মোহিত হয়ে

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্‌বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম

একেবারে কাছে, রামকৃষ্ণের অতি সন্নিকটে এসে চমকে নিজেকে সংযত করে নিলেন। মথুরামোহন। সেই দৃষ্টি ! পেছনেই ছিল হৃদয়। ভৈরবী মিষ্টান্নর থালাটি সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে দিয়ে দিলেন। নিজের বেশভূষার এলোমেলো ভাব পরিপাটি করলেন।

মথুরামোহন তাড়াতাড়ি উঠে সন্ন্যাসিনীকে অভিবাদন জানালেন। বললেন, 'আসুন, আসুন, বাবা বলছিলেন, আপনি মূর্তিমতী সরস্বতী।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের উৎসাহে মথুরামোহনকে বললেন, 'ওগো ! তুমি আমাকে যা বলো সেইসব কথা আজ এঁকে বলছিলুম, সেজবাবু বলছে, অবতার তো দশটির বেশি হতে পারে না !'

মথুরানাথ ভৈরবীকে বসার জন্যে সসম্মানে অনুরোধ জানালেন। মথুরানাথকে আশীর্বাদ করে ভৈরবী বেদির একধারে বসলেন।

মথুরানাথ বসতে বসতে বললেন, 'আমার যা ধারণা আমি তাই বলেছি মা। দশাবতারের কথাই তো আছে। মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ভৃগুপতি, রঘুপতি, হলধর, বুদ্ধ, কল্কি।'

ভৈরবী বললেন, 'কেন বাবা ? শ্রীমদ্ভাগবতে চব্বিশটি অবতারের কথা বলার পরে ভগবান ব্যাস শ্রীহরির অসংখ্যবার অবতীর্ণ হবার কথা বলেছেন তো ! বৈষ্ণব গ্রন্থেও মহাপ্রভুর পুনরাগমনের কথা পরিষ্কার বলা আছে। তা ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হল, মহাপ্রভু আর রামকৃষ্ণের শরীর-মনে প্রকাশিত সমস্ত লক্ষণ একেবারে এক। আমি প্রমাণ করে ছাড়ব শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার। কলকাতায় আপনি এত সভা করেন, এখানেও একটি সভা হবে।'

মথুরবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'কী সভা ?'

'পণ্ডিতসভা। বিশিষ্ট পণ্ডিতরা আসবেন। বিচার হবে। আমি প্রমাণ করব, রামকৃষ্ণ অবতার। মহাপ্রভু আবার এসেছেন, ক্ষুদিরামের ঘরে গদাধর হয়ে। গীতায় ভগবান বলেছেন, ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হলেই আমি আসব। তিনি এসেছেন।'

রামকৃষ্ণ ছেলেমানুষের মতো খুশি, 'শুনছ মথুর !'

মথুরামোহন বললেন, 'সবই শুনছি, কিন্তু যদি প্রমাণ করতে না পারেন, যদি হেরে যান !'

ভৈরবী 'যোগমায়া' হাসলেন। হৃদয়কে বললেন, 'সকলকে মিষ্টি দাও।'

মথুরামোহন হাসতে হাসতে বললেন, 'জয়ের আগেই বিজয় মিষ্টান্ন !'

হৃদয় জল আনতে গেল। রামকৃষ্ণের প্রিয় কুকুরটি অদূরে বসে আছে। বিভোর হয়ে গঙ্গাদর্শন করছে। সুন্দর দেখতে। কান দুটো পেছন দিকে টান টান করে রাখছে। কপালে গঙ্গার বাতাস লাগছে। খুশি খুশি চোখ দুটো আধবোজা। জিভটা সামনে ঝুলছে। মাঝে মাঝে ঢোঁক গেলার সময় ভেতরে টেনে নিয়েই আবার ঝুলিয়ে দিচ্ছে সামনে। রামকৃষ্ণ কুকুরটির নাম রেখেছেন 'কাপ্তেন'।

সেদিন রামলালকে বলছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল। রামকৃষ্ণ আদর করে ডাকেন, রামনেলো। মন্দিরের অন্যতম পূজারি, সুগায়ক। রামকৃষ্ণকে গান শোনান। গল্প করেন। রামকৃষ্ণের ঘরে রাতে হৃদয়ের সঙ্গে শয়ন করেন। রামকৃষ্ণের ওপর নজর রাখেন। কথায় কথায় বলছিলেন, 'রামনেলো, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কুকুর, বেড়ালেরও ভাগ্য দেখেছিস, মায়ের প্রসাদ খাচ্ছে, গঙ্গাদর্শন করছে আর পবিত্র গঙ্গাজল পান করছে। এদের মধ্যে আমার কাপ্তেন হল পুণ্যাত্মা। ভাল সংস্কার নিয়ে এসেছে। মনে হয় কোনও সাধু দৈব অভিশাপে কুকুর হয়ে জন্মেছে। এমন হয়।' রামলালের তখনই মনে হয়েছিল, সত্যই তো ! এত কুকুর মন্দিরে ; কিন্তু রামকৃষ্ণ ঠিক লক্ষ রেখেছেন, একমাত্র কাপ্তেনই মা ভবতারিণীর মন্দিরের সামনের চাতালে মায়ের দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। গঙ্গার ঘাটের সিঁড়িতে বসে গঙ্গাদর্শন করে, গঙ্গার জল খায়। রামকৃষ্ণ ডাকা মাত্রই পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ে। রামকৃষ্ণ লুচি আর সন্দেশ খাওয়ান।

রামকৃষ্ণ হৃদয়কে বললেন, 'কাপ্তেনকে একটা সন্দেশ দে।'

মথুরামোহন প্রশ্ন করলেন, 'বাবাকে যখন আপনি অবতার বলেই চিনেছেন, তখন আবার সাধনভজন কেন ? আপনি বলছেন তন্ত্রসাধনা করাবেন !'

'এই প্রশ্ন শুধু আপনার কেন, সকলের মনেই জাগবে। একটা শক্তি ঘাড় ধরে আমাকে এখানে টেনে এনেছে। তখন বুঝিনি কোথায় আসছি, কার কাছে আসছি। দেখো বাবা, এই আদেশ আমার কাছে আজ আসেনি, এসেছে অনেক আগে। বলেছিল তিনজন। দুজনের সঙ্গে আমার কাজ হয়ে গেছে। তারা সাধক। তৃতীয়টি যে সাক্ষাৎ অবতার, তা তো জানতুম না। ওই বকুলতলায় এসে বসামাত্রই শরীর অবশ। মাঝি জিজ্ঞেস করছে, মা, এই জায়গা ! উত্তর দিতে পারছি না। কথা সরছে না। হঠাৎ হৃদয় বললে, চলুন, মামা ডাকছে। দেখামাত্রই মুগ্ধ, এই তো সেই ! তারপর যতদিন গেল, ততই অনুভব করতে লাগলুম, রামকৃষ্ণ সম্পর্কে সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে হবে।'

মথুরামোহন বললেন, 'কী ভাবে দূর করবেন ?'

ভৈরবী বেশ ভাল ভাবে বসে, একটু সময় নিয়ে বললেন, 'দেখো সেজবাবু, শাস্ত্র নির্দিষ্ট সাধনপথের একটা গুরুপরম্পরা আছে। রামকৃষ্ণ এতকাল যা করেছে, তা হল তীব্র অনুরাগের পথ ধরে ঈশ্বরদর্শনের চেষ্টা। তার ফলে নিজের উচ্চাবস্থা সম্পর্কে কোনও ধারণাই করতে পারছে না। শরীরে যে সব পরিবর্তন আসছে, যেসব প্রত্যক্ষ দর্শন আর অনুভূতি হচ্ছে, শরীরে যে-সব বিকার দেখা দিচ্ছে, পাঁচটা সাধারণ, অজ্ঞমানুষ তাকে বলছে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ। সেইভাবে চিকিৎসাও হচ্ছে। আরে এসব যে শাস্ত্রে আছে। প্রকৃত সাধককে, এইসবের ভেতর দিয়েই যেতে হয়। সেজবাবু তুমি কি বিরক্ত হচ্ছ !'

'দেখে কি তাই মনে হচ্ছে ?'

'তুমি কাজের লোক।'

'বাবার সঙ্গ করে বুঝেছি, কোনটা কাজ, কোনটা অকাজ।'

'তা হলে শোনো। মহাপ্রভুর যা যা হয়েছিল রামকৃষ্ণের ঠিক তাই

Scanned by CamScanner

হয়েছে কি না, তুমি নিজেই মিলিয়ে দেখো, আমি একে একে বলে যাচ্ছি। অসাধারণ ঈশ্বরপ্রেম তার ফলেই যত অলৌকিক দর্শন। যত দেহবিকার। ভগবদালাপে ভাবসমাধি মুহুর্মুহু বাহ্যচৈতন্যলোপ, কীর্তনে পরমানন্দ, এ সবই শ্রীচৈতন্যদেবের হত। আমি চৈন্যচরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত পড়ে শোনাব। বুঝতে পারবে, দুজনে এক। মহাপ্রভু আর একবার আসবেন, সে-কথাও আছে। এই তিনি এসেছেন। সেবার চৈতন্যঅবতার, এবার রামকৃষ্ণ অবতার। দেখো, মহাপ্রভু ভাবাবেশে যাকেই স্পর্শ করতেন তার ধর্মভাব জাগত। রামকৃষ্ণেরও সেই একই শক্তি, আমি লক্ষ করেছি। আর একটা ব্যাপার তোমরা জানো না, হৃদয় জানে, রামকৃষ্ণের মাথায় হাত ঠেকাবার উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে সমাধি।'

মথুরামোহন বললেন, 'তাই নাকি ? এ তো জানতুম না !'

ভৈরবী বলতে লাগলেন, 'গাত্রদাহ, গাত্রদাহ। মনে হল মহাপ্রভুকে যা যা করা হত করে দেখি না। স্রচন্দনাদি লেপন, পুষ্পমাল্য ধারণ। দেখ, তিন চারদিনেই সেই দাহ আর নেই। সবচেয়ে মজাটা কী হয়েছে জানো মথুরবাবু ! নিমাই ছিলেন পণ্ডিত। পাণ্ডিত্য ভেসে গেল। অধ্যাপনা ঘুচে গেল। ভক্ত নিমাই। কাঁহা করোঁ কাঁহা পাভ ব্রজেন্দ্রনন্দন কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥ এইখানে শেষ। ধরো প্রথম খণ্ড শেষ, এইবার দ্বিতীয় খণ্ড, মহাপ্রভুর দ্বিতীয় আবির্ভাব। গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণ, এবার আর শাস্ত্র নেই শুধু ভক্তি।

মথুরামোহন বললেন, 'বাঃ, বেশ কথা।'

ভৈরবী বললেন, 'শাস্ত্র পড়লে লোকে বলত, এ আর কী আছে ! জানে তো সব মহাপ্রভুকে নকল করছে। সেটি বলার উপায় নেই। সহজ, সরল, কিছুই জানে না। আবেগে সব প্রকাশ পাচ্ছে, দায় আমার নয়, দায় তোমাদের। কাচ না হীরে ? ভণ্ড না ভগবান ? এবারের খেলাটা বুঝলে মথুরবাবু !'

মথুরবাবু বললেন, 'আমি এককথায় মোহিত। আমার বিশ্বাস, এই দক্ষিণেশ্বরে একটা ইতিহাস তৈরি হবে।'

রামকৃষ্ণ এতক্ষণ চুপচাপ বসে মিটিমিটি হাসছিলেন আর আলোচনা শুনছিলেন। হঠাৎ গভীর একটা ভাবে চলে গেলেন। সেই ভাবমুখে ধীরে ধীরে, থেমে থেমে বলতে লাগলেন, 'অষ্ট সখীর এক সখী রাসমণি। এই দেবালয় করলে, মা থাকবেন বলে। এটা আমার মায়ের অন্দর মহল, আর কালীঘাট মায়ের সদর কাছারি। মা ভোরবেলায় মাখন মিছরি খেয়ে কালীঘাটে যান ভক্তের বাসনা পূর্ণ করতে। কত লোকে এসে নানান কামনা করে, মা সেইসব শুনতে, দেখতে যান। আর রাত নটার সময় মা এসে, মন্দিরের চুড়োতে বসে হাওয়া খান ও গঙ্গাদর্শন করেন।'

মথুরামোহন প্রশ্ন করলেন, 'কোন চুড়োতে ?'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'একেবারে সব ওপরের ওই মস্ত চূড়োটায়। পা দুলিয়ে দুলিয়ে, ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গঙ্গা দেখেন, কলকাতা দেখেন। জানো মথুর এখানে খুব ধুমধাম হবে। আলোয় আলো। ভক্তরা গিজগিজ করবে। ওই ওদিকে ভোজন, এদিকে ভজন। বক্তৃতা, শাস্ত্র আলোচনা, যাত্রা-পালা। সব আছে ভবিষ্যতে। এল, এল।'

মথুরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'সবই বুঝলাম ; কিন্তু তন্ত্র কেন ?'

'প্রথম কথা, তোমার, আমার ইচ্ছেতে কিছু হবে না।' ভৈরবী কণ্ঠস্বরে এখন অন্য তেজ, 'আমি এসেছি তাঁর নির্দেশে। এসে দেখছি, এ কী ? কার কাছে তুমি পাঠালে ? অবতারের গুরু হবে সাধারণ মানবী ! সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, তুমি কি ভেবে দেখেছ যোগেশ্বরী, কার শক্তিতে তুমি সংসার ত্যাগ করে শাস্ত্র, সংস্কৃত শিখলে ? কোন শক্তিতে সিদ্ধা হলে চৌষট্টি তন্ত্রের দুরূহ সাধনায় ? কেন হলে, কার জন্যে হলে ? এমন যে হতে পারে, তোমার ধারণায় ছিল ? না। তাহলে ? গেরুয়া, ত্রিশূল, রুদ্রাক্ষ ধারণ করলেই যোগিনী হয় না। সমস্ত সংস্কার পুড়িয়ে ছারখার করতে হয়। অসীম সাহস, নিশ্ছিদ্র সংযম, ক্ষুরের ধার ধরে হাঁটা। যোগেশ্বরী।! তোমাকে তৈরি করেছি, রামকৃষ্ণের জন্যে। বিশ্বাস করিনি ; কিন্তু প্রথম দর্শনেই এমন একটা আকর্ষণ, অলৌকিক, বলে বোঝান যাবে না। এমন এক আধার ! আমার কাছে যা আছে সব দিয়ে যাব। কেন তন্ত্র ? মথুরবাবু একমাত্র তন্ত্রেই আছে, কোন সাধনের কী ফল ! কী করলে কী হবে ! সাধনার পথ ধরে যত এগোবে, ততই আসতে থাকবে অদ্ভুত অদ্ভুত উপলব্ধি। দেহ আর মনের বিচিত্র সব পরিবর্তন। আমি করেছি, আমার হয়েছে। আমি মিলিয়েছি। রামকৃষ্ণকে সেই কারণেই তন্ত্রসাধন করাব। সে নিজেই বুঝতে পারবে, সে পাগল হয়নি, সে এগোচ্ছে সিদ্ধির দিকে। নরবপুতে ঈশ্বরীয় লীলা। শাস্ত্র সাধককে বারে বারে বলেছেন, গুরুবাক্য, গুরুনির্দেশ, গুরু, সহায় অবলম্বন করে সাধন না করলে জীবনের অনুভব বুঝতে পারবে না। সমস্তটাই ব্যর্থ হবে। প্রকৃতই হয়তো পাগল হয়ে যাবে। আমার যে কী আনন্দ ! এত দিনে আমি এমন একজনকে পেয়েছি, যাকে আমি সব ঢেলে দিতে পারব। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, শিষ্যে আমার ইষ্ট দর্শন হয়েছে।'

হু হু করে গঙ্গার বাতাস বইছে। মথুরানাথের মনে এই মুহূর্তে আর কোনও বিষয়চিন্তা নেই। মাত্র কয়েক ঘণ্টা দূরে পড়ে আছে বিষয়ের কলকাতা, বিষয়ীর কলকাতা। মথুরবাবু দীনু খাজাঞ্চিকে ডেকে পাঠালেন।

দীনু এসে হাতজোড় করে দাঁড়াল। মথুরবাবু আদেশের গলায় বললেন, 'শোনো দীনু, বাবার জন্যে আলাদা একটা ভাঁড়ারের ব্যবস্থা করো।'

দীনু বললে, 'আজ্ঞে, তাই হবে।'

'কী কী থাকবে ?'

'আজ্ঞে আপনার নির্দেশ।'

'সাধুসেবার জন্যে যা যা লাগে, কাপড়, কম্বল, কমণ্ডলু, উত্তরীয়, জলপাত্র, ভোজন পাত্র...'

রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কী কী লাগে বাবা ?'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'ভোজনের জন্যে সিধা তো দিতে হবে ! খালিপেটে তো ধর্ম হবে না ! চাল, আটা, ডাল, নুন, ঘি।'

মথুরবাবু দীনুকে বললেন, 'শুনলে ? একেবারে ঘরভর্তি জিনিস। একটা দুটো নয়। তালা বন্ধ থাকবে। বাবার নির্দেশ ছাড়া কোনও জিনিস বেরোবে না, কেউ হাত দেবে না। বুঝলে কিছু ?'

'আজ্ঞে বুঝেছি।'

'যাও।'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'হঠাৎ এমন ব্যবস্থা !'

মথুরবাবু বললেন, 'আরও আছে। তোমার জন্যে গাড়ি আর পালকির ব্যবস্থাও করব যখন যেমন প্রয়োজন। শোনো বাবা, কে কি বলবে, কে কি ভাববে, আমি গ্রাহ্য করি না, আমি তোমারই আশ্রিত সেবক। সাধু-সন্তের সেবার কোনও ত্রুটি যেন না হয়, এ শিক্ষা তুমিই আমাকে দিয়েছ। এই মায়ের স্থানে আছেন দুজন, মা কালী আর সাক্ষাৎ তুমি। পূজা আর সেবা, এই তো ধর্ম ?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'আমি আরও একটু এগিয়ে দোবো-তোমাকে, শুধু সাধু সেবা নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা। অনাথ, আতুর দুঃখী, দরিদ্র মানুষের সেবা। আমি তোমাকে কী চোখে দেখি-তা তো তুমি জানো মথুর !'

'জানি বাবা।'

'তাহলে শোনো, সংসারী ব্যক্তি নিষ্কামভাবে যদি কাউকে দান করে সে নিজের উপকারের জন্যে, পরপোকারের জন্য নয়। সর্বভূতে হরি আছেন তাঁরই সেবা করা হয় ! হরিসেবা হলে নিজেরই উপকার হল পরোপকার নয়। এই সর্বভূতে হরির সেবা-শধু মানুষের নয়, জীবজন্তুর মধ্যেও হরির সেবা, যদি কেউ করে, আর যদি সে মান চায় না, যশ চায় না, মরবার পর স্বর্গ চায় না, যাদের সেবা করছে, তাদের কাছ থেকে উল্টে কোনও উপকার চায় না, এরূপ ভাবে যদি সেবা করে, তাহলে তার যথার্থ নিষ্কাম কর্ম, অনাসক্ত কর্ম করা হয়। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম করলে তার নিজের কল্যাণ হয়। এরই নাম কর্মযোগ। এই কর্মযোগও ঈশ্বরলাভের একটি পথ। কে কার উপকার করতে পারে মথুর ! পরের উপকার পরের মঙ্গল সে ঈশ্বর করেন— যিনি চন্দ্র, সূর্য, বাপ, মা, ফল, ফুল, শস্য জীবের জন্যে করেছেন। বাপ-মার ভেতর যে স্নেহ দেখ, সে তাঁরই স্নেহ, জীবের রক্ষার জন্যই দিয়েছেন। দয়ালুর ভেতর যে দয়া দেখ, সে তাঁরই দয়া নিঃসহায় জীবের রক্ষার জন্যে দিয়েছেন। তুমি দয়া করো আর না করো, তিনি কোনও না কোনও সূত্রে তাঁর কাজ করবেন। তাঁর কাজ আটকে থাকে না।'

মথুর স্তব্ধ, ভৈরবী মুগ্ধ। এ অন্য রামকৃষ্ণ। সাধক নয় গুরু।

রামকৃষ্ণ এদিক ওদিক তাকিয়ে গাছের আড়ালে হৃদয়কে খুঁজে পেলেন, ডাকলেন, 'এই হৃদু।'

হৃদয় বললে, 'বলো মামা !'

'তামুক সাজ না। বেশ করে টান মেরে আনবি। ধনের চাল, মৌরি ছড়িয়ে দিবি।'

ভৈরবী বলে উঠলেন, 'সে আবার কী ?'

রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, 'এ তামুক সে তামুক নয় গো। এ হল কবিরাজি তামুক। বায়ু নাশক। আগরপাড়ার বিশ্বনাথ কোবরেজ। সে বললে, তামুকে উপকার হবে, তবে ছিলিমের ওপর ধনের চাল, মৌরি ছড়িয়ে দেবে।'

মথুরবাবু বললেন, 'এইবার আমি উঠি। মন্দিরের হিসেব পত্তর নিয়ে বসতে হবে। মালপত্তর সরছে। রানিমার দায়িত্ব। এদিক, ওদিক হলে ক্ষমা করবেন না।'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'কেন করবে ! চুরি, অপচয় দুটোই অপরাধ !'

Scanned by CamScanner

মথুরামোহন হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি সেদিন কী করেছ ?'

'কই আমি তো কিছু চুরি করিনি।'

'তুমি আর কী চুরি করবে ? টাকা মাটি মাটি টাকা করে, কামিনী-কাঞ্চন মুক্ত হয়ে বসে আছ।'

'তাহলে যে বলছ !'

'আমার কাছে খবর আছে।'

হৃদয় তামাক সেজে এনেছে। তামাকের গন্ধের সঙ্গে ধনের চাল আর মৌরির গন্ধ মিশে বিচিত্র এক সুবাস হয়েছে। রামকৃষ্ণ হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিয়ে একটা টান মারলেন। এক ঝাঁক আগুনের ফুলকি কল্কের মাথা থেকে উড়ে গেল।

মথুরবাবু হৃদয়কে বললেন, 'হৃদয় ! সেই মাঝরাতের কাণ্ডটা বল তো।'

হৃদয় ভয়ে ভয়ে বললে, 'আপনি বলতে বলছেন, মামা যদি রাগ করে ?'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'বলার আর কী বাকি রেখেছিস শালা ! বল না শুনি।'

'আমি আর রামু শুয়ে আছি ; মামা তক্তাপোষে। আমাদের মনে হল ঘুমোচ্ছে। সারাদিনের খাটাখাটুনি।

বিছানায় পড়ামাত্রই ঘুম। হঠাৎ দুজনেরই ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে একটা আলো জ্বলছে। খুটখাট নানারকম শব্দ। এইবার দেখছি কী, মেঝেতে মামা বসে আছে দিগম্বর হয়ে। সামনে একটা বঁটি। ঘস ঘস করে আনাজ কুটছে। আমরা তো অবাক, এ আবার কী ! সারারাত যে মায়ের সঙ্গে রঙ্গ করে, তার এ কী রঙ্গ ! একপাশে একটা বাটিতে এক মুঠো চাল, আর একটা রেকাবিতে কিছু মশলা। সত্যিই বলছি, আমার খুব রাগ হয়েছিল। চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলুম, কী হচ্ছে কী তোমার ? আমরা তো রয়েছি। ওসব কাল সকালে আমরা করে দিতে পারতুম না ! যাও তো, গিয়ে শুয়ে পড়ো। কাল সকালে আমরা করে দোবো। কত বড় কাজের লোক ! ওই তো কাজের ছিরি ! যা আনাজ কেটেছ, আর যে পরিমাণ চাল বের করেছ, তাতে তো একটা লোকেরই আধপেট ভরাও হবে না। এই তো তোমার মাপ ! সাধু হলে লোকের হাত দরাজ হয়, তোমার দেখছি সবই উল্টো। হাড় কেপ্পন !'

মথুরবাবু হৃদয়কে থামিয়ে দিয়ে রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হঠাৎ তোমার এমন উদ্ভট খেয়াল হল কেন ?' হুঁকোয় গুড় গুড় শব্দ। রামকৃষ্ণ বললেন, 'আর বোলো না। ঝপ্ করে ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারে বসে রইলুম কিছুক্ষণ, তারপর ভাবলুম বসে বসে, যারা আমার পেটের আটকোল জানে না, তারা রোজ এত এত বের করে, রাঁধে, বেড়ে দেয়, যত না খাই, তার চেয়ে বেশি ফেলা যায়। সারা কালীবাড়ির এই অবস্থা ! তোমার কর্মচারীরা যত না খায়, তার চেয়ে বেশি ফেলে দেয়। এই অপচয় আমার গায়ে লাগে, আমি সহ্য করতে পারি না !'

রামকৃষ্ণ হৃদয়কে বলছেন, 'শোন হৃদু, এই সেজবাবুর সমক্ষে তোকে আজ একটা কড়া কথা বলি, এই ভাতের জন্যেই তুই কুলীনবামুনের ছেলে হয়ে কোথা সিহড় আর কোথা দক্ষিণেশ্বরে এসে দুটো ভাত আর পয়সার জন্যে এখানে চাকরি করতে এসেছিস। আজ দেশে যদি তোর ধান জমি, টাকা-পয়সা থাকত তাহলে কি তুই এখানে চাকরি করতে আসতিস ! মিতব্যয়িতা একটা গুণ। ওটা না থাকলে লক্ষ্মীছাড়া হতে হয় !'

হৃদয় অধোবদন। মথুরামোহন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। গঙ্গার বাতাসে ভৈরবীর এলো চুল উড়ছে। টকটকে গেরুয়া আঁচল বিস্রস্ত হচ্ছে। মাঝ গঙ্গা দিয়ে জল কাটতে কাটতে চলেছে বিশাল এক স্টিমার। টিপ টিপ আলো জ্বলে উঠছে ওপারে। পঞ্চবটীতলে ঘন হয়ে আসছে রাতের অন্ধকার। পঞ্চবটীর অদূরে, ম্যাগাজিনের ওপারে আঁড়িয়াদহ গ্রামে শেয়াল সমস্বরে রাতের আগমনী গাইছে।

রাত আমার ভীষণ প্রিয়। রামকৃষ্ণ ভাবছেন। সব মন্দিরে একে একে আরতি শেষ হবে। পুণ্যার্থীর দল ফিরে যাবে। কর্মচারীরা যে যার আবাসে। সিংহদুয়ার বন্ধ হবে। কয়েকজন পাহারাদার লাঠি ঠুকে ঠুকে ঘুরবে এপাশে ওপাশে। মাঝে মাঝে অশরীরী আতঙ্কে কুকুরের চিৎকার।

আমি কি কোনও জীবনে তান্ত্রিক ছিলুম ! নিজেকেই নিজের প্রশ্ন।

গভীর রাতে গভীর অরণ্য। নির্জন শ্মশান, শব, শিবা, অপদেবতা, সর্পিল সর্প, রাত্রির মধ্যযামে পেঁচার কর্কশ ডাক, শ্মশান শকুনের কাতর কান্না। কামারপুকুরের সেই দুই শ্মশান, 'ভূতির খাল', 'বুধুই মোড়ল'। কানে কানে কেউ এসে ডেকে যায়, 'গদাধর ! চলো, চলো ! নিদ্রিত মানুষের চিরশয়নের ক্ষেত্রে চলো। বিশালের রহস্যে চলো। এ জগৎ ঘুমোলে ওই জগৎ জেগে ওঠে। তার অন্ত নেই। আদি নেই। সে শুধু আছে। কেউ যায় না। ভয় ! তুমি চলো। তোমার মা আছেন সেখানে। জ্বলৎপাবকজ্বালজালাতিভাস্বচ্চিতামধ্যসংস্থাং সুপুষ্টাং সুখর্বাম শবং বামপাদেন— মেঘমন্দ্র কণ্ঠে অশরীরী গুরুর মন্ত্রপাঠ।

গদাধরকে খুঁজে পাচ্ছ না ! সবাই ফিরে এসেছে ঘরে, এত রাত ! সেই শুধু আসেনি। যাও, দেখে এসো ভুতির খালে। পর পর নতুন হাঁড়িতে মিষ্টি সাজিয়ে বলি নিবেদন করে দাঁড়িয়ে আছে গদাধর। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ! আলকাতরার মতো কালো জল। শবের দগ্ধাবশেষ ভাসমান। পূতিগন্ধময় পরিবেশ। ঝোপের অন্তরালে সার সার জ্বলন্ত চোখ। আসছে তারা। গন্ধ পেয়েছে। এই শিবাকুল গদাধরের পরিচিত। এরা মায়ের সঙ্গী। খাও, খাও, পেট পুরে খাও। কামারপুকুরের জিলিপি। আমিও খাই। মিষ্টান্ন ভাণ্ডের কয়েকটি বাতাসে ভেসে উঠে শূন্যে লীন হয়ে গেল। একের পর এক। ক্ষুধার্ত অশরীরী আত্মার আকর্ষণ। দূরে, বহুদূরে লণ্ঠন হাতে রামেশ্বর দাদা ডাকছেন, 'গদাধর, গদাধর।'

'যাচ্চি গো দাদা, তুমি এদিকে আর এসো না। যেখানে আছ সেইখানেই থাক, আর এক পাও এগোবে না।'

গদাধর সাবধান করছে দাদাকে। এদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। রাতের দ্বিতীয় প্রহরে এদের সঙ্গেই আমার শ্মশানলীলা। সাধারণ মানুষ এলেই ঘাড় মটকে দেবে। ধূসর ধূমে চরাচর আচ্ছন্ন। শৃগালের সরব দল। থকথকে জলের কোলে বিক্ষিপ্ত নরকরোটি। দাঁড়িয়ে আছেন গদাধর। একটি বিল্ববৃক্ষ রোপণ করেছেন। সেটি বড় হচ্ছে। প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে তাঁর ধ্যানের আসন। শেষ প্রহরে ভোরের ফিকে আলোয় মা এসে সামনে দাঁড়ান। কী রূপ তাঁর !

মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং শবশিবারূঢ়াং ত্রিনেত্রাং পরাং
কর্ণালম্বিনৃমুণ্ড যুগ্মভয়দাং মুক্তস্রজাং ভীষণাং।

অর্ধবাহ্যদশায় গদাধর বলছেন, কালীং কালহরাং দেবীং ক্রীং কারবীজরূপিনীম্। কামরূপাং কলাতীতাং কালিকাং দক্ষিণাহ। বৈঠকখানা বাজারে থাকেন কেনারাম ভট্টাচার্য। মথুরবাবুদের সঙ্গে খুব আলাপ ! দেবালয়ে প্রায়ই আসেন। প্রবীণ মানুষ। অনুরাগী শক্তিসাধক। সম্মানিত শ্রদ্ধেয়। মনে হল দীক্ষা নোবো, তো নোবোই। দিনক্ষণ স্থির। মা ভবতারিণী সামনে। গুরু কানে মন্ত্র দেওয়া মাত্রই সমাধি। একেবারে মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। কী হল, কী হল। মায়ের পাশে বরাভয়করা দেবীর ভাবে অমন করে দাঁড়িয়ে কেন আমাদের ছোট পুরুত ! প্রবীণ গুরু বললেন, বুঝলে না, শক্তিমন্ত্রের বীজটি ঠিক জমিতে গিয়ে পড়েছে বাবা !

সারারাত শ্মশানে ! প্রেতসঙ্গে ! শিবার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ ! লক্ষণ খুব খারাপ। ও মা, তোমার গদাইকে ভূতে ধরেছে। তাহলে ডাক ওঝা। ওঝা এসে একটা মন্ত্রপূত পলতে পুড়িয়ে শুঁকতে দিলে। বললে, যদি ভূত হয় ছেড়ে পালাবে। কিন্তু কিছুই হল না। তখন এলেন কয়েকজন প্রধান ওঝা। গভীর রাতে তাঁরা পুজোয় বসলেন। চণ্ড নামাবেন। সত্যি সত্যিই একজন পূজারির আবেশ হল। চণ্ডের উদ্দেশে প্রদত্ত বলি তিনি গ্রহণ করে প্রসন্ন হলেন। বললেন, 'ওকে ভূতেও পায়নি, কোনও শক্ত অসুখও ওর হয়নি।' তারপর সকলের সামনেই চণ্ড আমাকে সম্বোধন করে বললেন, 'গদাই, তুমি সাধু হতে চাও, তবে অত সুপুরি খাও কেন ? বেশি সুপুরি খেলে যে কাম বাড়ে !' সত্যিই খুব সুপুরি খাওয়ার অভ্যাস হয়েছিল। চণ্ডের নির্দেশে ছেড়ে দিলুম।

তারপরে সিদ্ধান্ত হল, দাও বিয়ে। গদাধরের সঙ্গে বালিকা সারদার শুভ পরিণয়। কেন বিবাহ ! তুমি সাধু। তোমার কাঞ্চন স্পর্শ করার উপায় নেই। কামজয়ী হওয়ার জন্যে কত কাণ্ডই না করেছি ! আনন্দাসনের চারপাশে হাতজোড় করে ঘুরতুম, আর বলতুম, মা, আমাকে কামজয়ী করো মা। পূজার সময় আসনে বসে ভূতশুদ্ধির সময় রোজ যেমন চিন্তা করি, বামবগলে যে পাপ পুরুষ আছে, সে দগ্ধ হল। একদিন মনে মনে ঠিক সেই কথাই ভাবছি পঞ্চবটীর এইখানটাতেই বসে, কই পাপ পুরুষ তো দগ্ধ হল না। তখন আমার ওই অবস্থা, অসম্ভব গাত্রদাহ, বুকের ভেতর যেন আগুনের মালসা বসানো। ভাবছি আর কাঁদছি, হঠাৎ দেখি কী, মিশকালো রং, লাল লাল চোখ, ভীষণাকার একটা পুরুষ যেন মদ খেয়ে টলতে টলতে এই শরীর থেকে বেরিয়ে এসে এই সামনেটায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। অবাক কাণ্ড। আরে এই তো সেই সাক্ষাৎ মন্ত্র, পাপ পুরুষ, রোজ যেটাকে পুড়িয়ে মারতে চাই

পুরুষং কৃষ্ণবর্ণাঞ্চ রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্।
খড়াচর্মধরং ক্রুদ্ধমঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণকম্ ॥

পরক্ষণেই দেখছি—আর একজন সৌম্যমূর্তি পুরুষ গৈরিক ও ত্রিশূল ধারণ করে এই শরীর থেকেই বেরিয়ে এসে ওই ভীষণাকার পুরুষকে সবলে আক্রমণ করে মেরে ফেলল। আশ্চর্য ! ওই দিন থেকে টানা ছমাসের গাত্রদাহ কমে গেল।

তাহলে কামকাঞ্চনত্যাগী গদাধর পাঁচ বছরের একটি বালিকাকে বিয়ে করলে কেন ? সংসারই যদি না করবে ?

Scanned by CamScanner

সবাই বললে ! মনে আনন্দ হল। বাদ্য, বাজনা, আলো, মালা, ভোজ। তাই করে ফেললুম। না, না তা কেন, দশবিধ সংস্কারের একটি সংস্কার হল বিবাহ, সংহিতায় আছে। আমি জানি না, মা জানেন।

রামকৃষ্ণ নিজের ভাবেই নিজের জীবন কথা বলছিলেন।

কে শ্রোতা ? এমন কথোপকথন তাঁর সারাদিনই চলে। কার সঙ্গে কেউ জানে না।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখলেন প্রদোষের প্রায় অন্ধকারে ভৈরবী বসে আছেন। বড় আপনজন। সাধক আর সাধনার সব, সব জানে এই ভৈরববী। মায়ের খাস দরবারের লোক। দক্ষিণেশ্বরের মায়ের চিঠি পেয়ে এসেছে। চলে এসো ভৈরবী যোগেশ্বরী। আমার ছেলে আমাকে কেঁদে কেঁদে বলেছে, 'আমার এ কী অবস্থা তুমি করলে মা। আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না মা। তুমি আমাকে যা করবার করাও। যা শেখাবার শেখাও। দেখা দাও। সর্বদা আমার হাত ধরে থাকো।'

রামকৃষ্ণ হঠাৎ বললেন, 'তাই বুঝি তুমি এলে ?'

ভৈরবী বললেন, হ্যাঁ, তাই এলাম। রামকৃষ্ণ দুঃখ মাখা গলায় বললেন, 'এত ভেবেছিলাম, বিয়ে করব, শ্বশুরবাড়ি যাব, সাধ আল্লাদ করব, কী হয়ে গেল !'

ভৈরবী অনেকটা কাছে সরে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'কিসের সাধ, কীসের আল্লাদ ! তুমি কি সাধারণ মানুষ। তোমার কি লিঙ্গ শরীর ! শিশ্নোদর সর্বস্ব ! তোমার মহাভাব হবে।'

'মহাভাব !'

'মহাপ্রভুর হত। মহাভাব হলে শরীরের সব ছিদ্র, লোমকূপ পর্যন্ত মহাযোনি হয়ে যায়। এক একটি ছিদ্রে আত্মার সঙ্গে রমণসুখ। সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে।'

রামকৃষ্ণ ভৈরবীর কানে কানে বললেন, 'আমার হয়েছে।'

ভৈরবী বললেন, 'দেখছ ! শাস্ত্র মিলছে। ভগবানকে জানতে হলে ভগবতীর মত হতে হয়, ভগবতী যেমন শিবের জন্যে কঠোর তপস্যা করেছিলেন সেইরকম তপস্যা করতে হয়। পুরুষকে জানতে হলে প্রকৃতিভাব আশ্রয় করতে হয়।'

'সে তো আমি জানি !'

'জানবেই তো। তোমার ভেতর সব উদিত হবে। কখনও ভাববে, ভগবান তুমি পদ্ম আমি অলি। কখনও ভাববে, তুমি সচ্চিদানন্দ সাগর আমি মীন। আমি তোমার নর্তকী, নাচবে গাইবে। বলরাম কখন সখার ভাবে থাকতেন, কখনও বা মনে করতেন, আমি কৃষ্ণের ছাতা বা আসন হয়েছি।'

'এই পঞ্চবটীর মাটিতে পড়ে পড়ে মাকে ডাকতাম—মা ! আমায় দেখিয়ে দাও, কর্মীরা কর্ম করে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে—আমায় জানিয়ে দাও, আমায় দেখিয়ে দাও। চারপাশে লোকের ভিড় হয়ে যেত। কিন্তু আমি দেখতুম জীবজন্তু মানুষ যেন সব পটে আঁকা রয়েছে, মনে লজ্জা ভয় কিছুই হত না। কী অবস্থাই গেছে ! ঘুম যায়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ করুণ সুরে গাইতে লাগলেন :

'ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই,
যোগে যাগে জেগে আছি,
এখন যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা,
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি !'

ভৈরবী গানের সঙ্গে সঙ্গেই সংস্কৃতে আবৃত্তি করতে লাগলেন, 'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাংজাগর্তি সংযমী/যস্যাংজাগ্রতি ভূতানি মা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥

'রামকৃষ্ণ, সংসার ধোঁকার টাট। মায়া দর্পণটি চুরমার করে ফেলো জগৎ ছায়া অদৃশ্য। নেই কিছু নেই। জগৎ নিদ্রিতের স্বপ্ন মাত্র। আছেও আবার নেইও। অস্তিও বলা যায় না, নাস্তিও বলা যায় না।'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'কী রকম জানো, নিজের ছায়া দেখার মতো। যেই আলো জ্বালালে ছায়াও নেই কায়াও নেই। পোড়া একটা দড়ি, ছাইটা পড়ে আছে এঁকেবেঁকে সাপের মতো। দূর থেকে ভাবছ সাপ, যেই জোরে বাতাস দিল সাপের আকৃতি আর নেই ; কিন্তু কিছু একটা রইল। আমি দেখেছি, মা আমার বিন্দুবাসিনী !'

'এ তুমি কী বললে বাবা ! এ তো অতি মূঢ় তত্ত্ব।'

'আমি তো বসে বসে ভাবি, আর ভাবতে ভাবতে দেখি। দেখলুম কী, পৃথিবীময় কত বড় বড় জিনিস, পাহাড়, পর্বত, হাতি, আবার কত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিস, বালুকণা, বাতাসে ভাসছে রেণুর রেণু। অতি সূক্ষ্ম কণাতেও দেখছি শুধু মা নয়, মায়ের কোলে আমিও বসে আছি। সেই সূক্ষ্মে বসে তিনি আমাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করছেন। আর যেগুলো খারাপ হয়ে যাচ্ছে সেগুলোকে আবার নতুন ছাঁচে ফেলে গড়ছেন। মা আমার কেবল সিংহবাহিনী নন, তিনি আবার বিন্দুবাসিনীও হচ্ছেন।'

'তুমি তো তন্ত্রের কথা বললে বাবা। তন্ত্রে আছে ত্রিতত্ত্ব, শিব, শক্তি ও বিন্দু। শিব হলেন অধিষ্ঠাতা এবং শক্তিমান। শক্তি আর বিন্দু শিবে আশ্রিত। আগমে মানে তন্ত্রে বিন্দুকেই বলা হয় শক্তি। বিন্দু সৃষ্টির উপাদান স্বরূপ। বিন্দু থেকে সৃষ্টির বিকাশ। বিন্দুর অপর নাম, মহামায়া, কুণ্ডলিনী, চিদাকাশ। এই সৃষ্টির পঞ্চতত্ত্ব হল, শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর আর শুদ্ধবিদ্যা। সব তুমি দেখতে পাবে।'

রামকৃষ্ণ বালকের মতো প্রশ্ন বললেন, 'হ্যাঁ মা তন্ত্রের পথ নাকি খারাপ পথ, সাধকের পতন হয় ?'

'বাবা, সব ব্যাপারেই অধিকারী, অনধিকারী আছে। মহাদেব বলছেন, পার্বতি ! চতুঃষষ্টিশ্চ তন্ত্রাণি যামলাদিনি পার্বতি ! যামলাদি চৌষট্টিটি তন্ত্র বিষ্ণুক্রান্তা ভূমিতে ফলদায়ক, অর্থাৎ এই দেশে। কলিদোষে দীন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির পবিত্র ও অপবিত্র বিচার থাকবে না। তাহলে উপায় ! আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান যজেৎ সুধীঃ। কলিযুগে সাধক তন্ত্রোক্ত বিধান দ্বারা দেবগণের পূজা করবেন। বৈদিকমন্ত্র কলিতে বীর্যহীন। আগম বলছেন, নির্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব। বিষহীন সর্পের ন্যায় বীর্যহীন। বৈদিকমন্ত্রের শক্তি ছিল, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে। এখন মৃত। কী সুন্দর উপমা দেখ,

পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ।
অমূরশক্তাং কার্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ ॥

ভিতে চিত্রিত পুতুল যেমন। সব আছে তার, হাত, পা, মাথা, চোখ, নাক, কান, কিন্তু কাজ করার শক্তি নেই। কলিতে বৈদিক মন্ত্রও ওই ভিতের গায়ে পুতুলের মতো। অসমর্থ। অন্যমন্ত্রৈঃ কৃতং কর্ম বন্ধ্যাস্ত্রী সঙ্গমো যথা। বন্ধ্যা স্ত্রীর ফল হয় না, সেইরকম অন্যমন্ত্রে সাধন-ভজন করলে ফলসিদ্ধ হয় না, কেবল পরিশ্রমই সার। তন্ত্র পরিষ্কার বলছেন, কলিকালে অন্য শাস্ত্রের বিধানে যে সিদ্ধিলাভ করতে চাইছে, সে নির্বোধ। কী রকম নির্বোধ ! তৃষ্ণাতুর হয়ে গঙ্গার ধারে কূপ খনন করছে। তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্মতিঃ। বাবা ! তোমার কোনও ভয় নেই। তন্ত্রের শক্তি তোমাতে প্রমাণিত হবে। আমি আনন্দে নাচব।'

'আমি সিদ্ধাই চাই না।'

'যারা হীনবুদ্ধি তারা সিদ্ধাই চায়। ব্যারাম ভাল করা। মোকদ্দমা জেতানো ; জলে হেঁটে চলে যাওয়া, এইসব। যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া কিছুই চায় না।'

'ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ। আমার খুব শিক্ষে হয়েছিল হৃদয়ের কথায় নেচে। বললে, মামা ! মা তোমার কথা শোনেন, মার কাছে কিছু শক্তি চাও, কিছু সিদ্ধাই চাও। আমার বালকের স্বভাব, হৃদের আন্ডারে আছি। কালীঘরে জপ করবার সময় মাকে বললুম, 'মা হৃদে বলছে, কিছু শক্তি চাইতে, কিছু সিদ্ধাই চাইতে। মা অমনি দেখিয়ে দিলেন, সামনে এসে পেছন ফিরে উবু হয়ে বসল—একজন বুড়ো বেশ্যা, চল্লিশ বছর বয়েস—ধামা পোঁদ, কালো পেড়ে কাপড় পরা, পড় পড় করে হাগছে। মা দেখিয়ে দিলেন যে সিদ্ধাই এই বুড়ো বেশ্যার বিষ্ঠা !'

ভৈরবী বেদী থেকে উঠে দাঁড়ালেন। অন্ধকারেও তাঁর গাত্রবর্ণ ভাস্বর। শুদ্ধ একটা জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মন্দিরের কোনও দুষ্ট কর্মচারী ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিল। এই লোকটি ভাণ্ডার থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে বিক্রি করে। সেই পয়সায় আলমবাজারে একটি রক্ষিতা পোষে। লোকটি পালাল।

ভৈরবী বললেন, 'সিদ্ধাই নয় মোক্ষ জ্ঞান। কুলেশ পরমেশান করুণামৃতবারিধে/অসারে ঘোরসংসারে সর্বদুঃখমলীমসাঃ/মদ মাংস, স্ত্রীসম্ভোগ কুলমার্গ নয়। আচার কদাচার হয়ে যেতে পারে সাধকের ইন্দ্রিয়পরতায়। কৃপাণের ধারমুখের ওপর দিয়ে হাঁটা, বাঘের গলা জড়িয়ে ধরা, শরীরে সাপ জড়ান, এসবের চেয়েও কুলমার্গ কঠিন।'

রামকৃষ্ণ হঠাৎ 'শিব, শিব' বলে কেঁদে উঠলেন আকুল স্বরে।

ভৈরবী সরে এলেন অতি সন্নিকটে। যে লোকটি ঝোপের আড়ালে মশার কামড়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, সে যদি আরও কিছুক্ষণ থাকত !

হৃদয় মন্দিরের দিক থেকে আসছে। হাতে একটি লণ্ঠন। কাছে এসে বললে, 'মা ! রাতে কি আজ উপবাস !'

ভৈরবী বললেন, 'উপবাস কেন ? এই তো যাচ্ছি ! চলো, চলো।'

হৃদয় মামাকে জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি কি করবে ?'

'আমি এইখানে শুয়ে থাকব।'

'শুয়ে শুয়ে কী করবে ?'

'ফুলের গন্ধ শুঁকব ঢেউয়ের শব্দ শুনব। তোদের ওই ইটের খাঁচায় ঢুকে কী করব ?'

Scanned by CamScanner

'থাকো তাহলে একা বসে।'

নির্জন পঞ্চবটী। দূরগ্রামে আবার শেয়ালদের প্রহর জাগানো ডাক। বেলতলার ঝোপে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। মাথার ওপর মিশকালো আকাশ। তারাদের খই ফুটে আছে। বারে বারে শিব, শিব করতে করতে রামকৃষ্ণ একটা আবেশের মধ্যে চলে গেলেন। এরই মধ্যে মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারে একটা কলরব উঠল। কেউ এসেছে কারণবারি সেবা করে! সে চিৎকার করছে কাঁদছে। মাকে দর্শন করবে। মন্দিরের কর্মচারীরা ঢুকতে দেবে না। বাধা দিচ্ছে। মাতাল চিৎকার করছে, 'শালা! মা কি তোদের একার!' বলেই গান ধরেছে, 'সে যে তোমার আমার মা শুধু নয় জগতের মা সবাকার।'

পঞ্চবটীতে রামকৃষ্ণ একা নন, বেদির নীচে পা ছড়িয়ে বসে আছে কাপ্তেন।

একটা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে রামকৃষ্ণ যেন ভেসে চলেছেন।

পথিক চলেছেন বনপথ ধরে। ভরা ফাল্গুনের অরণ্যানী যেন সবুজের মেখলা পরে বসন্তের বাতাস ঘুরে ঘুরে নাচছে। পথিককে চিনতে পেরেছি। আমার পিতা ক্ষুদিরাম। কামারপুকুর থেকে চল্লিশমাইল দূরে মেদেনীপুরে চলেছেন বোনপোর খবরাখবর নিতে। বেলা দশটা পর্যন্ত একটানা পথচলার পর নির্জন একটি গ্রামে ঢুকে বিস্ময়ে হতবাক! কামারপুকুরের কোনও বেলগাছে একটিও পাতা নেই। সব ঝরে গেছে। কোনও কোনওটায় সবে পত্রোত্থান হচ্ছে। কিন্তু ওই গ্রামের সমস্ত বেলগাছ সবুজ ত্রিপত্রে ভরে আছে। আহা! এমন বেলপাতা! শিবের পুজো না করে থাকা যায়! মোক্তার রামচাঁদের খবর পরে নিলেই হবে।

গ্রামের হাট থেকে একটি নতুন ঝুড়ি আর গামছা কিনলেন। পুকুরের জলে ভাল করে ধুলেন। নবীন বিল্বপত্রে ঝুড়িটি ভর্তি করে ভিজে গামছা চাপা দিলেন। ঝুড়িটি মাথায় নিয়ে বেলা তিনটে নাগাদ ফিরে এলেন কামারপুকুরের বাড়িতে। সকলে অবাক। ক্ষুদিরাম তখন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছেন। কারও সঙ্গে কোনও কথা নয়। স্নান সেরে বসে পড়লেন পূজায়। বহুক্ষণ ধরে মহানন্দে মহাদেব ও মা শীতলার পূজা করে আহারে বসলেন।

স্ত্রী চন্দ্রাদেবী এইবার জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার হল বলো তো!

ক্ষুদিরাম বললেন, কী করব বলো! অনেকটাই চলে গিয়েছিলুম। দেখি কি, একটা গ্রাম, আর গ্রামভর্তি শুধু বেলপাতা!

চন্দ্রদেবী অবাক হয়ে বললেন, গ্রামভর্তি বেলপাতা মানে?

ক্ষুদিরাম হাসতে হাসতে বললেন, আহা বোঝো না কেন। সেই গ্রামটায় শুধু নবীনপত্রে ভরা বেলগাছ! অতীতের একটি দৃশ্য এসেই ফিরে চলে গেল।

ভৈরবী আর হৃদয় এসে দেখছেন, রামকৃষ্ণ অশ্বত্থমূলের বেদিতে গুটিয়ে এতটুকু হয়ে শুয়ে আছেন। ভৈরবী সন্তর্পণে একটি হাত ধরেই বুঝলেন, শরীরের সমস্ত গ্রন্থী শিথিল হয়ে গেছে। সমস্ত অঙ্গসন্ধি বিযুক্ত হয়ে ঢলঢল করছে।

হৃদয় ভয় পেয়ে বললে, 'কী হবে?'

ভৈরবী বললেন, 'কিচ্ছু হবে না।'

ঝোড়ো বাতাস। বিদ্যুতাভ পশ্চিম আকাশ। অলৌকিক আলো মাঝে মাঝে চমকে উঠছে। অনন্তের হাসির মতো।

॥ ছয় ॥

সারাদিন ভৈরবীকে দেখা গেল না। কোথাও নেই। হৃদয় বললে, 'ভোরবেলা দেখলুম, চানটান করে ঝোলাঝুলি নিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেল। আমার দিকে তাকালই না।'

'তুই একবার জিগ্যেসও করলি না!'

'তোমার ভৈরবী তুমি বোঝ, আমার অত মাতামাতি ভাল লাগে না। পাঁচজনে ছ্যা ছ্যা করছে। তোমার বয়েসটা তো ভাল নয়। তোমার শরীরের ওই গরমটা কেন হয় জান? ওসব মহাভাবটাব ন্যাকামি, আসল ভাব সেই এক!'

রামকৃষ্ণ মেঝে থেকে জুতোটা তুলে নিলেন।

'হৃদয় এটা দেখেছিস, ওই যে ঝ্যাঁটাটা পড়ে আছে দেখেছিস! তুই আজ থেকে আমার কাছে আসবি না।'

'জানি জানি। তোমার ভাবের লোক এসে গেছে! কত আদর! বাবা আমার বাছা আমার, সর খাও, নাড়ু খাও, এটা খাও, ওটা খাও।' রামকৃষ্ণ হুঙ্কার ছাড়লেন, 'হৃদয়! তুই আমার সামনে থেকে সরে যা। ওই মন্দিরের আর পাঁচটা কর্মচারী যেখানে থাকে সেইখানে চলে যা। তোর মুখে গ্রহণের ছায়া। আমি তোর ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি হৃদয়। এই মন্দির থেকে তোকে একদিন একবস্ত্রে চলে যেতে হবে। কাটা কাপড় বিক্রি করে সংসার চালাতে হবে।'

'তুমি আমাকে অভিশাপ দিচ্ছ। মামা হয়ে আমার সর্বনাশ কামনা করছ!'

'ওরে, আমি যা দেখছি তাই বলছি। তুই আমাকে কুপ্রস্তাব দিস অনবরত। সেদিন বললি, মায়ের কাছে সিদ্ধাই চাও। চাইতে গিয়ে বেইজ্জত। পরশু বললি, চলো মামা, আমিও রামকৃষ্ণ, তুমিও রামকৃষ্ণ। বললি না, ও রামকৃষ্ণ, ও রামকৃষ্ণ, ও রামকৃষ্ণ, আমরা তো মানুষ নই, আমরা এখানে কেন? চল দেশে দেশে যাই, অবোদ্ধার করি! তুমিও যা, আমিও তাই। তুই শালা টাকার জন্যে রামকৃষ্ণ ফেরি করবি! তুই কাটা কাপড় ফেরি করবি আলমবাজারে, বরানগর বাজারে।'

হৃদয় উত্তেজিত হয়ে বললে, 'আমি না থাকলে তোমার সাধুগিরি ঘুচে যাবে। এটাও জেনে রাখো। আমার মতো তোমার সেবা কে করবে! যখন হেগে মুতে পড়ে থাকবে কে আসবে!'

রামকৃষ্ণ গামছা কাঁধে হনহন করে পোস্তার দিকে চলেছেন। হৃদয়ও চলেছে পেছন পেছন। দৃকপাত নেই। পোস্তার ওপর উঠে দাঁড়ালেন। নীচেই ভরা গঙ্গা। শেষ রাতে জোয়ার এসেছিল। রামকৃষ্ণ হাতজোড় করে বললেন, 'মা, জানি, আত্মহত্যা অপরাধ, কিন্তু হৃদয়ের অত্যাচার আর আমি সহ্য করতে পারছি না মা, যাচ্ছেতাই গালিগালাজ। কেবল টাকা টাকা, সংসার, সংসার।'

হৃদয় ছুটে এসে পেছন থেকে মামাকে জড়িয়ে ধরল। দুজনেই জড়াজড়ি করে পড়ে যাচ্ছিলেন। ঠাকুরের পরমভক্ত রসিক ঝাড়ুদার দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। ঝাড়ু ফেলে ছুটে এল, 'কী হয়েছে বাবা!'

'হৃদয় মামাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে।

রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, 'ও আমাদের হয় রে! মান, অভিমান, আজ একটু বাড়াবাড়ি হল।' রসিক দূরে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে রামকৃষ্ণকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে হৃদয়কে জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে একটা এঁড়েবাছুর বেঁধে রেখেছেন কেন! ঘাস খাচ্ছে।'

হৃদয় একটু সামলে নিয়ে বললে, 'ওটাকে আমার দেশে পাঠাব। একজন ভক্ত আমাকে দান করেছে। বড় হয়ে লাঙল টানবে।' কথাটি শোনামাত্রই রামকৃষ্ণের অদ্ভুত একটা ভাবান্তর হল। তিনি সেইখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। দুজনেই অবাক। কি এমন হল! এঁড়ে বাছুর বড় হয়ে লাঙল টানবে। এতে ভগবানও নেই, ভক্তও নেই। আছে মাঠ, আকাশ, একটা লোহার ফাল!

দুজনে ধরাধরি করে পঞ্চবটীর বেদিতে রামকৃষ্ণকে এনে সাবধানে স্থাপন করল। পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পাতার ছায়ার নকশা তৈরি করেছে জমিতে। হৃদয় পায়ের কাছে, রসিক জমিতে। হৃদয় জানে, মামার বাহ্যজ্ঞান যখন লোপ পায় তখন মাথার দিকে দেবলোক নেমে আসে।

অনেক পরে রামকৃষ্ণ যখন স্বাভাবিক হলেন, রসিক সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল বাবা।'

রামকৃষ্ণ মৃদু হেসে বললেন, 'ওই যে হৃদয় বললে! কোথায় কামারপুকুর, সিওড়, কোথায় কলকাতা! এই বাছুরটি যাবে ওই পথ! সেখানে বড় হবে। তারপর কতদিন পরে লাঙল টানবে— এরই নাম সংসার, এরই নাম মায়া। এইটি ভাবা মাত্রই আমার মাথা ঘুরে গেল।'

রসিক আর একবার প্রণাম করে চলে গেল তার কাজে। দূরে ঝ্যাঁটার শব্দ। ধুলো উড়ছে।

হৃদয় জিজ্ঞেস করলে, 'তামুক খাবে?'

'না।'

'এখনও রেগে আছ? জানোই তো আমি ঘোর সংসারী। আশা আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। মাঝে মাঝে ভুলে যাই। মনে করি তোমার মতো হব। ভাবি, তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে সব দিতে পার। আমি যে তোমাকে ভালবাসি এটা তো বোঝ! সেদিন রাতে তোমাকে পঞ্চবটীর দিকে যেতে দেখে মনে হল তোমার ঝাড়ু আর গামছার প্রয়োজন হতে পারে। তাই তোমার পিছু নিলুম। তারপর আমার সেই অপূর্বদর্শন। দেখলুম, তুমি আর স্থূল রক্ত-মাংসের দেহধারী মানুষ নয়! তোমার শরীর থেকে অপূর্ব একটা জ্যোতি বেরোচ্ছে। পঞ্চবটী আলোয় আলো। তোমার পা দুটো আলোর পা। পা দুটো মাটিতে নেই। তোমার দেহটা শূন্যে ভেসে ভেসে চলেছে। ভাবলুম, চোখের ভুল বুঝি। চোখ দুটো রগড়ে নিলুম। তোমার শরীরের আলোয় গাছপালা, বাড়িঘর সবই ঠিকঠাক দেখছি, কেবল তুমিই হয়ে গেছ অন্যরকম। তখন নিজের দিকে তাকালুম, আমি কী পালটে গেছি! যেই নিজের দিকে তাকালুম, মনে হল, আমিও দিব্যদেহধারী জ্যোতির্ময় দেবানুচর সাক্ষাৎ দেবতার সঙ্গে থেকে চিরকাল তাঁর সেবা করছি। তাই আমি অমন করে উন্মাদের মতো চিৎকার

Scanned by CamScanner

করেছিলুম। কিন্তু তুমি কী করলে!'

'আমি কিছুই করিনি।'

'তুই আমার কাছে এসে আমার বুকে হাত রেখে বললে, দে মা, শালাকে জড় করে দে। মামা, তুমি কেন অমন করলে। কেন জড় হতে বললে! অমন দর্শনানন্দ আমার আর হবে না!'

'কেন হবে না! আমি কি তোকে একেবারে জড় হতে বলেছি! তখনকার মতো তোকে স্থির হতে বলেছিলুম। সামান্য দর্শনে তুই যা গোল করলি, তাইতেই তো আমাকে ওইরকম বলতে হল। চারদিক থেকে কী হয়েছে, কী হয়েছে করে লোক ছুটে এলে ভাল হত! এসব একান্ত জিনিস, গুহ্য জিনিস। আমি যে চব্বিশ ঘণ্টা কত কী দেখি, আমি কি অমন গোল করি! তোর এখনও ওইরকম দর্শন করার সময় হয়নি, এখন স্থির হয়ে থাক, সময় হলে আবার কত কী দেখবি।'

মামার কথায় হৃদয় বেশ ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠে চলে গেল। তার ভেতরে বেশ একটা অহঙ্কারের ভাব এসেছে। এই দেবালয়ের বেশ একটা কেউকেটা বলে ভাবতে শিখেছে। কালীঘরে পুজোয় বসে রামকৃষ্ণের ভাবের অনুকরণ করে। মথুরবাবু একদিন দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এর আবার কি হল, ঢং নাকি!'

ভৈরবী নেই। কোথায় গেছে, বলেও যায়নি। ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

মন্দিরের প্রবেশ করে হঠাৎ সেই শব্দটা উঠল, 'হা রে রে রে, নিরালাম্ব লম্বোদরজননী কং যামি শরণম্।'

রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে নিজের মনেই বললেন, এসেছে, গৌরী পণ্ডিত এসেছে রে বাপ। যেমন গলা, তেমনি সাধনা! তেমনি সিদ্ধাই! তান্ত্রিক সাধক। নামই হয়ে গেছে, ইদেশের গৌরী পণ্ডিত। দেখেছ, তন্ত্রের গন্ধ পেয়ে ঠিক এসে গেছে। বড় সাধক। রোজ হোম করে। হোমকুণ্ডে হোম নয়। নিজের বাঁ হাত সামনে প্রসারিত করে তার ওপর এক মণ কাঠ সাজায়। সেই কাঠে অগ্নি প্রদান করে ডান হাতে আহুতি প্রদান। এক হাতে ওই ওজন ও উত্তাপ, অন্য হাতে আহুতি দান। বিশ্বাস করবে না কেউ, রামকৃষ্ণ নিজে দেখেছেন। না দেখলে তাঁরও বিশ্বাস হত না। এটা গৌরীর একটা সিদ্ধাই। আর একটা সিদ্ধাই এই হা রে রে রে। এই শ্লোক তাঁর নিজের রচনা। কোনও বাড়ি, মন্দির, বিশেষত কোনও তর্কসভায় প্রবেশের মুহূর্তে জলদমন্দ্রর স্বরে এই মন্ত্রোচ্চারণে প্রতিপক্ষ এককালে অবশ হয়ে যায়। গৌরী পণ্ডিত কুস্তিগীরের মতো তাল ঠুকে প্রবেশ করেন, তখন তিনি অপরাজেয়।

রামকৃষ্ণ দুষ্টুমির হাসি হেসে নিজেকেই বললেন, হয়ে যাক আজ লড়াই।

রামকৃষ্ণ চাঁদনির দিক দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। এদিকে গৌরী পণ্ডিত, ওদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ।

গৌরী যত জোরে হা, রে, রে, রে করেন, রামকৃষ্ণ তার চেয়েও জোরে। দুজনেরই গলা ধাপে ধাপে চড়ছে। হই হই রই রই কাণ্ড। কর্মচারীরা ডাকাত পড়েছে ভেবে দৌড়ে এসেছে লাঠিসোঁটা নিয়ে। এদিক থেকে হা রে রে রে, নিরালম্ব লম্বোদর জননী। ওদিক থেকেও হা রে রে রে নিরালম্ব লম্বোদরজননী। যেন মেঘে মেঘে বাজের লড়াই। লাঠিধারী কর্মচারীদের দেহ অবশ হয়ে আসছে। মন্দিরচূড়া থেকে পায়রা সব ফট ফট করে উড়ে গেছে। ধ্যানমগ্ন ভৈরবমূর্তিরও যেন ধ্যানভঙ্গ হয়েছে।

অবশেষে গৌরী আর পারলেন না। শান্ত হলেন। বেশ একটু ক্ষুণ্ণ মনেই কালীবাড়িতে প্রবেশ করলেন। রামকৃষ্ণ তাঁর হাত দুটি ধরে ভাবমুখে বললেন, 'গৌরী, মা আমাকে বললেন, তুই ওর সিদ্ধাইটা তোর ভেতর টেনে নে। সিদ্ধাই সাধকের অমঙ্গল করে। ওই সিদ্ধাইটুকু না থাকলে গৌরী সাধনপথে আরও অনেক দূর এগোবে। সিদ্ধাই যে ইষ্টের পথে বাধাস্বরূপ গৌরী!'

গৌরী পণ্ডিত রামকৃষ্ণের হাত দুটি ধরে রইলেন অনেকক্ষণ। চোখে বিমুগ্ধ দৃষ্টি। সাধকের হৃদয়ে হৃদয়ে কথা।

গৌরী পণ্ডিত বললেন, 'তা হলে এইবার আমি মাতৃদর্শনে যাই, অনুমতি করুন।'

রামকৃষ্ণের এখন যেন গুরুভাব। শান্তগলায় বললেন, 'যাও, মায়ের কাছে আর কিছু নয় শুদ্ধভক্তি চাও। তুমি কত বড় সাধক গৌরী। তুমি তো তন্ত্রসাধনার একটা দৃষ্টান্ত। দুর্গাপূজার তিন দিন তুমি জীবন্ত দেবীর পূজা করো। নিজের গৃহিণীকে বসনালঙ্কারে ভূষিত করে আলপনা দেওয়া পীঠে বসিয়ে জগদম্বা জ্ঞানে পূজা, এ কি কম কথা। তুমি তো চণ্ডী শুধু পড়নি, তুমি চণ্ডী করেছ। আমি বলি, গ্রন্থ নয় গ্রন্থী। শাস্ত্র পাঠ নয় শাস্ত্র দিয়ে নিজেকে বন্ধন।'

গৌরী পণ্ডিত উচ্চ স্তরের সাধক। রামকৃষ্ণের প্রতিটি বাক্যে তাঁর একটা উদ্দীপনা হচ্ছে। তিনি বললেন, 'ওই শ্লোকটি আমি দর্শন করেছি ঠাকুর। বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি। ভেদাঃ/ স্ত্রীয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জমৎসু॥'

'ওইটিই সার কথা। পশুবুদ্ধিতে স্ত্রী-শরীরের অবমাননা, আর শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে ভুলেই আমাদের যত দুর্দশা! এসো গৌরী আমরা দু হাত তুলে নাচি।'

'এইখানে নাচব?'

'কেন লজ্জা! ওরে লজ্জা-ঘৃণা-ভয় তিন থাকতে নয়।'

দুজনেরই কথা বন্ধ হয়ে গেল। কালীঘর কাঁপছে, নাটমন্দির কাঁপছে। দেখা যাচ্ছে না। মা জগদম্বার সামনে কেউ একজন মন্ত্রপাঠ করছেন, ক্রৌং ক্রৌং খট্টাঙ্গ ধারিণাম। গোটা মন্দির কাঁপছে। কেউ সাহস করে কাছে যাচ্ছে না। সবাই দেখেছে একটু আগেই গঙ্গায় ডুব দিচ্ছিল। তারপর মন্দিরের দিকে গেল। টসটস করে জল ঝরছে। এক পায়ে ছেঁড়া জুতা, হাতে কঞ্চি, আর এক হাতে একটা ভাঁড়, তাইতে একটা আঁবচারা!

রামকৃষ্ণের খুব ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে, বড় মনের মানুষ। লোকটিকে অনুসরণ করছেন। এই অবস্থা তাঁর নিজেরও তো হয়েছিল। পঞ্চবটীতে বাঁশ ঘাড়ে করে ঘুরছি, মানুষ চিনতে পারছি না। নারায়ণ শাস্ত্রী বললে, ওই উন্মত্ত হ্যায়। লোকটি অতিথিশালার দিকে গেল। দূর, দূর করে সব তাড়িয়ে দিলে। খেতে দিলে না। ভ্রূক্ষেপ নেই। যেন রিক্তরাজা!

হলধারী ছুটে এসেছেন খবর পেয়ে। ব্রহ্মবিদ তিনি। সদা ব্রহ্মজ্ঞানীর অনুসন্ধান!

লোকটি চলে গেছে এঁটো পাতা ফেলার জায়গায়। কয়েকটা গোদা গোদা কুকুর পাতা টানাটানি করছে। লোকটি তাদের মধ্যে ঢুকে গেল। কুকুরগুলো বন্ধুর মতো সরে গিয়ে জায়গা করে দিল। কোনও বিদ্বেষ নেই। পাগল পাতা কুড়িয়ে খাচ্ছে। যেন রাজার ভোজসভায় নিমন্ত্রিত আর এক রাজা।

হৃদয় ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে? তুমি কি পূর্ণজ্ঞানী।'

'চুপ!'

হৃদয় ভয়ে চমকে উঠেছেন।

সে ফিসফিস করে বললে, 'আমি পূর্ণজ্ঞানী।'

'হৃদয় সসম্ভ্রমে আরও কাছে সরে গেল। যে জ্ঞানে জ্ঞানের পূর্ণতা আসে জানতে চায়।

সাধক বললেন, 'তোকে আর কে বলবে! তবু বলে যাই, এই ডোবার জল আর গঙ্গাজলে যখন কোনও ভেদবুদ্ধি থাকবে না, তখন জানবি পূর্ণজ্ঞান হয়েছে।'

রামকৃষ্ণ কেমন আনমনা হয়ে নিজের ঘরে চলে এলেন। একটা ভয়। এই রকম হয়! হৃদয় উত্তেজিত হয়ে ঘরে এসে ঢুকল, 'মামা! জানো ওই পাগলটা কে, রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজের একজন।'

একটু আগের সমস্ত কলহ ভুলে রামকৃষ্ণ হৃদয়ের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন, 'ওরে হৃদে, আমারও কি ওই দশা হবে?'

হৃদয় বললে, "মামা, তোমার কি হতে বাকি আছে? কালীবাড়িতে কাঙালিরা খেয়ে গেল, তুমি এঁটো পাতা নিজের মাথায় চাপালে, তারপর চেটে চেটে খেলে। হলধারীমামা যখন তোমাকে ধমক লাগালেন, তুই করছিস কী? কাঙালিদের এঁটো খেলি, তোর ছেলেপিলের বিয়ে হবে কেমন করে? তুমি কী বললে?'

রামকৃষ্ণ আবার উত্তেজিত হলেন, 'শোন হৃদে, হলধারী আমার দাদা হয়। তা হলে কি হয়? বললুম, তবে রে শ্যালা, তুমি না গীতা, বেদান্ত পড়ো? তুমি না শেখাও ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা? আমার আবার ছেলেপুলে হবে তুমি ঠাউরেছ! তোর গীতাপাঠের মুখে আগুন।'

'তুমি রসিক মেথরের বউ তোমাকে শাক বেঁধে পাঠায়, তুমি খাও, এ কাজটা খুব ভাল?'

'ওটা তোর বোঝার ক্ষমতা নেই রে। সর্বভূতে সেই হরিই আছেন। মনে আছে সেই পাগল। সে-ও জ্ঞানোন্মাদ। কোথা থেকে ভিক্ষে করে কী সব এনেছে, তারপর মস্ত একটা কালো কুকুরের পিঠে চেপে বসে নিজেও খাচ্ছে, কুকুরটাকেও খাওয়াচ্ছে। ভিড় জমে গেল। সবাই হ্যা হ্যা করে হাসছে। এই পাগলা, এই পাগলা করছে। সে তখন জিজ্ঞেস করলে, তোমাদের হাসির কারণ? বলেই, সংস্কৃতে একটা শ্লোক বললে, শুনে সবাই চুপ। কী বলেছিল জানিস,

বিষ্ণুপরি স্থিতো বিষ্ণুঃ
বিষ্ণুঃ খাদতি বিষ্ণবে।
কথং হসসি রে বিষেতা
সর্বংবিষ্ণুময়ং জগৎ।

শুনে রাখ হৃদে, বাজনার বোল সবাই মুখে বলতে পারে, হাতে আনা বড় শক্ত।'

Scanned by CamScanner

হৃদয় চলে যাওয়ার পরই হলধারী এলেন। পূজার আসন থেকে উঠে এসেছেন, কপালে এত বড় একটা টিপ। ঘরে ঢুকে বেশ উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'বুঝলি, মা আজ দেখিয়ে দিলেন, খাঁটি ব্রহ্মজ্ঞানী। সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলিস, ক্ষর অক্ষর। ক্ষর হল জীব, অক্ষর হল ব্রহ্ম। যা দেখলি আজ, এই হল অক্ষর।'

'তুমি কত রকমের কথা বল দাদা! সেদিন বললুম, চল, ঘাটে এক সাধু এসেছে দেখে আসি! তুমি নাক সিঁটকে বললে, কি আর দেখতে যাব—পঞ্চভূতের খোল! আর আজ একেবারে পেছন পেছন গেট পেরিয়ে রাস্তা পর্যন্ত চলে গেলে!'

'তুই একটা গণ্ডমূর্খ। তোর সঙ্গে কথা বলতে গেলে মেজাজ বিগড়ে যায়। তোকে কত আর বলব, ঈশ্বর ভাবাভাবের অতীত। ভাবাবেগে তুই যা দেখিস, রূপটুপ, সব ভুল। তুই ভুলপথে এগিয়ে ভাবছিস ঠিক পথে যাচ্ছি। জীবনটা নষ্ট করলি! বাবা! বিনা গুরুতে সাধন হয়!'

হলধারী গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। কুঠিবাড়ির বাইরে এসে বড় করে এক টিপ নস্যি নিলেন। নিজের মনেই বললেন, 'সাধন-ভজন কি অতই সহজ! পাথরের মা বলে দিয়েছেন, আমাকে সব দেখিয়ে দিয়েছেন। উন্মাদ, উন্মাদ!'

রামকৃষ্ণ একা চুপ করে বসে আছেন, চোখে জল, 'মা নিরক্ষর মুখ্খু বলে আমাকে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয়।' মায়ের ওপর অভিমানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। হঠাৎ একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল,

সহসা মেঝে হতে কুয়াশার মতো ধোঁয়া উঠে সামনের কতকটা জায়গা পূর্ণ হয়ে গেল। রামকৃষ্ণ অবাক হয়ে দেখছেন, সেই ধোঁয়ার মধ্যে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল আবক্ষলম্বিতশ্মশ্রু একখানি অনন্ত সৌম্যমুখ। মুখখানি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রামকৃষ্ণের দিকে। হঠাৎ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ওরে, তুই ভাবমুখে থাক, ভাবমুখে থাক, ভাবমুখে থাক'। তিনবার ওই একই কথা বলে মুখটি ধীরে ধীরে ওই কুয়াশায় গলে গেল। কুয়াশাও আর রইল না। ঘর পরিষ্কার।

রামকৃষ্ণ ছুটে বাইরে এলেন। কোথায় হলধারী! শালা! তুমি আমাকে বেদান্ত দেখাতে এসেছিলে!

মন্দিরে সন্ধ্যারতি শুরু হবে। মন্দিরে মন্দিরে বিক্ষিপ্ত ঘণ্টাধ্বনি। পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের রং মিলিয়ে গেছে। এমন সময় ভৈরবী এলেন। পদযুগল ক্লান্ত, ধূলিধূসর। চুল এলোমেলো। মুখটি মা দুর্গার মতো, ঘামতেলে চক চক করছে। সঙ্গে গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার, বেঁটে মতো একটি লোক। হাতে লাল কাপড় বাঁধা বড়সড় একটা পুঁটলি।

রামকৃষ্ণ একটু অভিমানের গলায় বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলে না বলে সারাটা দিন!'

'তোমার জন্যেই, তোমার সাধনার জিনিস জোগাড় করতে।'

রামকৃষ্ণ শিশুর উৎসাহে বললেন, 'পেয়েছ? সব পেয়েছ?'

'নিশ্চয় পেয়েছি, না পাওয়া পর্যন্ত ছাড়ব আমি!'

'কই দেখি।'

'এখন না, মাঝরাতে পঞ্চবটীতে। আগে আমি চান করি।'

সঙ্গের সাথীটিকে নিয়ে ভৈরবী পঞ্চবটীর অন্ধকারে অদৃশ্য হলেন। রানি রাসমণি একদিন একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ল। রানি তখন কুঠিতে বসবাস করছেন। বাগান তৈরি হচ্ছে। স্বপ্নে এলেন গাজিপীর। রানি শুনছেন, 'দেখুন মা আমি গাজিপীর, কেউ কেউ আমাকে গাজিসাহেবও বলেন। এই পুকুর আমার। এই পুকুরের নাম গাজিপুকুর। এই পুকুরের ঈশানকোণে যে অশ্বত্থ-বট গাছ দেখছেন, ওই গাছের তলায় আমার আস্তানা। ওই জায়গাটা আপনি বাঁধিয়ে দিন। সন্ধ্যাবাতি দেবার ব্যবস্থা করুন, সিরনি দেবেন। আপনি লক্ষ্মীরূপিণী শক্তি, দেবী মা। আমি মুসলমানের গাজিপীর, আবার হিন্দুরও গাজিপীর, আমার কাছে জাত নেই, হিন্দু-মুসলমান নেই, সবাই সমান। আমার আশীর্বাদে আপনার দেবদর্শন হবে। আর একটা কথা বলি মা, গঙ্গায় আমার একটা কুমির আছে, নিশিভোর রাতে আমার পুকুরে আসে, আর দুটো বাঘও আছে, তারাও ওই সময়ে আসে, আপনারা দেখে ভয় পাবেন না।'

ভৈরবী গঙ্গায় স্নান করবেন এই অন্ধকারে। রামকৃষ্ণের মনে এল গাজিপীরের সেই কুমির। যদি ঠিক এই সময়টায় ঘাটের শেষ ধাপে শুয়ে থাকে!

সেদিন মধ্যরাতে পঞ্চবটীতে একটি লণ্ঠনের আলো এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক আলেয়ার আলো মতো ভেসে বেড়াতে দেখে কুঠিবাড়ির বারান্দায় শুয়ে থাকা কর্মচারীদের মধ্যে একজন হাই তুলতে তুলতে বললে, 'বুঝলে, এইবার গুপ্তধনের সন্ধান হচ্ছে। মা কালী মাটির তলায়।'

আর একজন মশা মারতে মারতে বললে, 'কিছুই জানিস না, ভৈরবী নিয়ে পঞ্চমকারের সাধনা হবে। মদ, মাংস, মহিলা। কামারপুকুরের গদাই হল রামকৃষ্ণ, এইবার হবে তান্ত্রিক।'

'তাতে তোর কী?'

'না, ভাবছি, তান্ত্রিকদের খুব সিদ্ধাই হয়, মারণ, উচাটন, বশীকরণ। সঙ্গে সঙ্গে ভূত ঘোরে হুকুম তামিল করার জন্যে। ডাকলেই ব্রহ্মদত্যি ছুটে আসে কানে পইতে দিয়ে।'

'বক বক না করে ঘুমো। ভোরবেলা উঠেই খুন্তি নাড়তে হবে।'

অসম্ভব গুমোট আজ। একটুও বাতাস নেই। চারপাশ নিস্তব্ধ, নিথর। নির্মেঘ আকাশ। গাছের ডালে পাখিদের পাশ ফেরার শব্দ। বেলতলায় মাটি কাটার ঝুপঝাপ শব্দ। ভৈরবীর এখন অন্য মূর্তি। কোমরে আঁচল জড়িয়ে অষ্টাবক্র সেই লোকটিকে নানা নির্দেশ দিচ্ছেন। লোকটির হাতে একটি হাতকোদাল। অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। লণ্ঠনের আলোয় তাঁর মুখের একপাশ আলোকিত।

ব্রাহ্মণী ভৈরবী বললেন, 'এইবার বের করো।'

লোকটি কোদাল রেখে ঝুলি থেকে একটি একটি করে তিনটি নরমুণ্ড বের করল। রামকৃষ্ণ অবাক হয়ে দেখছেন। নরকরোটির সৌন্দর্য। পাশাপাশি মাটিতে পড়ে আছে মৃত্যুর শেষ হাসি। চক্ষুহীন গভীর দুই গর্ত। উন্মোচিত দন্তপংক্তি। আলো পড়েছে মাথার চাতালে। সেখানে বিধাতার মসৃণ পালিশ। এই তিনটি মুণ্ডের মালিক অপঘাতে মারা গেছে। ত্রিমুণ্ডীর আসনে সাধক রামকৃষ্ণ বসবেন সাধনায়। আগামী মঙ্গলবার। সেদিন আবার অমাবস্যা।

বিল্বমূলে ভৈরবী নিজে ত্রিভুজাকারে তিনটি নরমুণ্ড স্থাপন করে মাটি চাপা দিতে দিতে বললেন: ভৌমবারে তমিস্রায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাং। মঙ্গলবার আবার অমাবস্যা, গভীর নিশীথে এই কূর্মাকৃতি আসনে তুমি বসবে। দেখবে তাঁর রূপ, কোটি সূর্য্যপ্রতীকাশং সমস্ত ভুবনোজ্জ্বলম। তোমার জন্যে গঙ্গাহীন প্রদেশ থেকে এই সব আমি আগেই সংগ্রহ করে রেখেছিলুম, আজ নিয়ে এলুম সেইখান থেকে। বাবা, কেমন লাগছে তোমার?'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে।'

'তুমি তো আনন্দস্বরূপ। তুমি সন্তরণে সাধনসমুদ্র পেরিয়েছ, এইবার অর্ণবপোতে সেই সাগরই আর একবার উত্তীর্ণ হবে। যোগিনীতন্ত্রে শিব কী বলছেন শোনো,

ইদানীং মৃণু দেবেশি মুণ্ডসাধনমুণ্ডসম্।
যৎ কৃত্বা সাধকো যাতে মহাদেব্যাঃ পরং পদম্॥
নর-মহিষ-মার্জার-মুণ্ডত্রয়ং বরাননে।
অথবা পরমেশানি মৃমুণ্ডত্রয়মাদরাৎ॥

তিনটি নরমুণ্ড হল শ্রেষ্ঠ। এই বেলতলায় হল ত্রিমুণ্ডাসন। আর পঞ্চবটীতে হবে পঞ্চমুণ্ডাসন।'

'আজই হবে তো?'

'আজই হবে। আজ খুব শুভ দিন। বাবা, তোমার জন্যে সবই এনেছি, শিবাসর্পসারমেয় বৃষভাণাং, তার মধ্যে একটি নরমুণ্ড, নরমুণ্ডং তথা মধ্যে পঞ্চমুণ্ডানি থীরিতম্।'

বেলতলার আসন সম্পূর্ণ। ঘর্মাক্ত মানুষটি এইবার পঞ্চবটীতে। ব্রাহ্মণী নিজের আঁচলে মুখ মুছলেন। মধ্য রাতে বাতাস হঠাৎ ঘুরে যায়। এতক্ষণ বইছিল উত্তর-দক্ষিণ। ভৈরবী ব্রাহ্মণী সামনে ঝুঁকে পড়ে আসন তৈরিতে মনোযোগী হলেন। পাঁচটি মুণ্ডকে যথাস্থানে স্থাপন করলেন। বিক্রমাদিত্যের বেতালের মতো সেই লোকটি ভীষণ তৎপর। ঝুপঝাপ মাটি ফেলার শব্দ। শেষ রাতে বান এল গঙ্গায়। স্রোতের কুলুকুলু শব্দ।

এইবার সেই বাঁশিটা বাজল। চটকলের বাঁশি। প্রতিদিন রাত তিনটের সময় আধঘণ্টা ধরে বাজে। রাসমন্দির থেকে ফিরে চল গোপীরা। রজনী প্রভাত হল। একটু পরেই ভোরের প্রথম পাখিটি ডাকবে। তার আগে পেঁচারা দিনের আতঙ্কে তারস্বরে ডাকছে। খঞ্জনীর মিঠে বোল। বৈষ্ণবের প্রভাতফেরি। সেই চিরপ্রাচীন গান, রাই জাগো, রাই জাগো বলে ডাকে শুকশারি। গোলাপি বর্ণের পাতলা ওড়নায় উদ্যানটি যেন ঢাকা পড়ল।

লণ্ঠনটিকে নবারুণে সমর্পণ করে, ভৈরবী রামকৃষ্ণকে খুঁজছেন। কোথায় গেল পাগল ছেলে! এই তো এখানে ছিল! পঞ্চবটীর পাশেই সাধনকুটীর। সেই কুটীরের দাওয়ায় গাদধর শুয়ে আছেন লম্বা হয়ে। ভোরের অরুণবর্ণ আলো মুখখানিতে এসেছে পড়েছে। দুচোখের কোল বেয়ে নেমেছে অশ্রুধারা। কিছু একটা দেখেছেন। ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত একটা হাসি। ভৈরবী ভাবছেন, কী বিপরীত সমাবেশ! একদিকে অশ্রুধারা, অন্যদিকে হাসি। ভৈরবী দূর থেকে দেখছিলেন। এই তো সেই শ্রীগৌরাঙ্গ। সেই মুখ, সেই রোদনাশ্রু, সেই দেহকান্তি। ভৈরবী আরও কাছে গিয়ে মাথার শিয়রে বসলেন। যত্নে মাথাটি তুলে নিলেন কোলে!

Scanned by CamScanner

আঁচল দিয়ে মুছে দিলেন চোখের দুটি পাশ।

রামকৃষ্ণের যোগনিদ্রা ভাঙল না। তিনি হঠাৎ অস্ফুটে বলে উঠলেন, 'মা, আর খাব না, মা আর খাব না। খুব খেয়েছি, খুব খেয়েছি।'

নহবতে সানাইয়ের পোঁ শোনা গেল। মন্দিরে মঙ্গলারতি। আলমবাজারের মসজিদে আজান। আলোয় ফুটে উঠেছে দক্ষিণেশ্বর কালাক্ষেত্র। মন্দির চূড়ার ধ্বজায় প্রভাত আলোর অভ্র।

গদাধর ওঠো, গা তোলো। ভৈরবী তান্ত্রিক, কিন্তু হরি রসে চুবে আছেন। তিনি গাইতে লাগলেন, 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হবে।'

রামকৃষ্ণ উঠে বসেই গাইতে লাগলেন, 'রাম রাঘব রাম রাঘব, রাম রাঘব পাহিনাং। কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব রক্ষমাং।'

॥ সাত॥

'কী ব্যাপার! হঠাৎ এত সাজগোজ করে চললে কোথায়?' ভৈরবী প্রশ্ন করলেন।

সুপরি এখনও একটু আধটু খান। সঙ্গে এক দানা কাবাব চিনি। মজার জিনিস, যেন মরিচের দানা, মাথায় ছোট্ট একটা টিকি। গলা ঠিক রাখার জন্যে বড় বড় ওস্তাদরা মুখে রাখেন। বেশ শুদ্ধ একটা ভাব হয়। রামকৃষ্ণ দুটোই মুখে পুরেছেন। চিবোতে চিবোতে বললেন, 'আমার ফ্রেন্ডোর কাছে।'

'তোমার বন্ধু?'

'আমার কত বন্ধু। আজ আমার প্রাণের বন্ধু কৃষ্ণকিশোরের কাছে যাব। খবর পেয়েছি, তার খুব অসুখ করেছিল।'

'তোমার বন্ধু যখন, অবশ্যই ভেতরে মাল আছে।'

'খুব আছে। আমার যখন ঘোর উন্মাদ অবস্থা। দেশে রটে গেল, তোমাদের গদাই পাগলা হয়ে গেছে। দক্ষিণেশ্বরে দেখে এলুম, উলঙ্গ অবস্থায় কাঁধে বাঁশ নিয়ে পঞ্চবটীতে ঘুরছে। তখন আমার কেবল ঈশ্বরের কথা শোনার জন্যে ব্যাকুলতা হত। কোথায় ভাগবত, কোথায় অধ্যাত্ম, কোথায় মহাভারত খুঁজে বেড়াতাম। এঁড়েদার কৃষ্ণকিশোরের কাছে অধ্যাত্ম শুনতে যেতাম। কৃষ্ণকিশোরের কী বিশ্বাস! বৃন্দাবনে গিছিল, সেখানে একদিন জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। কুয়ার কাছে গিয়ে দেখে, একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে, আমি নীচ জাতি, আপনি ব্রাহ্মণ, কেমন করে আপনার জল তুলে দেব? কৃষ্ণকিশোর বললে, তুই বল শিব। শিব শিব বললেই তুই শুদ্ধ হয়ে যাবি। সে শিব শিব বলে তুলে দিলে। অমন আচারী ব্রাহ্মণ সেই জল খেলে! কী বিশ্বাস!'

'জ্ঞানী এবং ভক্ত!'

'ঠিক বলেছ, এঁড়েদার ঘাটে একজন সাধু এসেছিল। আমরা একদিন দেখতে যাব ভাবলুম। আমি কালীবাড়িতে হলধারীকে বললাম, কৃষ্ণকিশোর আর আমি সাধু দেখতে যাব। তুমি যাবে? হলধারী বললে, একটা মাটির খাঁচা দেখতে গিয়ে কী হবে? হলধারী গীতা-বেদান্ত পড়ে কি না! তাই সাধুকে বললে, মাটির খাঁচা। কৃষ্ণকিশোরকে গিয়ে আমি ওই-কথা বললাম। সে মহা রেগে গেল। আর বললে, 'কী! হলধারী এমন কথা বলেছে? যে ঈশ্বর চিন্তা করে, যে রাম চিন্তা করে, আর সেইজন্য সর্বত্যাগ করেছে, তার দেহ মাটির খাঁচা! সে জানে না যে, ভক্তের দেহ চিন্ময়। এত রাগ—কালীবাড়িতে ফুল তুলতে আসত, হলধারীর সঙ্গে দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নিত! কথা কইবে না!'

'তুমি একা যাবে?'

'ওর কাছে আমি একাই যাই। আমাদের কত কথা, কত গান! আমায় বলেছিল, পৈতেটা ফেললে কেন? উন্মাদ অবস্থা আমার। তখন আশ্বিনের ঝড়ের মতো একটা কী এসে কোথায় কী উড়িয়ে লয়ে গেল। আগেকার চিহ্ন কিছুই রইল না। হুঁশ নাই! কাপড় পড়ে যাচ্ছে, তা পৈতে থাকবে কেমন করে! আমি বললাম, তোমার একবার উন্মাদ হয়, তা হলে তুমি বোঝ। শুনছি, তাই হয়েছে। একটা ঘরে চুপ করে বসে আছে, আর ওঁ ওঁ বলছে।'

কৃষ্ণকিশোর গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন ঘরে তাঁর ছোট্ট তক্তাপোশে। অনাবৃত উদার বক্ষদেশে আড়াআড়ি মোটা একটি পৈতে। রামকৃষ্ণ সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, 'কী, কেমন আছ এখন?'

কৃষ্ণকিশোর অভিমানভরা গলায় বললেন, 'যাও, তোমার সঙ্গে আমি কথা, কথাটথা আর বলব না।'

'কেন গো, কী করেছি আমি!'

'জানো না তুমি, আমার মাথায় বায়ু চড়ে গিয়েছিল। ইড়া, পিঙ্গলা ছেড়ে সুষুম্না পথে সোজা সহস্রারে।!'

'তা লাগল কেমন?'

'সে বেশ মজা। যেখানেই বসছি, ভেতর থেকে আপনা আপনি ওঁকার শব্দ বেরোচ্ছে। বাইরে বেরোবার উপায় নেই। তখন এই ঘরে নিজেকে বন্দি করে রাখলুম। তা, পরিবার পরিজন কেন ছাড়বে। বললে, উন্মাদলক্ষণ। নাটাগড় থেকে নিয়ে এল রাম কবিরাজকে। নাড়ি ধরে বললে, বায়ু কুপিত। জটামাংসী আর ঊর্ধ্বনারায়ণ তৈল বিধান। আমি কোবরেজকে বললুম; ওগো, আমার রোগ আরাম করো, কিন্তু দেখো, যেন আমার ওঁকারটি আরাম কোরো না।'

রামকৃষ্ণ পরমানন্দে বললেন, 'বাঃ, বাঃ, বেশ বলেছ।'

কৃষ্ণকিশোর একটু বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'কী চিবচ্ছো তখন থেকে চ্যাকোর চ্যাকোর করে।'

'সুপুরি।'

'পানও তো খাও! তুমি পান খাও কেন?'

রামকৃষ্ণ বিদ্রোহী হয়ে বললেন, 'খুশি পান খাব, আরশিতে মুখ দেখব, হাজার মেয়ের ভেতর ন্যাংটো হয়ে নাচব।'

কৃষ্ণকিশোরের স্ত্রী তাড়াতাড়ি ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'তুমি কারে কী বলো? রামকৃষ্ণকে কী বলছ?'

কৃষ্ণকিশোর সংযত হয়ে রামকৃষ্ণকে বললেন, 'বোসো, বুঝেছি। তোমার সব ব্যাপারটাই আলাদা। কে তোমারে জানতে পারে! তোমার মা কালীর মতো, ষড় দর্শনে না পায় দর্শন।'

কৃষ্ণকিশোরের পরিবার বললেন, 'ষড়দর্শন তো হচ্ছে, কাল কী হবে ভেবেছ?'

কৃষ্ণকিশোর অবাক হয়ে বললেন, 'কীসের কী হবে?'

'টেক্সো, টেক্সো! টেক্সওয়ালা এসেছিল। বলে গেছে, টাকা না দিলে ঘটিবাটি বেচে আদায় করবে।'

কৃষ্ণকিশোর অসহায়ের মতো রামকৃষ্ণের দিকে তাকালেন।

রামকৃষ্ণ বললেন হাসতে হাসতে, 'কী হবে ভেবে? না হয় ঘটিবাটি লয়ে যাবে। যদি বেঁধে লয়ে যায় তোমাকে তো লয়ে যেতে পারবে না।'

'কেন পারবে না?'

'এই তো সেদিন বললে, তুমি খ। আকাশবৎ। টেক্স তোমাকে তো টানতে পারবে না।'

কৃষ্ণকিশোর হা হা করে হাসতে লাগলেন।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তোমার অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে না, দেহবুদ্ধি থেকেই অহঙ্কারের জন্ম। আমিত্ব। আমি আছে বলেই দুঃখ আছে। দেহ আর কিছুই নয় তোমার পূর্বকর্মের ফল। দেহ তো জড় গো, চৈতন্যশূন্য একটা খাঁচা। তার মধ্যে আমি পাখিটা ঢুকে বলে, আমার খাঁচা। চিৎ-এর ছায়া হল আমি। সেই আগুনে এই আগুন গো! একখণ্ড লোহা। নিরেট, কালো একটা জড়বস্তু। আগুনে তাতাও গনগনে লাল। আমি আর আমার দেহ। আমির চৈতন্যে নড়াচড়া, দুঃখসুখ। আত্মার দেহ নেই, দেহশ্রম আসে আমি থেকে।'

কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'বাবা! এ তুমি জানলে কোথা থেকে! দেহমূলমিদং দুঃখং দেহঃ কর্মসমুদ্ভবঃ।'

'কেন? তুমিই তো সেদিন অধ্যাত্মরামায়ণ থেকে আমাকে পড়ে শোনালে। চন্দ্রমা সম্পাতি সংবাদ।'

'বাঃ, বাঃ, তুমি তো আমার ভাল ছাত্র হে! সব মনে থাকে, আবার সুন্দর ব্যাখ্যাও করো, অতি প্রাঞ্জল। বাকিটা তো সেদিন শুনলে না, আজ শুনবে নাকি?'

'তোমার কাছে আসি কী করতে!'

'কর্ম দু ধরনের, পাপ আর পুণ্য। পুণ্য কর্মে মুক্তি, স্বর্গবাস। যেই পুণ্যের বুলি শেষ হল স্বর্গ হতে বিদায়। জীবের অবতরণ। প্রথমে চন্দ্রলোক। সেখানে এক বিন্দু জলের সঙ্গে মিলিত হয়ে পৃথিবীতে শস্য কণায় পতন। জীবের আকার তখন, ধান, গম, জল ইত্যাদি। ওইভাবেই বেশ কিছুকাল অবস্থান। মানুষের খাদ্য। খাদ্য থেকে বীর্য। বীর্যের গতি জরায়ুতে। রক্তের মিলনে দানা বেঁধে পরিণত হবে কললে। পঞ্চম রাত্রে তৈরি হবে ভ্রূণ। সেটা কেমন, না বুদবুদের মতো। সাত রাত্রির মধ্যে পরিণত হবে মাংসপিণ্ডে। পনেরো দিনের মধ্যে সেই মাংসপিণ্ডে রক্ত সঞ্চারিত হবে। পঁচিশ রাত্রের মধ্যেই তাতে প্রকাশিত হবে একটি অঙ্কুর। এরপর একমাসের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে ঘাড়, মাথা, কাঁধ, পেট, মেরুদণ্ড। একের পর এক। দ্বিতীয় মাসের মধ্যেই তৈরি হবে বাহুদ্বয়, পদদ্বয়, মালাই চাকি, নিতম্ব। সব একে একে। তৃতীয় মাসে দেহসন্ধি। চতুর্থ মাসে আঙুল। পঞ্চম মাসে নাক, চোখ, কান, দাঁত, নখ ও জননাঙ্গ। ষষ্ঠ মাসে তৈরি হবে কানের ছিদ্র, পায়ু, নাভি ও যৌনাঙ্গ। সপ্তম মাসে কেশ ও খুলি। অষ্টম মাসে সম্পূর্ণ এক মানব। পঞ্চম মাসেই জীবনের

Scanned by CamScanner

লক্ষণ ফুটে ওঠে। নাভিসূত্র দিয়ে মাতার খাদ্যবস্তুর সার শোষণ করতে থাকে, নাভিসূত্রান্নরসেন মাতৃভুক্তান্নসারতঃ ধর্বতে গর্ভগঃ পিণ্ডো ন ম্রিয়েত স্বকর্মতঃ ॥

নিজের কর্মের শক্তিতে তার বর্ধনের পালা। মৃত্যুরোধী প্রাণশক্তি। এই ভ্রূণের স্মৃতি তখন জাগ্রত হয়। পূর্ব পূর্ব জন্ম ও কর্মের স্মৃতি।'

রামকৃষ্ণ অন্যমনস্ক মুখে কাবাব চিনির একটি দানা ফেলে কৃষ্ণকিশোরের আরও কাছে সরে গেলেন। এতটাই তন্ময় শরীরবোধ লুপ্ত। কৃষ্ণকিশোর বলেই চলেছেন, 'গর্ভের ওই উত্তাপ, সেই সঙ্গে ভাল ও মন্দ কর্মের স্মৃতির উপর যন্ত্রণায় ভ্রূণ কী ভাবে! ভাবে, কত সহস্র যোনিতে বারে বারে আমার জন্ম। কত স্ত্রী, কত স্বামী, সন্তান সন্ততি, আত্মীয়, পরিজন! কত অধিকার! পরিবার পালনে, জীবনধারণে সৎ, অসৎ পথে অর্থের অন্বেষণ। দুর্ভাগ্য আমার স্বপ্নেও তো বারেক ঈশ্বরকে ভাবিনি! তারই ফল, এই গর্ভযন্ত্রণা! নশ্বর এই দেহকে শাশ্বত ভেবেছি! এমন কাজ করেছি যা করা উচিত নয়। দেহের জন্যে করেছি দেহস্থ আত্মার কথা ভাবিনি। দেখো, নরকসদৃশ এই গর্ভাশয়ে আমার কী যন্ত্রণা। এবার আমি মুক্ত হলে মহাবিষ্ণু ছাড়া অন্য আর কিছু ভাবব না। এই ভাবতে ভাবতেই শুরু হল মায়ের প্রসববেদনা। সেই ভয়ঙ্কর ক্লেশে ভ্রূণের আরও কষ্ট। নরকযন্ত্রণা। সেই দুর্গন্ধী নরক থেকে অবশেষে মুক্তি পেল কীটের মতো একটি প্রাণী। গর্ভের স্মৃতি, সঙ্কল্প, বিকল্প সব হারিয়ে গেল। শুরু হল জীবনচক্র। জীবনযন্ত্রণা। চন্দ্রমা সম্পাতিকে আত্মজ্ঞান দিচ্ছেন। সম্পাতি কে?'

'কেন, জটায়ুর ভাই গো। যৌবনে ভীষণ অহঙ্কার হল, আমাদের অসীম শক্তি। সেই শক্তির পরীক্ষা নিতে দুজনে উড়ে চলল সূর্যের দিকে। কয়েক সহস্র যোজন যাওয়ার পর জটায়ু বললে, ভাই, আর পারি না, তাপে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। তখন সম্পাতি নিজের ডানায় তাকে ঢেকে নিল। শেষে তার ডানা দুটি পুড়ে ছাই হল। এসে পড়ল বিন্ধ্যপর্বতের চূড়ায়। জ্ঞান এল। দেখছে সুন্দর একটা আশ্রম। আশ্রমের মুনির নাম চন্দ্রমা।'

'বাঃ, তোমার সব জানা!'

'তা হোক, তোমার মুখ থেকে বারে বারে এইসব আমার শুনতে ইচ্ছে করে।'

'চন্দ্রমা সম্পাতিকে বললেন, দেহবোধ হতেই জীবের এই গর্ভ নরকযন্ত্রণা। দেহাতীত হয়ে আত্মস্বরূপের সঙ্গে একাত্ম হও। তুমি দেহ নও, তুমি আত্মা। আত্মজ্ঞানবান ভবেত। তাই তো আমি বলি, আমি খ।'

রামকৃষ্ণ হঠাৎ জোরে বলে উঠলেন, 'নাক তেরে কেটে তাক।'

কৃষ্ণকিশোর চমকে উঠে বললেন, 'এ আবার কী?'

রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, 'তবলার বোল। মুখে বলা সহজ, হাতে বাজানো কঠিন।'

কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'তাই বল, আমি তো চমকে গেছি।'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার একটা পরামর্শ আছে।'

'বলো।'

'আমার কাছে এক সাধিকা এসেছে। ভৈরবী, ব্রাহ্মণী।'

'শুনেছি, দেখেছি। তেজস্বিনী, সুন্দরী।'

'জ্ঞানী, সাক্ষাৎ সরস্বতী। আমি তন্ত্র করব।'

'করার কী আছে! তুমি তো সবই জানো। সিদ্ধি তোমার কাছে হেঁটে হেঁটে আসবে।'

'শোনো, আমি সমস্ত মতের সাধন করে দেখতে চাই, সব পথের শেষে সেই এক আছেন কি না!'

'তা ভাল, মিলিয়ে নেওয়া ভাল। শোনার চেয়ে দেখা অবশ্যই ভাল।'

'ভৈরবী আমার কাছে আছে, সেটা কী ভাল?'

'না, ভাল নয়। তোমার জগৎ আর সাধারণ মানুষের জগৎ ভিন্ন!'

'আমি বলি, লোক না পোক।'

'তুমি বলতে পার। তুমি সবার থেকে আলাদা। তবে তোমার গুরু ভৈরবীর লোকনিন্দা মানে তোমার গুরুর নিন্দা।'

'ভেবেছি আমি। মন্দিরের বাইরে থাকা ভাল, কি বলো?'

'অবশ্যই। প্রদীপ অন্ধকার দূর করে, কিন্তু তার নীচেই অন্ধকার।'

রামকৃষ্ণ উঠে পড়লেন। পরিধানে গোল গলা একটি পাঞ্জাবি, ধুতি। কোঁচাটিকে ফেলে রেখেছেন কাঁধে। চটি জোড়া খোলা রয়েছে বাইরে। রামকৃষ্ণ সেই দিকে এগোচ্ছেন। কৃষ্ণকিশোর তাঁর অনুগামী। যেতে, যেতে জিজ্ঞেস করছেন, 'যাবে কোথায়! সোজা মন্দিরে!'

রামকৃষ্ণ দুষ্টু দুষ্টু হেসে বললেন, 'না গো, যাব অভিসারে। কালা কৃষ্ণ ছোট্ট একটি গুলির আকারে বসে আছেন শম্ভু মল্লিকের বাগানে।' বলেই, কৃষ্ণকিশোরের কানের কাছে ঠোঁট এনে ফিশফিশ করে বললেন, 'আফিং।'

কৃষ্ণকিশোর এতক্ষণে হা হা করে হাসলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, 'ভায়া! তুলনাটা দিয়েছ ভালই। কৃষ্ণ আফিং-এর কী টান। ঘরসংসার, লোকলাজ, মান অপমান ভুলে ছুটে ছুটে চলে আসত। তোমার পেটের অবস্থা কী খুব খারাপ!'

'মা আমার পেটটা শেষ করে দিয়েছেন।'

'ঠিক করেছেন। জ্ঞানীদের উদর দুর্বলই হয়। তবে তন্ত্রে যাবে তো, এইবার দেখবে চেহারায় চেকনাই আসবে।'

'শম্ভুই তো বললে, আমার ওখানে যখন আসবে, মনে করে আমার কাছ থেকে একটু আফিম চেয়ে নেবে। সেবনে পেট ভাল থাকবে। বুঝলে ভায়া, পেটটাকে ভাল রাখার খুব দরকার। ব্রহ্ম সবার ওপরে, পেট ঠিক তার তিন ধাপ নীচে। পেট দিয়েই তো উঠতে হবে! মরেই যদি গেলে তাহলে আর যাবে কোথায়!'

'শম্ভুবাবুর ওই দিকের এলাকাটা খুব খারাপ। ঈশান কোণে খালের ধারে একটা কুঁড়েঘর দেখেছ! ওটার নাম জগৎকুঁড়ে। ডাকাতদের আড্ডা। সন্ধের পর ওই রাস্তায় একা লোক চলে না।'

'আরে, তুমি শোনোনি বুঝি! শম্ভু সদরওয়ালাকে বলে ওখানে একটা সেপাই চৌকি বসিয়ে দিয়েছে।'

'তবু সাবধানে যেও, সাবধানের মার নেই।'

শম্ভুচরণ মল্লিক কলকাতার সিঁদুরিয়াপটির ধনী ব্যক্তি। সনাতন মল্লিকের একমাত্র পুত্র। ইংরেজ কোম্পানির মুৎসুদ্দি। অঢেল উপার্জন। ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত আছে। রানি রাসমণি হেস্টি সায়েবের মেমের কাছ থেকে বাগান আর কুঠিবাড়ি কিনে মন্দির স্থাপন করলেন। হেস্টি সায়েব গঙ্গার ধারে কুঠিবাড়ি আর বাগানের লাগোয়া যে জায়গাটায় চটকল করবেন ভেবেছিলেন, সেই জায়গাটা যদুনাথ মল্লিক কিনে বিলাসবহুল বাগানবাড়ি করেছেন। বিলিতি আসবাব, দামি, দামি ঘোড়া। আস্তাবল। কেয়ারি করা বাগন। সে এক দেখার ব্যাপার। হেস্টিসাহেব কল করবেন বলে আলমবাজারের মোড় থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত রাস্তার নাম হয়েছে হেস্টি রোড। রাস্তার ধার বরাবর একটি খাল, গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। সেই খালের ধারে জমি কিনে বাগানবাড়ি করেছেন শম্ভুচরণ মল্লিক।

রামকৃষ্ণ ঢুকেই বললেন, 'যাক, তুমি আছ, আজ কি একটু বাইবেল হবে! যীশুর জীবনী?'

শম্ভুচরণ জিজ্ঞেস করলেন, 'কত দূর হয়েছে?'

'তুমি সেদিন ইয়োবের কথা বলছিলে, ধন, জন, পুত্র, কন্যা, সবই গেল। ইয়োব নিজের বস্ত্র ছিঁড়ে ফেললেন, মস্তক মুণ্ডন করলেন, ভূমিতে প্রণিপাত করে বললেন, আমি মাতার গর্ভ হইতে উলঙ্গ আসিয়াছি/ আর উলঙ্গ অবস্থাতেই সেই স্থানে যাইব ফিরিয়া/ প্রভু দিয়াছিলেন, প্রভুই লইয়াছেন/ প্রভুর নাম প্রশংসিত হউক ॥'

'বাবা, তুমি তো দেখছি শ্রুতিধর। থাক আজ সন্ধা হয়ে এসেছে। এমনি আলোচনা হোক। আজ যাবার সময় আফিম নিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে। অত পেটের অসুখ ভাল নয়।'

এ কথা, সে কথায় হোমা পাখির কথা এল। আকাশের বহু উঁচুতে ডিম পাড়ে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে বাচ্চা বেরোয়। পৃথিবীর মাটিতে পড়ার আগেই ডানায় শক্তি আসে, তখন চোঁচাঁ করে উড়ে যায় আকাশের দিকে, পৃথিবীর মাটি ভুলেও স্পর্শ করে না। এই পাখির কথা বেদে আছে।

রামকৃষ্ণ বলছেন, 'একটি আছে, নিত্যসিদ্ধের থাক্। তারা জন্মাবধি ঈশ্বরকে চায়, সংসারে কোনও জিনিস তাদের ভাল লাগে না। এই হোমা পাখির বাচ্চা। যখন মাটির কাছাকাছি এসে পড়ে, তখন তার চৈতন্য হয়। তখন বুঝতে পারে যে, মাটি গায়ে ঠেকলেই মৃত্যু। পাখি চিৎকার করে মার দিকে চোঁচাঁ দৌড়। মাটিতে মৃত্যু, মাটি দেখে ভয় হয়েছে। এখন মাকে চায়! মা সেই উঁচু আকাশে আছে। সেই দিকে চোঁচাঁ দৌড়। আর কোনও দিকে দৃষ্টি নাই। এই যে তোমার বাইবেলের ইয়োব, ঈশ্বরের কত বড় কৃপা! সব কেড়ে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন! কোনটা তাঁর কৃপা কে বুঝতে পারে! অর্জুনও পারেনি।'

'কী রকম?'

'একদিন শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন দুজনেই ব্রাহ্মণের বেশে প্রথমে এক সামন্ত রাজার প্রাসাদে গেলেন। সেখানে প্রাসাদের বাইরে যেমন তেমন একটা ঘরে থাকার ব্যবস্থা হল। খাওয়া দাওয়া পরিচর্যা ওই একরকম। বিশেষ খাতির যত্ন হল না। সেখান থেকে চলে আসার সময় শ্রীকৃষ্ণ আশীর্বাদ করলেন, রাজা, তোমার সম্পদ আরও বাড়ুক, তুমি দীর্ঘজীবী হও। অর্জুন ভাবলে, সখা, কী উদার, তা না হলে রাজবাড়ির আতিথেয়তার যা ছিরি, রাজা তো নিজে একবার এলই না, রাজকর্মচারীদেরও দায়সারা ভাব, তবু এই সমৃদ্ধির আশীর্বাদ! এর পরে, দুজনে গেলেন এক বিধবা ব্রাহ্মণীর বাড়িতে। ব্রাহ্মণীর সম্বল বলতে একটি দুগ্ধবতী গাভী। সেই দুধ বিক্রি করে কোনওরকমে তার দিন গুজরান হয়। তাঁরা আসতেই ওই ব্রাহ্মণী

Scanned by CamScanner

বিশেষভাবে তাঁদের আদর যত্ন সেবা করতে লাগল। চলে আসার সময় শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণীকে আশীর্বাদ করলেন, আহা! তোমার গরুটি মারা যাক। বাইরে পথে এসে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে অবাক হয়ে বলছে, সখা! এ তোমার কেমন ধারা বিচার! রাজা আমাদের দূর-ছাই করলে, তাকে বললে, ধনেজনে তুমি আরও বাড়। আর যে ব্রাহ্মণী আমাদের এত যত্ন করলে, তাকে বললে, তোমার একমাত্র সম্বল গাভীটা মরে যাক। শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হেসে বললেন, সখা! বুঝলে না ওই রাজা ঘোর মায়ায় জড়িয়ে আছে, মুক্তি বহু দূরে, ইচ্ছেও নেই, তাই আরও জড়িয়ে দিয়ে এলুম। ব্রাহ্মণীর মুক্তি এসে গেছে, কেবল ওই গরুটাই একমাত্র বাধা। সেটাকে সরিয়ে দিয়ে এলুম। একে দিলুম বন্ধন, ওকে দিলুম মুক্তি।'

রামকৃষ্ণ আসন ছেড়ে উঠলেন। বেরিয়ে এলেন গেটের বাইরে। কথায় কথায় দুজনেই ভুলে গেছেন আফিমের কথা। হঠাৎ মনে পড়ল রামকৃষ্ণের, যাঃ, আফিম! আবার ফিরে গেলেন। শম্ভুচরণ ততক্ষণে অন্দরমহলে চলে গেছেন। ডেকে বিরক্ত না করে এক কর্মচারীর কাছ থেকে একটু আফিম চেয়ে নিলেন। এইবার হেস্টি রোড ধরে যাবেন কালীবাড়িতে। আকাশ থেকে দিন প্রায় মুছে গেছে। পথে পা বাড়ালেন রামকৃষ্ণ; কিন্তু এ কী ব্যাপার! রাস্তা কোথায়! কোথায় গেল পথ! রাস্তার পাশের বিরাট জলনালা পা দুটোকে টানছে। নালাটা রয়েছে পথটা কোথায়। আর একটু এগোলেই তো নালায় পতন। শম্ভু মল্লিকের বাগানের দিকে তাকালেন। গেট দেখতে পাচ্ছেন, ওদিককার পথটাও রয়েছে। ওই পথেরই তো এই পথ! তা হলে! এ তো বড় আশ্চর্য ভৌতিক ব্যাপার! আচ্ছা, পুনর্যাত্রা করে দেখা যাক। ফিরে গেলেন বাগানের গেটে। পথটাকে দেখে নিলেন ভাল ভাবে। এই হল পথ, ওই হল নালা। এইবার প্রায় লাইন ধরে হাঁটার মতো করে সাবধানে কয়েক কদম এগোবার পরেই আবার সেই ব্যাপার, হঠাৎ রাস্তাটা নেই। নালাটা আছে, আর পা দুটো সেই দিকেই যেতে চাইছে। আবার ফিরে গেলেন গেটে। আবার যাত্রা। এবার পা দুটোকে কে যেন পেছন দিকে টানছে!

রামকৃষ্ণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, কেন এমন হচ্ছে! হঠাৎ ঝলসে উঠল মনে, আরে! আমি তো চোর! আমি আফিম চোর। শম্ভু বলেছিল, আমার কাছ থেকে আফিম চেয়ে নিয়ে যেও। আমি তো তা করিনি। আমি শম্ভুকে না জানিয়ে তার কর্মচারীর কাছ থেকে নিয়ে পকেটে পুরেছি। সেই কর্মচারীও তো দেওয়ার আগে মালিকের অনুমতি নেয়নি। বুঝেছি মা তোমার খেলা। আমি যে ভাবে আফিম নিয়েছি, তাতে মিথ্যা আর চুরি দুটো দোষই হয়েছে, তাই তুমি আমাকে আটকে দিলে!

রামকৃষ্ণ ভেতরে ঢুকে শম্ভুচরণ প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের সামনে দাঁড়ালেন। কেউ নেই। সেই কর্মচারীটিও কোথায় চলে গেছে। রামকৃষ্ণ জানলা গলিয়ে আফিমের মোড়কটি ঘরের ভেতর ছুড়ে দিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'ওগো, এই তোমাদের আফিম রইল।'

বাগান থেকে বেরিয়ে এলেন। পরিষ্কার পথ, সোজা চলে গেছে। এক পাশে নালা। বেশ হাঁটতেও পারছেন। তরতর করে এগিয়ে চললেন রাসমণির বাগানের দিকে।

হৃদয় আর ভৈরবী একই সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে! দেখে মনে হচ্ছে ঝড়ে পড়েছিলে!'

রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, 'খুব একটা শিক্ষা হল।'

রাত ক্রমশ গভীর হল। নিস্তব্ধ দেবালয়। দালানে, দালানে কর্মচারীদের শয়নের আয়োজন। গাছের পাতায় পাতায় গঙ্গার বাতাসের হুসহাস শব্দ। তারাভরা নির্মেঘ আকাশ। পঞ্চবটীতে বসে আছেন পাশাপাশি ভৈরবী আর রামকৃষ্ণ। সামনেই ছলছলে গঙ্গা।

রামকৃষ্ণ ভৈরবীকে প্রশ্ন করলেন, 'এখানে থাকতে তোমার কেমন লাগছে?'

ভৈরবী মৃদু হেসে বললেন, 'জানি, কেন তুমি এই প্রশ্ন করছ! তোমার দৃষ্টি একরকম, অন্যের দৃষ্টি অন্যরকম। আমার একটা দেহ আছে, পৃথিবীতে কাম আছে। আমি গ্রাহ্য করি না, তুমিও গ্রাহ্য কোরো না, তবু সমাজ তো রয়েছে!'

'তোমাকে কেউ ছোট করে দেখলে আমার গায়ে লাগবে।'

'তোমার ব্যাপারেও তাই।'

'আমি অন্যত্র তোমার একটা থাকার ব্যবস্থা করব। নিরালা, নির্জন। খুব কাছেই।'

'কোথায়?'

'কাছেই, গঙ্গার ধারে। নবীন নিয়োগীদের বাড়িতে। আহা! শিবের সংসার গো! যেমন কর্তা তেমন গিন্নি। পাশেই দেবমণ্ডলের ঘাট। ওখান থেকে এখানে আসা যাওয়ারও অসুবিধে নেই। পেছনের গেট দিয়ে চলে আসবে।'

ভৈরবী হাসলেন। অন্ধকারে তাঁর শুভ্র দন্তপংক্তি ঝলসে উঠল। হাসতে হাসতেই বললেন, 'আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ।'

'তাহলে বলতে হয় বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের মতো, দেহের হাত ছাড়িয়ে যাচ্ছ প্রভু, কিন্তু হৃদয়ের হাত কি ছাড়াতে পারবে!'

'ভক্তমাল শোনো বুঝি?'

'প্রায় শুনি, যদিও একটু একঘেয়ে লাগে।'

ভৈরবী উঠে দাঁড়ালেন। বাতাসে চুল উড়ছে, আঁচল সরে সরে যাচ্ছে। দৃকপাত নেই কোনও। বিশ্বের পরিধি হঠাৎ বিশাল হতে শুরু করেছে। জড়জগৎ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে চৈতন্যের জগতে তলিয়ে যাচ্ছে। ভৈরবী দুহাত তুলে নাচের ভঙ্গিতে গাছের আড়ালে আড়ালে ঘুরছেন আর ভাবের ঘোরে মৃদুকণ্ঠে গাইছেন,

বাঁশী বাজিল ওই বিপিনে
আমার তো না গেলে নয়
শ্যাম পথে দাঁড়িয়ে আছে।

রামকৃষ্ণ উঠে গিয়ে আমলকীতলে ধ্যানে বসলেন। রাত অতি দুর্লভ সময়। সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষিরা বিচরণে বেরিয়ে পড়েন। শিব আসেন বিল্বতলে। মন্দির চূড়ায় মা কালী ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাতের শোভা দর্শন করেন। ধ্যানের অতলে তলিয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। পঞ্চবটীতলে একা ভৈরবী। তিনি কাঁদছেন। আরও কতটা পথ গেলে তোমার সঙ্গে মিলন হবে প্রভু! তোমার বংশীধ্বনিই শুনছি, তোমার দর্শন কবে পাব!

ভোর হল।

প্রথমেই ছোটখাটো একটা অশান্তি।

রামকৃষ্ণ উত্তেজিত হয়ে হৃদয়কে বলছেন, 'শালা, তোকে আমি একটা দাঁতনকাটি আনতে বললুম, তুই গোটা একটা ডাল ভেঙে নিয়ে চলে এলি! এই গাছ কি তুই সৃজন করেছিস! যাঁর গাছ তিনিই জানেন ওর মূল্য কত। শালার বোধ বুদ্ধি দেখ! যা, ওটাকে ঠিক করে রাখ। তিন চার দিন চলে যাবে। এইবার তুই নবীনদের বাড়িতে যা। শুনে আয় কী বলে।'

মুখ ধুয়ে একটি বেলপাতা খেলেন। উজ্জ্বল মন্দিরচূড়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। দুটি প্রসাদী বাতাসা মুখে ফেলে জল খেলেন। চলে গেলেন বাগানে। ফুলের সমারোহে। রামকৃষ্ণের শরীরে বাচ্চা একটা ছেলে আছে। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে এসে ফচকেমি করে। সে এসে বলছে, চলো না ওদিকে, জেলেরা কেমন মাছ ধরছে দেখবে। হঠাৎ ম্যাগাজিন থেকে কুঁয়ার সিং এসে স্যালুট করে বললে, 'ঠাকুর! তোমাকে একদিন চানকে নিয়ে যাব আমাদের প্যারেড দেখাতে।'

রামকৃষ্ণ বন্ধুকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'এতদিন ছিলে কোথায়?'

'দেশে গেলুম তো, বোনের বিয়ে হল যে।'

'আমার জন্যে কী আনলে? ক্ষীর, প্যাঁড়া, লাড়ডু!'

'তোমার জন্যে গুরু নানকের ছবি এনেছি।'

'কবে দেবে?'

'কাল আবার আসব।'

কুঁয়ার সিং চলে যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই হৃদয় এল।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'কী রে, কী বললে?'

'বললে, তোমার মামা যখন বলেছেন, তখন কোনও আপত্তি নেই। তাঁর আদেশ।'

'তা চল, ভৈরবী মাকে রেখে আসি।'

'তুমি আবার যাবে কেন? তুমি পরে যেমন যাও যাবে। আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

'কেমন কী ব্যবস্থা হবে!'

'আমার ওপর ছেড়ে দাও। অত বড় বাড়ি, উঠন!'

'তাহলে যা। এরপর বেলা বেড়ে গেলে অসুবিধে হবে।'

তাঁর ঝোলাটি কাঁধে নিয়ে ভৈরবী হৃদয়ের সঙ্গে নিয়োগীমশাইদের বাড়িতে ঢুকলেন। এ বাড়িতে দোল, দুর্গোৎসব হয়। ভক্ত পরিবার। রামকৃষ্ণ আসেন নীলকণ্ঠের যাত্রা শুনতে। দুর্গাপূজার সময় পিতা, পুত্র দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে চামর বাজন করে। প্রবেশ মাত্রেই ভৈরবীর মনে হল, ঠিক জায়গায় এসেছি। শক্তির পীঠস্থান। তবে সংসারে সংসারীদের সঙ্গে বসবাস করা যাবে না।

স্বামী, স্ত্রী এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পিঁড়ে পেতে দিলেন বসার জন্যে। দুর্গাদালানে পায়রাদের বকম বকম। একপাশে মা দুর্গার একটি চালচিত্র দেয়ালে ঠেসান।

নিয়োগি গিন্নি বললে, 'মা, তুমি যে সাক্ষাৎ দুর্গা। আমাদের আশীর্বাদ করো, কোনও অকল্যাণ যেন না হয়।'

ভৈরবী হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমরা কার আশীর্বাদ পেয়েছ জানো! সাক্ষাৎ ভগবান। আচ্ছা, আমি থাকব কোথায়!'

Scanned by CamScanner

'সে কী এখানে থাকার জায়গার অভাব !'

'খাঁচা ছেড়ে কেউ আবার খাঁচায় ঢোকে মেয়ে ! আমার যে গঙ্গার ধার চাই।'

নিয়োগীমশাই বললেন, 'তার আর অসুবিধে কী মা ! দাতারাম মণ্ডল, মস্ত বড় দেওয়ান। আমাদের পাগলা ঠাকুরের ভক্ত। গঙ্গার ধারে সুন্দর ঘাট প্রতিষ্ঠা করেছেন। দেবমণ্ডল ঘাট। সুন্দর চাঁদনি।'

জায়গাটি ভৈরবীর পছন্দ হল। মুক্ত, উদার।

হৃদয় বললে, 'মামা, এই জায়গাটার কথাই বলেছে।'

ভৈরবী বললেন, 'আমাকেও !'

নিয়োগীমশাই বললেন, 'পরিবার আপনার সেবা করবে। যতকাল ইচ্ছা থাকুন। বাড়ি থেকে আপনার ব্যবহারের সব জিনিস পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সব এসে গেল। একটি তক্তাপোশ, নতুন পাটি, কম্বল, তৈজসপত্র, নতুন বালতি, ঘটি, কুঁজো, নতুন উনন, কাঠ ঘি, তেল, নুন, চিনি, চাল, ডাল, তরিতরকারি, ফল, দুধ।

হৃদয় কালীবাড়িতে ফিরে এসে মামাকে বললে, 'দেবমণ্ডলের ঘাটে আশ্রম তৈরি। ভক্তদের ভিড় লেগে গেছে। আনন্দের হাট বসে গেছে। সবাই উঠতে বললে উঠছে, বসতে বললে বসছে, তার মাঝে আলো করে বসে আছেন তিনি। পরে একবার গিয়ে দেখে এসো। যাকে যা হুকুম করছেন সে তাই পালন করছে।'

'হ্যাঁ রে হৃদে, কোনও অসুবিধে হবে না তো !'

'অসুবিধে ? মনে হচ্ছে, পুরো দক্ষিণেশ্বরটা তার।'

'মনে রাখিস হৃদু, আমার প্রথম প্রকৃত গুরু। আমাকে ভেঙেচুরে বদলে দিতে এসেছে। কাছে এলেই বুঝতে পারি শক্তির তরঙ্গ।'

'তাহলে এতকাল কী করলে ?'

'মা, মা বলে চিৎকার করলুম, তাই তো মা ভৈরবী হয়ে এলেন।'

'তোমার বোঝার কোনও ভুল হচ্ছে না তো !'

'তোর কী মনে হচ্ছে ?'

'আমার মনে হচ্ছে, যা হয়েছে খুব হয়েছে, এবার মথুরবাবু যা দিতে চাইছেন বুদ্ধিমানের মতো নিয়ে গুছিয়ে বোসো।'

রামকৃষ্ণের চোখ ছাপিয়ে জল নামল। শরীর গুটিয়ে গেল, কানে আঙুল দিয়ে বললেন, 'ছিঃছিঃছিঃ। তুই আমার সামনে থেকে সরে যা। তোর গা থেকে বিষ্ঠার দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। তুই চলে যা।'

রামকৃষ্ণ মূর্ছিত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন।

এদিকে নবীন নিয়োগীর রান্নাঘরে মহা ব্যস্ততা। মেয়েরা, বউরা সব ছোটাছুটি করছে। ভৈরবী একটা কিছু করছেন। স্নান করেছেন, পিঠের ওপর এলোচুল। টকটকে রূপ। বড় এলাচের গন্ধ বেরোচ্ছে। রামকৃষ্ণের জন্যে ক্ষীরের নাড়ু তৈরি হচ্ছে। বলেছেন, আজ আমার ছেলেটাকে অবাক করে দোবো। 'শোনো মায়েরা, জীবনটাকে যদি সুখের করতে চাও, কৃষ্ণের ভজনা করো।' গান ধরলেন, 'দে রে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে, রাধা জানে কি গো কৃষ্ণ বই/কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সই।'

সন্ধে তখন হয় হয়। একটি, দুটি শঙ্খধ্বনি কানে আসছে। রামকৃষ্ণ কুঠিবাড়িতে নিজের ঘরের নির্জনতায় বসে আছেন। ঘরে ধুনো দিয়ে গেছে দাসী। একটি প্রদীপ জ্বলছে। এখনও তেমন উজ্জ্বল হয়নি। মৃদু মৃদু হাততালির সঙ্গে মায়ের নাম করছেন রামকৃষ্ণ। এমন সময় কানে এল কারা যেন গান গাইতে গাইতে আসছে। এক দল নারী। দরজার সামনে ছায়া পড়ল। রামকৃষ্ণ অবাক হয়ে দেখছেন, এরা কারা ! মা যশোদা নাকি ! নীলশাড়ি, সালঙ্কারা, মাথার ওপর চূড়া খোঁপা। দুহাতে ঝকঝকে দুটি রূপোর থালা। একটিতে মালা, অন্যটিতে নাড়ু। রমণীর মুখে প্রদীপের আলো পড়েছে। নাকে নথ। চিকচিক করছে। শাড়িটি পরেছেন ঘাঘরার মতো করে। কস্তুরী, চন্দনের সুবাস। আয়ত দুটি চোখে সুদূরের দৃষ্টি।

রামকৃষ্ণ এইবার চিনতে পেরেছেন। ভৈরবী ! এখন আর তান্ত্রিক নয়, প্রেমিক। ভাবের ঘোরে এগিয়ে আসছেন। রামকৃষ্ণ দেখছেন মা যশোদা। গোপালের জন্যে উতলা। 'কোথায় গোপাল ? আমার গোপাল কোথায়।' নিমেষে সময় ছুটে গেল অতীতে। দক্ষিণেশ্বর ঘুরে গেল দ্বারকায়। পুররমণীরা হয়ে গেলেন গোপিনী।'

অনেক অনেক পরে যখন তাঁরা বাস্তবে ফিরে এলেন, দেখলেন রামকৃষ্ণ শিশুর মতো বসে আছেন ভৈরবীর কোলে। সব কটি নাড়ু খেয়ে ফেলেছেন। মুখের এক পাশে ক্ষীর লেগে আছে। মালাটি মাথায় জড়ানো চূড়ার মতো করে। সকলেই স্বাভাবিক হয়েছেন, কিন্তু ভৈরবী সংজ্ঞাহারা। রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ।

অন্য মহিলাদের এতক্ষণে লজ্জা ফিরে এসেছে। ভাবের ঘোরে কী করে ফেলেছে ভেবে, তাঁরা দ্রুত ফিরে চললেন উদ্যান পথে। রাত হয়ে গেছে, পথ নির্জন। মন্দিরে রামশিঙ্গা বাজাচ্ছেন বৃদ্ধ কৃষ্ণদাসবৈরাগী। অদ্ভুত মানুষ। কালীবাড়ির বিষ্ণুঘরে রাধাকান্তদেবের সেবকভক্ত। জীবনে রাধাকান্ত ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। মিতবাক। তিনি শুধু অপলকে কৃষ্ণরূপ দেখেন। মন্দিরে সন্ধ্যারতির পর বিগ্রহের সামনে বসে শিঙ্গা বাজান। একদিন রামকৃষ্ণকে নির্মাল্য প্রসাদাদি দিতে এসেছেন, রামকৃষ্ণ বললেন, 'কৃষ্ণদাস, তুমি বড় ভাগ্যবান ! তুমি একদিনও কী রাধাকান্তদেবকে দর্শন করেছ ?'

কৃষ্ণদাস হাত জোড় করে বললেন, 'একদিন কী প্রভু ! সদাসর্বদা। একপলক দেখতে না পেলে, মনে হয় একপ্রহর।' রামকৃষ্ণ বললেন, 'কই এখন তোমার রাধাকান্ত কোথায় ? তুমি তো এখন দাঁড়িয়ে আছ আমার সামনে !'

কৃষ্ণদাস জোড় হাতে রামকৃষ্ণকে দেখিয়ে কান্না জড়ানো গলায় বললেন, 'এই যে আমার গোলকের রাধাকান্ত।'

রোজ রাতে বিষ্ণুঘরে যেমন হরিনাম হয় আজও সেইরকম হচ্ছে। গোরাচাঁদ দাস করতাল বাজিয়ে নাম গান করছেন। দোয়ারকিতে রয়েছেন চক্রবর্তীমশাই। খোল বাজাচ্ছেন প্রবীণ বিষ্ণুদাস বৈরাগী। বিস্ময়কর বাদক। তিনি মুখে 'জয় রাধাগোবিন্দ' বলে, খোলেও 'জয় রাধাগোবিন্দ' বাজান। মুখে রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ তো খোলেও রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ। সঙ্গে কৃষ্ণদাসের রামশিঙ্গা। এই দলটি রামকৃষ্ণের খুব পছন্দের।

নাম খুব জমেছে। মন্দিরের কোথাও ছায়া, কোথায় আলো। মায়ের মন্দিরের পেছন দিকে ঘন অন্ধকার। সেই অন্ধকারে বসে আছে একটা বেড়াল। তার চোখদুটো আগুনের ভাঁটার মতো। একদিন পুজোয় বসে রামকৃষ্ণ এই বেড়ালটিকেই, খা মা, খা মা বলে, মাকে নিবেদিত ভোগ বেড়ালটিকেই খাইয়ে দিয়েছিলেন আগে। সেই থেকে বেড়ালটিকে সবাই সমীহ করে। বলে মায়ের বেড়াল, মঙ্গলা। আর মায়ের কুকুর, কাপ্তেন।

চক্রবর্তীমশাই হঠাৎ দেখলেন, মন্দিরের আলো-আঁধারি থেকে বেরিয়ে আসছে বিরাটকায় এক মানবমূর্তি। আবার দেখলেন। মনে হচ্ছে রামকৃষ্ণ ঠাকুর, তিনি কী করে এমন বিশালকায় হলেন ! গলায় দুলছে মালা। কপালে অভ্রচন্দনের তিলক। কী বিরাট দেখাচ্ছে আজ ! ভৈরবী ব্রাহ্মণী যা বলেছেন সেইটাই হয়তো সত্য, রামকৃষ্ণ ঠাকুর অবতার !

রামকৃষ্ণ আসরের মধ্যস্থলে বসলেন সোজা হয়ে। বিষ্ণুদাস বৈরাগীকে বললেন, 'বাজাও !'

শুরু হল গান,

হরিসে লাগি রহরে ভাই ;
তেরা বনত বনত বনি যাই
তেরা বিগড়ি বাত বনি যাই ॥
অঙ্কা তারে, বঙ্কা তারে, তারে সুজন কশাই
আওর শুগা পড়ায়কে গণিকা তারে, তারে মারাবাঈ ॥
দৌলত দুনিয়া মাল খাজনা, বেনিয়া বয়েল চালাই
আওর এক বাতকো টান্টা পড়ে তো, খোঁজ খবর না পাই ॥
অ্যায়সি ভক্তি কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাঈ
সেবা বন্দি আওর অধীন্‌তা, সহজ মিলে রঘুরাই ॥

রামকৃষ্ণের এই গানটি অতি প্রিয়। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছেন। দেব দুর্লভ কণ্ঠ। ভাবের অশ্রুধারা দু চোখে। যে যেখানে ছিলেন ছুটে এসেছেন। রামকৃষ্ণ মাঝে মাঝেই বলেন, 'ওরে, কালে হবে, কালে বুঝবি। বিচিটা পুঁতলেই কি অমনি ফল পাওয়া যায় ? আগে অঙ্কুর হবে, তারপর চারা গাছ হবে, তারপর সেই গাছ বড় হয়ে তাতে ফুল ধরবে, তারপর ফল। সেইরকম। তবে লেগে থাকতে হবে, ছাড়লে হবে না, তেরা বনত বনত বনি যাই।'

গাইতে গাইতে গানের প্রথম চরণদুটি এল, হরিষে লাগি রহো রে ভাই। তেরা বনত বনত বনি যাই। হঠাৎ ভাবান্তর। রামকৃষ্ণের রুদ্র মূর্তি, 'দূর শালা ! বনত বনত কী ? ম্যাদাটে ভক্তি আমি চাই না। আমি ডাকাত। মারব, কাটব, লুটব। এখুনি চাই এই মুহূর্তে চাই মা।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে মত্ত হস্তীর মতো দুহাত তুলে নাচতে আর গাইতে লাগলেন। বিষ্ণুদাস খোল গলায় দাঁড়িয়ে পড়েছেন। করতাল হাতে চক্রবর্তীমশাই। কৃষ্ণদাস রামশিঙ্গা উচিয়েছেন, রামকৃষ্ণ গাইছেন

হরি বলে আমার গৌরনাচে।
নাচেরে গৌরাঙ্গ আমার, হেমগিরির মাঝে
রাঙা পায়ে সোনার নূপুর রুনুঝুনু বাজে ॥

মালার ফুল ছিঁড়ে ছিটকে ছিটকে পড়ছে চারপাশে। সবাই নৃত্য করছেন। নৃত্য করছে মন্দির, দেবতা, উদ্যান, জলতরঙ্গ। রামকৃষ্ণ নাচছেন।

Scanned by CamScanner

॥ আট ॥

ভারী সুন্দরী মেয়ে তো !

ভৈরবী দেখছেন। মন্দিরের চাতালে, এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে মায়ের পেছনে পেছনে। লাল ডুরে শাড়ি। পিঠ ছাপানো এলো চুল। খাড়া নাকে ছোট্ট একটি সোনার নথ। কপালে একটি টিপ। সকালের রোদে জিল জিল করছে।

ভৈরবী এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে মা তোমরা ?'

মেয়েটির মা সরল ও ভক্তিমতা। সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করে, একগাল হেসে বললেন, 'মা, আমরা ওপারে উত্তরপাড়ায় থাকি। এটি আমার মেয়ে ?'

মেয়েটি প্রণাম করে ভৈরবীর পায়ের কাছেই বসে পড়ল। তার এই সবই ভাল লাগে। গেরুয়া, গঙ্গা, মন্দির, তীর্থ, সাধু, সন্ন্যাসী। ভৈরবী ছোট্ট মেয়েটিকে দুহাত ধরে তুলে এক হাতে নিজের শরীরে জড়িয়ে নিলেন। মেয়েটি সেই ভাবেই রইল বুকে মাথা রেখে।

ভৈরবী জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি ব্রাহ্মণ ?'

মেয়ের মা বললেন, 'হ্যাঁ মা, আমরা ব্রাহ্মণ। মুখোপাধ্যায়। আমার শ্বশুরমশাই শাস্ত্র নিয়েই থাকেন, পণ্ডিত। আমার স্বামী শিক্ষক। এই মেয়েটা খুব ঠাকুর ঠাকুর করে। আজ আর বসতে দিলে না, সব ফেলে নিয়ে এলুম ওকে, তাই না দেখা হল আপনার সঙ্গে।'

'আরও কারণ আছে মা। তোমরা ওই নাটমন্দিরে গিয়ে বোসো, আমি আসছি।'

ভৈরবী রামকৃষ্ণকে বেলতলায় খুঁজে পেলেন। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বেলতলার আসনের দিকে। ঘাসের কয়েকটি শিষ বেরিয়েছে। কচি সবুজ। রামকৃষ্ণ ভাবছেন, প্রাণশক্তির কী লীলা। মাটির নীচে তিনটি নৃমুণ্ড। মৃত্যু। সেই মৃত্যু ফুঁড়ে প্রাণের স্পন্দন ঘাসের আকারে প্রকাশিত।

ভৈরবী বললেন, 'মন্দিরে চল। মা এসেছেন কুমারীর বেশে। তন্ত্রের সাধনা শুরু করতে হয় কুমারী পুজো করে।'

'তাই নাকি ? তাই নাকি ?' ভীষণ উতলা রামকৃষ্ণ। 'সাক্ষাৎ ভগবতী। চলো, চলো। সাজাই সাজাই।'

মন্দিরে হলধারী পূজার আসনে। আড়চোখে একবার তাকালেন। মন্ত্র বিড়বিড় করছিলেন। শেষে বলেই ফেললেন, 'যে কোনও দিন, যে কোনও সময়ে যা খুশি তাই করা যায় ? এটা শাস্ত্র, না রামকৃষ্ণশাস্ত্র !'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'দাদা কালাকালের কর্তার সামনে বসে কালকে আর না-ই বা খণ্ড করলে। মায়ের মন্দিরে একটিই পাঁজি, মায়ের ইচ্ছা। একটাই ব্যবস্থা—মায়ের ব্যবস্থা, একটাই বিধি—মায়ের ইচ্ছা।'

হলধারী রুষ্ট হয়ে বললেন, 'তোর সঙ্গে তো আর তর্ক চলবে না। কে একজন এসে বললে, অবতার, ব্যস, অমনি অবতার হয়ে গেলে, মুর্খের অবতার।'

হলধারী উত্তেজিত হয়ে মায়ের পায়ে একটি জবা দিতে গেলেন, ফুলটি শিবের বুক বেয়ে পড়ে গেল।

রামকৃষ্ণ শুধু বললেন, 'দেখলে তো ! তেজ ভাল, উত্তেজনা ভাল নয়।'

হলধারী আচমন করার জন্যে হাতের তালুতে জল নিয়েছিলেন, ঠোঁটে তোলার আগে শেষ কথাটি বললেন, 'লিখে রাখতে বলো। পরে লাগবে, রামকৃষ্ণবাণী।'

কুমারীকে সাজাচ্ছিলেন ভৈরবী। তিনি বললেন, 'মা তোমার মুখ দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করালেন বাবা ! তুমি তো বাকসিদ্ধ !'

ধুনোর ধোঁয়া আর ধূপের গন্ধ। দাঁড়িয়ে আছেন জীবন্ত দেবী। গলায় মালাটি পরানমাত্রই সমাধিস্থ। আনন্দোজ্জ্বল মুখ। দুগাল বেয়ে নামছে আনন্দধারা। দর্শনার্থীরা দেখছেন। এমন সুলক্ষণা মেয়েটি হঠাৎ দক্ষিণেশ্বরে এল কেমন করে ! কেনই বা এল ! ভৈরবীর আকর্ষণে ! পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হল। শ্রীরামকৃষ্ণ টাকা দিয়ে প্রণাম করে, জোড় হস্তে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা ! আমার হবে ?'

কুমারী বললে, হাঁ হবে।'

মন্দির ক্রমে নিরালা হল। গেটের কাছে কাঙালিদের হইহল্লা। চাঁদনিতে কজন সাধু রয়েছেন ভাণ্ডারী গুনে গেলেন। সাজিয়ে গুছিয়ে সেবা পাঠাবেন। সেই রকমই নির্দেশ। ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণের কানে কানে বলে গেলেন, 'প্রস্তুত থেকো। রাত্রির দশ দণ্ড। তার মানে নটা বেজে চুয়ান্ন মিনিট।'

সারাটা দুপুর দেওয়ান মণ্ডলের ঘাটে তাঁর ছোট্ট ঘরটিতে ভৈরবী বসে রইলেন একা। ছোট্ট গবাক্ষ পথে প্রবাহিনী গঙ্গা। পাঁপড় ভাজা মচমচে একটি দিন। আজ গুরুশিষ্য দুজনেরই উপবাস। নিয়োগীমশাইয়ের স্ত্রী যতবারই এসেছেন, দেখেছেন মা ধ্যানস্থ। নিজের গুরু ধ্যানে আসছেন বারে বারে। সেই অন্ধকার রাত। মহা শ্মশান। চিতা। কাঠকয়লা। অর্ধদগ্ধ, পরিত্যক্ত শব নিয়ে শিবা, শকুনের কলহ। সবাই বলেছিল, তোর এই রূপ যোগেশ্বরী, তুই রাজরানি হবি।

সংসার অসার। পুত্র, কন্যা, বন্ধন, জন্মমৃত্যু। যোগেশ্বরী কোনও পুরুষের কাম গর্ভে ধারণ করতে পারবে না। শিব তার স্বামী, চিতা তার শয্যা। কে একজন মোহিত হয়ে যুবতী যোগেশ্বরীকে আক্রমণের চেষ্টা করেছিল। এক কামমোহিত কৌল। সে চক্রে বসত। ভৈরবী যোগেশ্বরী ছাগরক্ত পান করে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। ছাগবলি হয়েছিল, নরকপোলে থকথকে সেই রক্ত। দুহাতে ধরে পান করছে। দু কশে রক্তের ধারা। গলায় গোটা গোটা রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে লাল টিপ। এলো চুল। রক্তগেরুয়া বসন। ছিন্নমস্তা মন্ত্রসিদ্ধ আমি। কৌল ! এসো রমণ করি। বিপরীতরমণ। যে রমণে নারীর ভূমিকা পুরুষের।

সেই কামার্ত ভ্রষ্ট তান্ত্রিক হঠাৎ যেন ভয়ঙ্কর দেবীকে জীবন্ত সামনে দর্শন করলেন। জোড়হস্তে আবাহন জানালেন, দিগম্বরীহ মহাযোবাং প্রত্যালীঢ়পদস্থিতাং। অস্থিমালবিরাং দেবীং নামযজ্ঞোপবীতিনাং। রতিকামোপবিষ্টাঞ্চ সদা ধ্যায়ন্তি মন্ত্রিণঃ। সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নত পয়োধরাং। বিপরীতরতাশক্তৌ...।

ঘৃত প্লাবিত ছাগের মাংস ও শোণিত, দিনের পর দিন দেবীর লক্ষ হোম, জগৎ, যোগেশ্বরীর বশীভূত। রাজাও তার আজ্ঞাবাহী ভৃত্য। যোগিনী যার সহচরী পৃথিবীতে তার কিসের ভয় ! গুরু বলেছিলেন প্রকাশের প্রয়োজন না হলে নিজেকে প্রকাশ কোরো না।

রামকৃষ্ণ অবতার। আমাকে অবতারের গুরু করলে ! শিব শক্তি দাও।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যায় নামাল, ভৈরবী তখনও বসে আছেন ধ্যানে। কুণ্ডলিনীতে মানসহোম চলেছে। রাত্রির প্রথম প্রহরে ভৈরবী আসন ছেড়ে উঠলেন। প্রস্তুত তিনি। এখন তাঁর অন্য মূর্তি। পরিধান রক্তাম্বর। হাতে ত্রিশূল। মুখে কঠিন ব্যক্তিত্ব। চোখ দুটো ঐশ্বরিক আবেশে উজ্জ্বল। পথে চলেছেন, পথচারী ভয়ে, সসম্ভ্রমে সরে যাচ্ছে। মাতা যশোদা নয়, এখন ভৈরবী শক্তি।

পঞ্চবটীতে পূজার আয়োজন নিজেই করলেন। খুঁটিনাটি অনেক। সিদ্ধিদাতা আসন হল, কুশাসনোপরি বস্ত্রাসন। নিজের হাতে বিজয়া প্রস্তুত করে পাথরের বাটিতে রেখেছেন। একপাশে হোমের উপকরণ, গব্যঘৃত, বিল্বপত্র। বৃক্ষ কন্দরে ঘৃতের প্রদীপ। ধূপ, ধুনোর গন্ধে পঞ্চবটী আমোদিত। ডালিতে পুষ্প, বিল্বপত্র, দূর্বা, তুলসী। আজ রামকৃষ্ণের পুরশ্চরণ। প্রকৃতি স্তব্ধ। বিদ্যুতাভ পশ্চিমাকাশ।

রামকৃষ্ণ বুঝতে চেয়েছিলেন তন্ত্রের ভাগ। ভৈরবী বলেছিলেন, তন্ত্র ভারতকে তিন ভাগে ভাগ করেছে। বিন্ধ্যপর্বতের পূর্ব দিকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত যে অঞ্চল, সেই অঞ্চল পড়েছে তন্ত্রের বিষ্ণুক্রান্তা শাখায়। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণাঞ্চল, অশ্বক্রান্তা। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ পশ্চিমাংশ রথক্রান্তা। 'রামকৃষ্ণ আমরা আছি বিষ্ণুক্রান্তায়। শঙ্কর চৌষট্টিখানি তন্ত্র রচনা করেছেন। ভৈরবাষ্টক, যামলাষ্টক, মতাষ্টক ইত্যাদি। তন্ত্রসাধনা অতি কঠিন, তবে তোমার কাছে খুব সহজ হবে ; কারণ, তোমার জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক হয়ে আছেন। তোমার সমস্ত প্রবৃত্তি চলে গেছে নিবৃত্তিমার্গে। তুমি আত্মারাম।'

নটা চুয়ান্ন। চারপাশে ঝিম ঝিম নিঃসঙ্গ অন্ধকার। গঙ্গার পাঁতায় একটা কুকুর হাড় চিবোচ্ছে। মটাস মটাস শব্দ। রামকৃষ্ণ আসনে উপবেশন করলেন।

'এই মুহূর্তে তুমি আমাকে গুরু বলে স্বীকার করো শ্রীরামকৃষ্ণ ! তুমি আমার প্রিয় সন্তান। আমাদের সাধনার ধারায় শাস্ত্রের কাল থেকেই গুরুপরম্পরা চলে আসছে। আমার সাধনালব্ধ সমস্ত দুর্লভ নিঃশেষে তোমাকে দিয়ে যেতে চাই। আমি বহুপথ পরিভ্রমণ করে এসেছি বাবা। আমার ভেতর দিয়ে তোমার প্রকাশ হবে, দৈব নির্দেশ। কালে তুমি হবে জগদ্‌গুরু। তোমাকে মনে রাখবে কাল। আমি হারিয়ে যাব তোমার মধ্যে। তোমার এই দীক্ষা আমার তন্ত্র গুরুমুখী বিদ্যা। নত্বা কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বং ব্রহ্মাদি সুরবন্দিতং। গুরুঞ্চ জ্ঞানদাতারং কৃষ্ণানান্দন ধীমতা ॥ গুরু ছাড়া তন্ত্র সাধ্য নয়। গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দেবো গুরুর্গতিঃ। শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন ॥ মন্ত্রদাতা গুরু ধর্মাধর্ম পথ প্রদর্শক। অন্তিমে নিস্তার কারণ। মহাদেব রুষ্ট হলে গুরু ত্রাণ করতে পারেন, গুরু কুপিত হলে সর্বনাশ। রামকৃষ্ণ গুরু তোমাকে সর্বস্বদানে প্রস্তুত, তোমার ইষ্টকে স্মরণ করে অভীষ্ট গ্রহণে প্রস্তুত হয়। যেমন দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, নদীর মধ্যে গঙ্গা, পর্বতের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, রাজার মধ্যে ইন্দ্র, দেবীর মধ্যে দুর্গা, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ,

Scanned by CamScanner

সেইরকম সর্বশাস্ত্রের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্র প্রধান।'

'নাও, আচমন করো।'

পূজা আর হোম শেষ হল। এইবার বেলতলার আসনে জপ আর ধ্যান। বেলতলায় হোম হবে না, কারণ পাশেই সরকারি বারুদখানা। ভৈরবী রামকৃষ্ণকে ধরে ধরে নিয়ে চলেছেন বেলতলার দিকে। রামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ ভাবস্থ। কোন অলৌকিক লোকে আছেন বলা কঠিন। ত্রিমুণ্ডীর আসনে বসিয়ে ভৈরবী কানে কানে বললেন, 'বাবা, নানারকম ভয় আসবে, আসন ছেড়ো না। আমি আড়ালে আছি।'

জপে বসামাত্রই রামকৃষ্ণের মনে হল, পাশে কে একজন এসে বসেছে। একটু নড়তেই তার গায়ে গা লেগে গেল। কে সে? ভৈরবী নয়। ভৈরবীর স্পর্শে স্নিগ্ধতা, কোমলতা। এ কঠিন, কর্কশ। রামকৃষ্ণ ধ্যানে দেখছেন, ভীমকায়, ভীষণ দর্শন এক পুরুষ। তার হাতে একটা শূল। রক্ত নেত্র। নড়া মাত্রই ভয় দেখাচ্ছে, ঈশ্বরের পাদপদ্মে মনকে সদা নিবিষ্ট রাখ, চুম্বকে যেমন লোহা। হেলেছিস, কি দুলেছিস, এই দেখ্ আমার শূল। বুক ফেঁড়ে দোবো।'

রামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ নিবিষ্ট। সেই খট্ খট্ শব্দ। সমস্ত দেহসন্ধি তালাবন্ধ হচ্ছে। রামকৃষ্ণ এখন কাঠের পুতুল। দেহ নেই, চৈতন্য আছে। নীল সরোবরে প্রস্ফুটিত নীল পদ্মে মা বসে আছেন। হিরণ্যআলোকে চারপাশ উদ্ভাসিত। এ কোন লোক! পুলক, শিহরণ। সমস্ত রোমকূপ উন্মোচিত। ইড়া, পিঙ্গলায় বাতাস নেই, সুষুম্নায় সূক্ষ্ম গতি। হঠাৎ দেখছেন এক জ্যোতির্ময় দিব্য পুরুষ মূর্তি। সুষুম্নার মধ্যে অধিষ্ঠিত। অবিকল তাঁর মতোই দেখতে। ষড়চক্রের এক একটি পদ্মে জিহ্বা দিয়ে রমণ করছে। মূলাধার থেকে সহস্রার। অধোমুখ পদ্মগুলি একে একে ঊর্ধ্বমুখ হচ্ছে দিব্যজিহ্বার স্পর্শে। প্রতিটি পাঁপড়ি খুলে যাচ্ছে টান টান হয়ে। দ্বিদল, চতুর্দল, ষড়দল, সহস্রদল পদ্মসমূহ জিহ্বার শিশিরস্পর্শে হিল্লোলিত। দিব্যপুলকে শিহরিত শ্রীরামকৃষ্ণ। দিব্যজ্যোতিতে প্লাবিত। দিব্য সঙ্গীতে স্নাত। কোটি রমণসুখে রোমাঞ্চিত। অষ্টোত্তর শতবার জপ মাত্রায় পৌঁছোবার পূর্বেই রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ। দেহ নেই, বোধ নেই, চিত্ত নেই, চিন্তা নেই। শুধু জ্যোতিঃ। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসছে। মেঘের মতো, বিন্দুর মতো, প্লাবনের মতো।

ভৈরবী অতন্দ্র প্রহরী। নজর রাখছেন শিষ্যের দিকে। সাধারণ সাধককে আসন থেকে তুলে দূরে নিক্ষেপ করে। প্রাণ সংশয় হয়। মায়ের পাদপদ্ম থেকে মন টলে গেলেই বিপত্তি। আসনের চারপাশে ওঁত পেতে বসে থাকে শমন। মৃত্যুর কোলে বসে অমৃতের আরাধনা।

ভৈরবীর নাকে আসছে রামকৃষ্ণ দেহনিঃসৃত দিব্যগন্ধ। ভোর ফুটছে। শ্বেত শুভ্র নরকপালে টল টল করছে লাল কারণ বারি। হোম কুণ্ডে সাদা ছাই। পোড়া বেলপাতা। সিন্দুর চর্চিত ঘট। ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় রামকৃষ্ণ চোখ মেলে মৃদু হাসলেন। অনন্ত অসীম থেকে ফিরে এলেন সসীমে। শরীরের খিলগুলো সব একে একে খুলছে খট্‌খট্ শব্দে। শূলধারী অদৃশ্য। দিব্যপুরুষ মূলাধারে শয়ান।

হৃদয়ের অতিশয় কৌতূহল। কি হল রাতে। তন্ত্র। সে তো অতি কঠিন সাধন। সমস্ত আভরণ পরিত্যাগ করে স্ত্রী পুরুষের একত্র সাধন। মামা কী এই সবই করেছে কাল। ইচ্ছে ছিল গিয়ে দেখে আসবে। সাহসে কুলোয়নি। হলধারী কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। রামকৃষ্ণ কি করছে জানার দরকার নেই।

রামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হয়ে তেল মাখছেন। বুকের কাছটা জবাফুলের মতো লাল। চোখ দুটো পুরো খুলতে পারছেন না, বা তাকাবার ইচ্ছে নেই। গঙ্গায় অবগাহনের পর মায়ের মন্দিরে গেলেন। নৈবেদ্য সাজাচ্ছিল হলধারী। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন রামকৃষ্ণকে। কিছু একটা বলার ইচ্ছে ছিল, রামকৃষ্ণের ভাব দেখে মুখে কথা সরল না।

রামকৃষ্ণ আসনে বসলেন। কোনও দিকে কোনও দৃকপাত নেই। ডালি থেকে ফুল তুলে কখনও মাথায়, কখনও মায়ের শ্রীপদযুগলে। মায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছে। হলধারী শুনছেন, 'মা, যে কাপড়ে চোখ বাঁধা সেই কাপড়ে পিঠে আটটা ইসকুরুপ দিয়ে বাঁধা। অষ্টপাশ। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, কুল, শীল, শোক, জুগুপসা। গুরু খুলে না দিলে হয় না, মা!'

দেবমণ্ডলের ঘাটের নিরালা চাঁদনিতে বসে আছেন সাধিকা ভৈরবী। রামকৃষ্ণের পরিচয় তিনি পেয়ে গেছেন। মহা সাধক। সব দরজাই খোলা। কোথাও কোনও অর্গল নেই। কোনও মুদ্রারও প্রয়োজন হচ্ছে না। বীজমন্ত্রের ছোঁয়া মাত্রেই এক একটি জগৎ খুলে যাচ্ছে। চন্দ্র আর গিরিজা কিছুটা গেছে, তুমি যাবে শেষ পর্যন্ত। সেখান থেকে তুমি যখন ফিরে তাকাবে ধর্মের নতুন ইতিহাস তৈরি হবে। তুমি নতুন সংবাদ দেবে। সব সাধনকে একীভূত করে আর্ত মানুষের সামনে তুলে ধরবে সহজ এক পদ্ধতি, কোনও কিছু নয়, চলতে ফিরতে ধর্ম। তুমি তোমার বিশ্বাসে ঠেলবে, কপাট খুলে যাবে। ত্রৈ ধাতু থেকে এসেছে তন্ত্র। সাধককে ত্রাণ করে বলেই তন্ত্র নাম।

নিজের গুরুর কথা বারে বারে মনে পড়ছে। কেবল বলতেন, 'তোমাকে খুব একটা বড় কাজ করতে হবে যোগেশ্বরী। একজন আসছেন। তাঁর ভেতরে চৌষট্টিটা তন্ত্র পাতা মোড়া আছে। তুমি শুধু সেই পাতাগুলো খুলে খুলে দেখিয়ে দেবে। সেই শাস্ত্ররথের পশ্চাদ্দেশে চিরকাল তুমি জ্বলে থাকবে একটি লাল আলোর মতো। প্রথমে তিনি তোমার শিষ্য হবেন, পরে তিনি তোমার গুরু হয়ে তোমাকে পূর্ণ করবেন।'

'আমি কী পারব! কবে, কোথায় তিনি আসবেন!'

'তিনি এসেছেন। ঠিক সময়ে তুমি তাঁকে খুঁজে পাবে গঙ্গার পূর্বকূলে নতুন এক কালীবাড়িতে। উদ্যান পরিবৃত মনোরম স্থান। তিনিই তোমাকে দেখবেন। তিনিই তোমাকে ডেকে নেবেন। দূর ভবিষ্যৎ নয়, অদূরভবিষ্যৎ। তাঁর জন্যে তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে। তর্কবাদী সুধি সমাজে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শাস্ত্রাভিমানী, জড়বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তোমার শক্তি ও পাণ্ডিত্য দিয়ে লড়াই করতে হবে।'

ভৈরবীর তখনও দ্বিধা।

গুরু বলেছিলেন, 'সে কী যোগেশ্বরী। তন্ত্রের ক্ষমতায় তোমার অবিশ্বাস। তোমাকে বলেছি, তন্ত্রের মূল সাধনা হল কামসাধনা। তোমার দেহের মধ্যেই পরমসত্যের অবস্থান। আমাদের ধারার সাধকদের স্মরণ করো মেহারের সর্বানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, আগমবাগীশ, ব্রহ্মানন্দ গিরি, পূর্ণানন্দ, রত্নগর্ভ, অর্ধকালী। অর্ধকালীর কাহিনী তোমাকে শক্তি জোগাবে। ময়মনসিংহ জেলার পিণ্ডিবাড়ি গ্রামের দ্বিজদের পণ্ডিতের কন্যা। পিতার ছাত্র রাঘবের সঙ্গে বিবাহ হল। পাকস্পর্শের দিন নববধূ সকলকে অন্নপরিবেশন করছেন, হঠাৎ দমকা হাওয়ায় ঘোমটা উড়ে গেল। দুটো হাতই জোড়া। গুরুজনদের সামনে জিভ কেটে লজ্জা প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য, তাঁর দেহ হতে আরও দুটো হাত বেরিয়ে এসে ঘোমটা যথাস্থানে ঠিক করে দিল। সেই দিন সবাই তাঁকে চিনলেন। নাম রাখলেন অর্ধকালী। তিনি ছিলেন মহা ক্ষমতাশালী তন্ত্রসাধিকা। যোগেশ্বরী তোমার মধ্যেও সেই শক্তি নিদ্রিতা আছে। কুণ্ডলিনীশক্তি তন্ত্রসাধনায় জাগবেই। অষ্টসিদ্ধি তোমার বশীভূত হবে। সিদ্ধাই ব্যবহার করবে না। সাধকের পতন হয়। তবু প্রয়োজনে একটি দুটি প্রয়োগ কোরো। তা না হলে তন্ত্রের শক্তি প্রতিষ্ঠা পাবে না মা। অসমর্থ সাধকের হাতে পড়ে এই কুলধর্ম কৌলীন্য হারাবে। এ যে সম্পূর্ণ শ্বাসের ক্রিয়া। যোগেশ্বরী চর্যাপদে তোমাকে পড়িয়েছি,

উজ্জুরে উজ্জু ছাড়ি মা লেহুরে বঙ্ক।
নিয়ড়হি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক॥

সাধনার পথ হল সোজা, সোজাকে ছেড়ে বাঁকা পথে যাবে কেন, বোধি নিকটেই আছে, লঙ্কায় যাওয়ার কি দরকার! সুষুম্নায় যার বসবাস, জগৎকে সে নিংড়ে দিতে পারে। সহজিয়াদের দর্শন শোনো—চাটিলপাদের গানে আছে নদী, মাঝে অথৈ জল, দুই পাড়ে তার দঁক কাদা। এই অথৈ-এর মাঝখান দিয়ে যাওয়ার জন্যে একটা সাঁকো তৈরি করো। দুই পাড়ের মিলন হল। সাঁকোটা হবে কিসে! যে গাছের নাম মোহ, সেই মোহতরুকে অদ্বয়রূপ টাঙ্গি দিয়ে ফেঁড়ে পাটাতন হিসেবে ব্যবহার করো ওই সাঁকোটা তৈরির জন্যে। এই সাঁকোয় যখন চড়বে তখন ডান বাম কোনও দিকেই ঝুঁকবে না। এই মধ্যপথই হল সুষুম্না মার্গ, অবধুতী মার্গ। এই মধ্যগা নাড়ী পথেই অদ্বয় বোধিচিত্তের সাধনা করতে হয়। বামে ইড়া, ডানে পিঙ্গলা। এদের গতি নিম্নমুখী। একটি ধারায় সংসার সৃষ্টি, ভব, অপর ধারায় সংসারের সংহার, নির্বাণ। তোমার লক্ষ্য তাহলে কি হবে যোগেশ্বরী। প্রজ্ঞা যাকে বলা হয় পরমজ্ঞান, তাকে আশ্রয় করো। জগতে নেই কিছু, শুধু স্বার্থের কোলাহল। স্বার্থসীমাবদ্ধ সত্তা বিস্মৃত হও। বিশ্বজীবের কুশলের জন্য অপার করুণাবোধ আনো মনে। শূন্যতা আর এই করুণার মিলনে তৈরি হবে বোধিচিত্ত। সেই চিত্তকে মণিপুর থেকে ঊর্ধ্বগামী করে নিয়ে এস অনাহতে, অনাহত থেকে বিশুদ্ধ, সেখান থেকে তুলে দাও সহস্রারে।'

ভৈরবী অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এলেন। গ্রামের ভক্ত গৃহবধূরা সব এসেছেন। সকলেরই নানা সমস্যা। এই মেয়েদের একজনের নাম, কাত্যায়নী। মধ্যবয়সী, নিঃসন্তান। যৌবনটি এখনও ধরে আছে। দেহের আগুন যাই-যাই যৌবনে আরও উদগ্র হয়েছে। দেখতে, শুনতে ভালই।

কাত্যায়নী জিজ্ঞেস করলে, 'মা, তোমার শনি, মঙ্গলবারে ভর হয়!'

'শনি, মঙ্গলবার কেন গো, আমি সব সময় ভরে আছি।'

কাত্যায়নী বললে, 'তুমি বশীকরণ জানো মা?'

'জানলে?'

'আমার একটা উপকার করবে?'

Scanned by CamScanner

'বলো কি উপকার ?'

'সে যে সকলের সামনে বলা যাবে না !'

'যা সকলের সামনে বলা যায় না, তা পাপ। আমার ধর্মে পাপের স্থান নেই মেয়ে। একটা কথা বলি, শেষ জীবনে ডাইনি বুড়ি না হয়ে দেবীর মতো হওয়াটাই কি ভাল নয়! নিজের স্বামীতেই থাক। পরপুরুষের পেছনে ছুটে কি হবে! সব এক। যার পেছনে ছুটছ তার বউ তো এখানেই রয়েছে। যে তোমাকে দিদি বলে সম্মান করে তার সংসারটা নাই বা ভাঙলে! নিজেকে সামলাও। তোমার তো অপঘাতে মৃত্যু হবে। সেটার কি ব্যবস্থা করলে!'

ভৈরবী হঠাৎ উগ্রমূর্তি ধারণ করে বললেন, 'যাও, এখান থেকে চলে যাও। পানের সঙ্গে যা দিয়ে বশীকরণ করতে চাইছ, ওতে হয় না। যাতে হয় একমাত্র সিদ্ধতান্ত্রিক তা জানেন, আমিও জানি। প্রকৃত তান্ত্রিক তা প্রয়োগ করেন না। সাধনার হানি হয়।'

কাত্যায়নী ভয়ে কেমন হয়ে গেল। ধরা ধরা গলায় বললে, 'মা আমার কি হবে ?'

'ওই যে রাসমণির কালীবাড়ি, মা ভবতারিণী আছেন ওখানে, তাঁকে ধরো।'

আর যাঁরা এসেছিলেন, অন্য কথা বলতে, দুটো সুখদুঃখের কথা, পরিবেশটা বিশ্রী হয়ে গেল দেখে, তাঁরা সব উঠে গেলেন। কাত্যায়নী বসে রইল একা, একঘরে হয়ে।'

ভৈরবী হঠাৎ শান্ত হয়ে বললেন, 'অনেক পাপ করেছিস। ভাশুরের বিছানায় শুয়েছিস। কালীঘাটে গিয়ে অচলানন্দকে ধরেছিস। সেখানে ভৈরবীচক্রে বসেছিস। বল, ঠিক কি না ?'

কাত্যায়নী বিমূঢ়ের মতো বললে, 'মা, তুমি জানলে কি করে ?'

'আমি যে তোকে পড়ছি রে, বইয়ের মতো। বাঁচতে চাস ?'

'কে না বাঁচতে চায় মা, ভোগ করে বাঁচতে চাই। ওটাই আমার স্বভাব।'

'মা কালীকে ভালবাসিস ?'

'বাসি মা।'

'শিবকে ?'

'আরও বেশি।'

'সাতদিন পরে আমার কাছে আসবি। তোকে আমি মুক্তির পথ বলে দোবো। এই সাতদিন পবিত্র থাকবে। স্বামী ছাড়া আর কারও সঙ্গে সহবাস করবে না।'

কাত্যায়নী চলে যাচ্ছে। ভৈরবী পেছন থেকে দেখছেন। শরীরের ঠমক। আকর্ষণী শক্তি। আবার ডাকলেন।

কাত্যায়নী ভয়ে ভয়ে ফিরে এল। ভৈরবী বললেন, 'তুমি ওদের বাড়ির জমিতে শেয়ালের হাড় পুঁতেছ ?'

কাত্যায়নী মাথা নিচু করে রইল। ভৈরবী বললেন, 'ছি, ছি। আজই তুমি তুলে গঙ্গার জলে ফেলে দেবে।'

আজ রাতে ভৈরবী বসেছেন রামকৃষ্ণের সঙ্গে যুগ্ম সাধনায়। যৌথ সাধনায় কম্পন ভাল হয়। আসনে বসার আগে রামকৃষ্ণ বলছিলেন, 'জানো, আজ আমার বীর ভাব। এই দেখো আমি আকাশ-পাতালজোড়া হাঁ করেছি। এইবার আমি মা বলে ডাকব। আজ আমি মাকে পাকড়ে আনব, যেন জাল ফেলে মাছ হড়হড় করে টেনে আনা!'

রামকৃষ্ণ গান ধরলেন :

এবার কালী তোমায় খাব।
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার।
গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় মা-খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুটোর একটা করে যাব।

ভৈরবী আগুন জ্বেলেছেন। আগুনের সেই আভায় রামকৃষ্ণের উজ্জ্বল, উন্মাদ মূর্তি দেখছেন। সাধক, সাধনা অনেক দেখেছেন এমনটি আগে কখনও দেখেননি। ভৈরবী যে আগুন জ্বেলেছেন সেই আগুনে চাপিয়েছেন মড়ার মাথার খুলি। শবের খর্পরে মাছ রাঁধছেন, মাকে নিবেদন করবেন। খুলির ভেতরের দিকে বাইরের আগুন চুলের রেখার মতো হিল হিল করছে। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত। বাতাসের দাপটে আগুনের শিখা হইহই করছে, তার ওপর লেবুরাঙা একটি খর্পর। পোড়া মাছের গন্ধ। মৎস্যের মধ্যেও শাস্ত্র বলছেন, উত্তম, মধ্যম ও অধম আছে। উত্তম হল, শাল, বোয়াল ও রোহিত। ভৈরবী এনেছেন বোয়াল। তেল আর মশলা সহযোগে রান্নার সুগন্ধে পঞ্চবটী আমোদিত।

রন্ধন শেষ করে ভৈরবী বললেন, 'বাবা, তুমিও এসো। তোমাকেও রাঁধতে হবে মায়ের ভোগ।'

রামকৃষ্ণের ইতস্তত ভাব দেখে ভৈরবী আদেশের গলায় বললেন, 'উঠে এসো। শাস্ত্র আমাদের মানতেই হবে।' খুব একটা অসুবিধে হল না; কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যায় নিপুণ।

তর্পণে বসলেন দুজন। পাশাপাশি গাত্রসংলগ্ন। ধূপ, দীপ, ধুনো, মন্ত্রোচ্চারণ। তন্ত্রোক্ত দেবীদের একে একে উপাসনা। রূপের মাঝে অরূপের উদ্বোধন। পঞ্চভূতের দেহ অবলম্বন করে দেহাতীত, দিব্যজগতে আরোহণ। সব আছে অথচ কিছুই নেই। সবেতেই সেই এক, একেতেই সেই সব। 'বাবা, ঋষ্যাদিন্যাস করো। বলো, শক্‌ত্রির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ভুবনেশ্বরী দেবতা হকারো বীজং ঈকারঃ শক্তিঃ রেফঃ কীলকং চতুর্বর্গসিদ্ধর্থে বিনিয়োগঃ। হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠা করো, উদিত দিনকরের ন্যায় দেহকান্তি, উদ্যদ্দিনকরদ্যুতি নিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়সংযুক্তাং।'

রামকৃষ্ণ অরূপে তলিয়ে গেলেন।

হঠাৎ দেখছেন, সম্মুখস্থ বেদিতে যে ত্রিকোণ যন্ত্রটি অঙ্কিত করে, ফুল, বিল্বপত্রাদি বীজমন্ত্রাদি স্থাপিত হয়েছিল, সেটি ভ্রূমধ্যে চলে এসেছে। অগ্নিগর্ভ একটি ত্রিকোণ। সেই ত্রিকোণ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে লকলকে অগ্নিশিখা। সৃষ্টি সমারোহের একপাশে একটি বিন্দুর মতো দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। আর এক একটি স্ফুলিঙ্গে বেরিয়ে আসছে এক একটি ব্রহ্মাণ্ড। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড। এই তো সেই ব্রহ্মযোনি!

ভৈরবী পাশে বসে অনুভব করছেন, রামকৃষ্ণের সর্বাঙ্গে পুলক। ভৈরবী জানেন শিষ্য কী দর্শন করছেন। অষ্টসিদ্ধি তাঁর বশীভূত। তিনি ইচ্ছে করলে অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে পারেন। দেহ ছেড়ে দূর ভ্রমণে যেতে পারেন। অদৃশ্য হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। রাজাকে বশীভূত করে রাজঐশ্বর্য ভোগও করতে পারতেন; কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় তিনি জানেন। রামকৃষ্ণের জন্যেই দেহধারণ, সাধনা। সমর্পণ।

ত্রিভূজাকৃতি ব্রহ্মযোনি ক্রমে নিরাকার জ্যোতিতে রূপান্তরিত হল। ভুবন সমাচ্ছন্ন। দেখছিল, শিব আর শক্তির লীলা। তাঁরা মহা উল্লাসে রমণ করছেন। মানুষ জীবজন্তু তরুলতা, কীটপতঙ্গ, সর্ব আধারে মৈথুনরত শিবশক্তি। শক্তির বীজনে এক বহু হয়ে যাচ্ছে। সর্বত্র, প্রাণ, প্রাণ, বিঘোষিত প্রাণ। স্ফুলিঙ্গের পর স্ফুলিঙ্গ। উড়ছে, ভেসে যাচ্ছে। সেই খদ্যোতের মধ্যে নিজেকেও দেখছেন। ক্ষুদ্র সত্তা ব্রহ্মাণ্ড সত্তায় পরিণত হয়েছে। হঠাৎ দেখছেন, বিশাল, বিপুল, চরাচর ব্যাপ্ত থকথকে, টলটলে এক পারার হ্রদ। আকাশ রুপো হয়ে গলে গলে পড়ছে। রামকৃষ্ণ মৃদুস্বরে উঃ করে উঠলেন।

ভৈরবী সদা সচেতন।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণের মেরুদণ্ডে মণিপুর চক্রে একটি আঙুল ঠেকালেন। পঞ্চবটীতলে অপূর্ব দৃশ্য এক। জননী সন্তানকে কোলে নিয়ে বসেছেন। সাধনার পীযূষ পান করাচ্ছেন যতনে, সোহাগে।

রামকৃষ্ণ চোখ মেলেই বললেন, 'কী সব দেখলুম! কী সব দেখলুম!'

ভৈরবী বললেন, 'বেলতলায় বসার আগে তান্ত্রিক আচার সম্পূর্ণ করো। কারণ তোমাকে গ্রহণ করতে হবে না। স্পর্শ করে গন্ধ নাও।'

রামকৃষ্ণ আদেশ পালন করলেন।

ভৈরবী এই বার তাঁর হাতে তুলে দিলেন শবের খর্পর। খর্পরে পাঠীন মৎস্য, অর্থাৎ বোয়াল মাছ। রামকৃষ্ণের কোনও বিকার নেই। নিঃশব্দে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। ভৈরবী তাঁকে নিয়ে গেলেন বেলতলার আসনে। অন্ধকারে কী একটা চলে গেল। অনেকক্ষণ ধরে একটা সর সর শব্দে বোঝা গেল, বেশ বড় একটা সাপ। কেউ গ্রাহ্য করলেন না। সিঁসিঁ করে একটা পাখির বাচ্চা শব্দ করছে কোনও একটা গাছের মাথায়।

রামকৃষ্ণ আসনে বসলেন।

ভৈরবী বললেন, 'বাবা, পাশমুক্ত হও। ঘৃণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগুপসা চেতি পঞ্চমী। কুলং শীলং তথা জাতি রষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥ ঘৃণা শঙ্কা ভয় লজ্জা জুগুপ্‌সা কুল শীল আর জাতি। অষ্টপাশ। ছিঁড়ে ফেল। পাশবদ্ধঃ পশুর্জ্ঞেয় পাশমুক্তো মহেশ্বরঃ।। পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। তুমি শিব, তুমি শিব, তুমি শিব। তোমার মূলাধারে দর্শন করো, একটি সুন্দর ত্রিকোণ। তার মধ্যে আছে সুলক্ষণ কামবীজ আর সেই কামবীজোদ্ভব স্বয়ম্ভু লিঙ্গ। সেই লিঙ্গের ওপর হংসাশ্রিতা চিৎকলার ধ্যান করো, আর ধ্যান করো সেই স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে যাকে বেস্টন করে অবস্থান করছেন কুণ্ডলিনী। তেজস্বরূপিণী কুণ্ডলিনীকে ধ্যানের সাহায্যে মূলাধারাদি চক্র ভেদ করিয়ে হংস-মন্ত্রসহ সুষুম্নাপথে সহস্রারে নিয়ে যাও।'

এই পথে রামকৃষ্ণ এতবার যাওয়া আসা করেছেন, পথটি এত সড়গড়, যে নিমেষে পৌঁছে গেলেন সহস্রারে। সেখানে সদাশিবের সঙ্গে দেবীর ক্ষণমাত্র রমণ। সেই মিলনে তৎক্ষণাৎ অমৃতের নিঃসরণ। লাক্ষারসসমন্বিত সেই অমৃত। শ্রীরামকৃষ্ণের গাত্র নির্গত দিব্য গন্ধে ভৈরবী বুঝলেন সহস্রারে মিলন হয়েছে।

Scanned by CamScanner

ধ্যানের অতলে তলিয়ে থাকতে থাকতেই রামকৃষ্ণ দেখছেন, পাপ পুরুষ এসেছে, 'লড়ায়ের শোরার' রূপ ধরে। রামকৃষ্ণ দেখছেন। একবার এদিকে যাচ্ছে, একবার ওদিকে যাচ্ছে। নানা ভোগের বস্তু থরে থরে সাজাচ্ছে। টাকার পাহাড়, দামি শাল, থালা থালা সন্দেশ। কোথা থেকে নিয়ে এল দুজন মেয়ে মানুষ। সুন্দর চেহারা। তাদের একজনের নাকে আবার ফাঁদি নথ। চোখের ইশারায়, দেহের প্রদর্শনে কাম জাগাতে চাইছে। এসো, এসো রামকৃষ্ণ, ভোগ করো। সব তোমার। শুষ্ক সাধনে কি পাবে! এই দেখো শরীর, এই দেখো ঐশ্বর্য, ওই দেখো সিংহাসনের প্রতীক লালমুখো গোরা।'

রামকৃষ্ণ দেখছেন, সন্দেশকে দেখছেন বিষ্ঠা। মেয়েদের ভেতর বার সব দেখতে পাচ্ছেন, যেমন কাঁচের ঘরে সমস্ত জিনিস বার থেকে দেখা যায়,—নাড়ীভুঁড়ি, বিষ্ঠা মূত্র, হাড়মাংস, ক্রিমি, কফ নাল। রামকৃষ্ণের মন টলল না। মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে মজে আছে। রামকৃষ্ণ আকুল হয়ে মাকে ডাকছেন। মা দেখা দিলেন। রামকৃষ্ণ বললেন, মা! ওকে কেটে ফেলো।

মায়ের সেই রূপ—সেই ভুবনমোহিনী রূপ
চাউনিতে যেন জগৎটা নড়ছে!
কোটি কোটি কলানাথ—বিমলন্মুখমণ্ডলাম
মুখমণ্ডল হতে কোটি কোটি শশধর বিগলিত হচ্ছে।

ভৈরবী শুনতে পাচ্ছেন, রামকৃষ্ণ ভেতরে ভেতরে খিল খিল করে হাসছেন।

॥ নয়॥

মথুরবাবু আর অচলানন্দ প্রায় একই সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঢুকলেন। আগে এল মথুরবাবুর রাজকীয় জুড়িগাড়ি। তার পরে দলবল নিয়ে অচলানন্দ অবধূত। তান্ত্রিক, বীরাচারী। হুগলীর কোতরঙে থাকেন। তন্ত্রে খুব নামডাক। খুব ক্ষমতা। অনেক শিষ্যশিষ্যা। নাম, যশ, অর্থ, প্রতিপত্তির দিকে টান। প্রায় সব সময় কারণ করে থাকেন। শিষ্যরা বাবা বলতে অজ্ঞান।

অচলানন্দকে দেখে মথুরবাবু বললেন, 'কী কাণ্ড! দক্ষিণেশ্বরে তন্ত্রের জোয়ার এল। ওদিকে মা ভৈরবী, এ দিকে বাবা অচলানন্দ, আবার গৌরী পণ্ডিত।'

অচলানন্দ বললেন, 'এ সবই আপনার পূর্বজন্মের সুকৃতি।'

সদলে পঞ্চবটীতে প্রবেশ করে দেখলেন, রামকৃষ্ণ পোস্তার ওপর ঘুরছেন, পেছনে হৃদয়। হৃদয়ের হাতে গেরুয়া রঙের পাট করা একটি গামছা আর এক হাতে তেলের শিশি।

হৃদয় অনুনয় বিনয় করছে, 'বেলা হয়ে গেল, রোদ চড়ে গেল, এখুনি বান এসে যাবে। চানটা করে নিয়ে তারপর যত পারো নাচো। সেজবাবু আজ এসেছেন। আবার দলবল নিয়ে অচলানন্দ।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আমি যখন যে ভাবের সাধনা করব, তখন সেই ভাবের সাধকরা সব আসবেন। ঝড় বয়ে যাবে। মা আমাকে বলেছেন।'

'মা তোমাকে সব বললেন; কিন্তু সময়ে চান করার কথাটা বললেন না!'

রামকৃষ্ণ হৃদয়ের শেষ কথা শুনলেন কি শুনলেন না, হঠাৎ পোস্তার ঢাল বেয়ে সড়সড় করে নেমে গেলেন গঙ্গার পাঁতায়। হৃদয় পেছন পেছন টাল খেতে খেতে নামছে আর বলছে, 'করো কী, করো কী। আবার পাগল হলে!'

পাগলামির পুরোটা তো তখনও দেখা হয়নি। গঙ্গার পাঁতা ধরে রামকৃষ্ণ চলেছেন দিশাজঙ্গলের দিকে।

হৃদয় জিজ্ঞেস করছে, 'গাড়ুটা তা হলে নিয়ে আসি!'

কোনও উত্তর নেই। রামকৃষ্ণ নিচু হয়ে অন্যের পরিত্যক্ত বিষ্ঠায় আঙুল ঠেকাতে চলেছেন।

হৃদয় চিৎকার করছে, 'ছি ছি, ও কী করো, ও কী করো!'

ততক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণ আঙুল দিয়ে বিষ্ঠা স্পর্শ করে সেই আঙুল নিজের জিভে ঠেকিয়েছেন।

হৃদয় স্তম্ভিত, 'এ কী করলে? তুমি শেষ পর্যন্ত পিশাচ হলে!'

রামকৃষ্ণ আনন্দে নৃত্য করছেন আর বলছেন, 'বলে আয়, বলে আয়, বিষ্ঠা আর চন্দন এক বোধ হয়েছে আমার। কোনও তফাত নেই।'

হৃদয় বললে, 'তাকে বলতে যাব কেন?'

'আমাকে বলেছিল, নিজের মল সকলেই জিভে ঠেকিয়ে ঢং করে বলতে পারে বিষ্ঠা আর চন্দন এক করে ফেলেছি।' রামকৃষ্ণ মায়ের কোলে ঝাঁপ দেওয়ার মতো জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

ভৈরবী বলেছিলেন, 'বাবা, ঠিক ঠিক অদ্বৈতজ্ঞানে সব অভেদ বোধ হবে। রামপ্রসাদ গাইতেন, শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্যঘরে করে শুবি/ (তাদের) দুই সতীনে পীরিত হলে, তবে শ্যামা মাকে পাবি॥'

বিল্বমূলে ধ্যানে দর্শন হল, বিষ্ঠামূত্র, অন্নব্যঞ্জন, সব রকম খাবার জিনিস—সব পড়ে রয়েছে। হঠাৎ ভেতর থেকে জীবাত্মা বেরিয়ে গিয়ে একটি আগুনের শিখার মত সব আস্বাদ করলে, যেন জিহ্বা লকলক করতে করতে সব জিনিস এক একবার আস্বাদ করলে—বিষ্ঠা মূত্র সব আস্বাদ করলে। দেখালে সব এক—অভেদ।

মথুরবাবু বেশ কিছুদিন পরে রামকৃষ্ণকে দেখছেন। অবাক হয়ে দেখছেন, কী দেহকান্তি। সর্ব অঙ্গ দিয়ে জ্যোতি বেরোচ্ছে। স্থূল হয়েছেন। থপথপ করে হেঁটে আসছেন। একটা নতুন মানুষ তৈরি হয়েছে।

ভৈরবী জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কী করলে?'

'আমি করিনি, করেছে সাধনা। তুমি যে কাঠের পিঁড়েটা দিয়েছিলে, সেটায় রামকৃষ্ণ আর আঁটছে না। আর একটা বড় পিঁড়ে তৈরির হুকুম দাও।'

অচলানন্দ বসে আছেন। রক্তাম্বর পরিহিত। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

রামকৃষ্ণ ভৈরবীকে বললেন, 'আজ রাতে পঞ্চবটীতে খুব হবে গো! হৃদয়কে বলি রাতের সাধনার সব ব্যবস্থা করতে।'

হৃদয় পান সাজছিল। ঘরের ভেতর থেকেই বললে, 'কী বলছ?'

'অচলানন্দ এসেছে।'

'দেখেছি।'

'আমার আলাদা ভাঁড়ার থেকে জিনিসপত্তর সব বের করে দিস।'

'ছোলাভাজা তো আর ভাঁড়ারে নেই, দোকানে আছে।'

'পীতাম্বরের কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিস।'

'আর কারণ?'

'বোতল ওখানেই পাবি, সেজবাবু গতবার কিনে রেখে গেছে।'

অচলানন্দ দূরে মথুরবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। এ দিকে এগিয়ে এলেন। রেশমের পোশাক রোদে ঝলমল করছে। পায়ে শুঁড় তোলা চটি। আঙুলে আঙুলে নানা রকমের আঙটি। শরীরে দরবারি আতরের গন্ধ।

ভৈরবীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'শিষ্যটি কেমন?'

'খুব ভাল।'

'আমাদের শাস্ত্র পুরোপুরি মানে না।'

ভৈরবী বললেন, 'কেন? একে একে আমি তো সবই করাচ্ছি।'

'বীরাচারে এসেছে?'

'আসবে।'

'অ্যায়! আসবে না। সে সাহস নেই। বীরভাবে সাধন ও মানবে না, শিবের কলম ও মানবে না। বলে, আমার সন্তানভাব। শিব তন্ত্র লিখে গেছেন, তাতে সব ভাবের সাধন আছে—বীরভাবেরও সাধন আছে।'

ভৈরবী বললেন, 'আছে, তবে দিব্যভাবের সাধনাও তো আছে। শাস্ত্রেই আছে।'

অচলানন্দ তাচ্ছিল্যভরে বললেন, 'অশক্তের সাধনা!'

ভৈরবী বললেন, 'সাধনা বড় না, মুক্তি বড়? উপায় বড়, না প্রাপ্তি বড়?'

অচলানন্দ বললেন, 'যুদ্ধ না করেই যুদ্ধ জয় করেছি বলা যায়। ইন্দ্রিয় আছে, কামনাবাসনা আছে, আমি বীর, আমি বশে আনব। ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীতে চলে যাব। নিজে বীরাচারীতান্ত্রিক হয়ে এ কথা অস্বীকার করতে পারেন?'

'অবতারের ক্ষেত্রে মানুষের নিয়ম কি খাটে!'

'অবতার? কে অবতার? দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ!' অচলানন্দ হা হা করে হাসছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গায়ে আঙুল স্পর্শ করে বললেন, 'এ কী, তুমি হাসছ কেন?'

অচলানন্দ হাসি নিমেষে বন্ধ। চোখ দুটো জলে ভরে গেল। মৃদুস্বরে একটি কথাই বললেন, 'চিনতে পারিনি।'

অচলানন্দ চলে যেতেই ভৈরবী বললেন, 'জমতে না জমতেই খরচ?'

গুরুর মধুর তিরস্কারে রামকৃষ্ণের মুখটি কাঁচুমাচু হয়ে গেল।

ভৈরবী আদর করে বললেন, 'বাবা, তুমি এমন স্তরের সাধক, তোমার ভেতর অসীম শক্তি আসবে—সিদ্ধাই। কখনও প্রয়োগ কোরো না, তা হলে তোমার হানি হবে।'

এক কর্মচারী এসে বললে, 'সেজোবাবু ডাকছেন।'

মথুরবাবু তাড়াতাড়ি ফরসির নলটা ফেলে দিয়ে বললেন, 'এসো, এসো,

Scanned by CamScanner

কতদিন তোমাকে দেখিনি।'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'আমার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে।'

'তা খাও না, কত খাবে খাও। ভোলা ময়রার দোকান থেকে মিষ্টি এনেছি।'

মথুরবাবুর আদেশে ভৃত্য এক চ্যাঙারি মিষ্টি রামকৃষ্ণের সামনে রেখে গেল।

রামকৃষ্ণ বালক গোপালের মতো একটি করে তুলছেন আর মুখে পুরছেন।

মথুরবাবু আর ভৈরবী অন্য আলোচনায় ব্যস্ত।

মথুরবাবু বলছেন, 'ভাবছি অন্নমেরু করব।'

ভৈরবী বললেন, 'ভাল ভাবনা। রামকৃষ্ণের পুরশ্চরণ হল, একটি অঙ্গ ব্রাহ্মণভোজন বাকি আছে।'

'তাই বোধহয় মা মাথায় এনে দিলেন। সব আয়োজনই সম্পূর্ণ। বিরাট উৎসব হবে, যাত্রা, গান। ভাল হবে না?'

রামকৃষ্ণ নিজের মনেই বললেন, 'খুব ভাল, খুব ভাল।'

এই অবস্থায় রামকৃষ্ণকে যে দেখবেন, তাঁরই মনে হবে আত্মভোলা এক বালক।

ভৈরবী জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় হবে?'

'কেন নাটমন্দিরে? সুন্দর জায়গা। অনেকদিন পরে বিরাট একটা ব্যাপার হবে। হাজার মণ চাল, হাজার মণ তিল, স্বর্ণ কাঞ্চন, মোহের আর রুপোর টাকা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দান করা হবে। সহচরীকে বলেছি কীর্তন করবে, রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান। সারারাত যাত্রা।'

রামকৃষ্ণ খাচ্ছেন আর বলছেন, 'আহা, খুব ভাল, খুব ভাল।'

মথুরবাবু হঠাৎ বললেন, 'এ কী করলে, সব সন্দেশ খেয়ে ফেললে?'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'খাব না, তুমি তো আমাকে খেতেই বললে!'

'তুমি পঞ্চাশটা সন্দেশ একা খেয়ে ফেলবে স্বপ্নেও ভাবা যায় না। তোমার তো পাখির আহার! ভেবেছিলুম গোটা দুই খেয়ে প্রসাদ করে দেবে!'

'আমার তো কিছুই হল না, মনে হচ্ছে আরও খাই।'

মথুরবাবু ভৈরবীকে বললেন, 'বোধহয় খুব অপরাধ করে ফেললুম না! পেটরোগা মানুষ। ঝোল-ভাতই সহ্য হয় না!'

ভৈরবী আশ্বাস দিলেন, 'কিচ্ছু ভেবো না। আমার যতদূর মনে হচ্ছে, এটা একটা লক্ষণ, সাধকদের হয়। এর নাম বিপরীত ক্ষুধা। দেখা যাক। আচ্ছা, আমি ধান্যমেরু সম্পর্কে একটা কথা ভাবছি।'

'কী কথা! অনেক খরচ!'

'না, মা তোমাকে দিয়েছেন, দিচ্ছেন, তুমি ভাল কাজে খরচ করবে। আমি ভাবছি, আর কয়েকদিন পরেই রামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনা শেষ হবে। সে সিদ্ধ হবে। সিদ্ধোৎসবটাই অন্নমেরু হলে কেমন হয়!'

'সব চেয়ে ভাল হয়, আমিও ততদিনে একবার জমিদারি থেকে ঘুরে আসি।'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তোমার অন্নমেরু যবে হবে তবে হবে। এরা তো দুপুরের এক থালা অন্নই দিতে পারছে না।'

ভৈরবী বললেন, 'ওঠো, তোমাকে খাইয়ে আনি।'

রামকৃষ্ণ সুষনি শাক ভালবাসেন। ডুমুর ভালবাসেন, মৌরলা মাছ, শিঙ্গি মাছ, পোস্ত ভালোবাসেন। ভৈরবী আলাদাভাবে সব রান্না করেছেন। হৃদয়ের মুখ ভার। এই সাধিকাটিকে তার সহ্য হচ্ছে না। রামকৃষ্ণকে ছিনিয়ে নিয়েছে। কর্তৃত্ব চলে গেছে হঠাৎ কোথা থেকে ভেসে আসা এই ভৈরবীর হাতে। সব সময় যেন আগলে রেখেছে।

ভৈরবী রামকৃষ্ণের গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে দিচ্ছিলেন।

হৃদয় উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলে, 'এ আবার কী! এই গরমে চাদর?'

ভৈরবী এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে বললেন, 'বাবা, যে বিষয়ে কিছুই জানো না, সে ব্যাপারে কথা না-ই বা বললে!'

হৃদয় রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পাগলের পাগল হতে যেটুকু বাকি ছিল এইবার সেইটুকুও হয়ে যাবে। গঙ্গার পাঁতা থেকে যে গু তুলে খায়, সে মানুষ। কামারপুকুরে এই খবর ছড়িয়ে পড়লে কী হবে!

রামকৃষ্ণ ভৈরবীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আমাকে চাদর জড়িয়ে রাখছ কেন?'

'তোমার এই দেহকান্তির দিকে সকলের নজর পড়ছে। একে ঢেকে রাখো। এই উজ্জ্বলতা আরও আরও বাড়বে। সাধন বিভূতি গুপ্ত রাখতে হয়, গোপনে অতি যতনে।'

'অচলানন্দ কী সব বলে?'

'বলতে দাও না, অচলানন্দের সাধনা অন্য কারণে। ওর স্তর আলাদা বাবা। ও ওইটাকেই সার করেছে,

বিনা মাংসেন যা পূজা বিনা মদ্যেন তর্পণম্।
বিনা শক্ত্যা তু যৎপানন নিষ্ফলং কথিতং প্রিয়ে॥

'তোমাকে তত্ত্বটা বোঝাই। বোঝানো দরকার, তত্ত্ব মেনে সাধন করলে আরও আনন্দ। শুকদেবের কথাই ধরো। তিনি তো ব্রহ্মবিদ হয়েই জন্মেছিলেন। তাঁর কিছু জানার বাকি ছিল না। তবু ব্যাসদেব শাস্ত্র মেলাবার জন্যে শাস্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন। কৌলাচার কতটা কঠিন, তুমি নিজেই তা অনুভব করবে, যখন করবে। কৌলসাধকের বামে রমণকুশলা রমণী, দক্ষিণে পানপাত্র, সাধকের সামনে মরিচযুক্ত উষ্ণ শূকরমাংস। সাধকের ললিত রমণীয় বীণা। এই প্রপঞ্চের মধ্যে বসেও মন টলবে না। এ কেমন জানো বাবা, নিসর্গদুর্শমঃ কৌল। কৃপাণধারাগমনাৎ ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ। ভুজঙ্গধারণান্নুনমশক্যং কুলবর্তনম্। কৃপাণের ধারমুখের ওপর দিয়ে হাঁটা, বাঘের গলা জড়িয়ে ধরা, শরীরে সাপ জড়ানো, এ সবের চেয়েও কুলমার্গের অনুসরণ দুষ্কর।'

ভৈরবী রামকৃষ্ণকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ সব কথা শুনতে তোমার কেমন লাগছে?'

সোল্লাসে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ভীষণ ভাল লাগছে, বলো আরও বলো।'

ভৈরবী বললেন, 'আগমে শিব কী সুন্দর বলেছেন শোনো। সংস্কৃত ভাষা কী মধুর দেখো,

মদ্যপানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভতে বৈ।
মদ্যপানরতাঃ সর্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ॥

মদ খেলেই যদি মানুষের সিদ্ধিলাভ হয়, তা হলে যত সব মদখোর পামর সিদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। সেই রকম মাংসভক্ষণ! মাংস খেলেই যদি পুণ্যগতি লাভ হয় তা হলে দুনিয়ার সব মাংসাশী পুণ্যভাজন হয়ে যায়। আর স্ত্রীসম্ভোগ।

শক্তিসম্ভোগমাত্রেণ যদি মোক্ষো ভবেত বৈ।
সর্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ সু স্ত্রীনিষেবণাৎ।।

স্ত্রীসম্ভোগকারী যত জীব আছে সব মুক্ত হয়ে যাবে। অত সহজ নয় গদাধর!'

শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যানে নিজের দর্শনের কথা বলতে লাগলেন, 'লড়ায়ে গোরার রূপ ধরে এল। সামনে সব ভোগের জিনিস সাজালে, টাকার পাহাড়, সন্দেশের পাহাড়, জামদানি শাল, আর এনেছিল দুই রমণী। খুব যৌবন। একজনের নাকে ফাঁদি নথ। বলছে, এসো। এ সব তোমার। মেয়ে দুটো খুব লোভ দেখাতে লাগল।'

'তুমি কী করলে?'

'আমি আমার মনকে জিজ্ঞেস করলুম, মন! তুই এ সব ভোগ করতে চাস। সঙ্গে সঙ্গে মন দেখিয়ে দিলে, সন্দেশ—গু, টাকা—খোলাম কুঁচি, শাল—শবের চাদর, ফাঁদালো রমণী—নাড়ী, ভুঁড়ি, বিষ্ঠা মূত্র, হাড়মাংস, ক্রিমিকফ। মন মায়ের পাদপদ্মে যেমন ছিল, ঠিক সেইরকমই রইল।'

'তুমিই ঠিকই করেছ বাবা, তবে তন্ত্রে ঘৃণা নেই। সৃষ্টির মূলে শিব ও শক্তি। তিলে যেমন তেল থাকে সেই রকম শক্তি সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। তন্ত্র নারীকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। বেদে নারীর অধিকার নেই, তন্ত্রে নারীর অনেক ভূমিকা। বাবা! পঞ্চম কারের মধ্যে পঞ্চমমকারের সেবাতেই মানুষের সবচেয়ে বেশি আনন্দ। অস্বীকার করার উপায় নেই। এই আনন্দের স্বরূপ হল ব্রহ্মানন্দ। নিরুত্তরতন্ত্র বলছেন, স্ত্রীপুংসো সঙ্গমে সৌখ্যং জায়তে তৎপরমংপদম। স্ত্রীপুরুষের সঙ্গমে যে আনন্দ তাই পরমপদ অর্থাৎ ব্রহ্ম। এই ক্ষণ আনন্দকে চির আনন্দে পরিণত করতে হবে। ভাললাগার বস্তুটিকে ধরে স্রষ্টার কাছে ভেসে যেতে হবে। রূপ থেকে অরূপে। কুণ্ডলিনী সর্পাকৃতি। মূলাধারে নতমুখী, নিদ্রিতা। অধম অবস্থা। যখন তিনি জাগেন, আরোহণ করেন, তখন আনন্দের প্লাবন। আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ। এই জগৎটিকে মাথায় ধরে আছেন কামস্বরূপিণী নাগ বাসুকী।'

মথুরবাবু বিশ্রামান্তে কুঠিবাড়ির বারান্দায় একটি আরাম কেদারায় বসেছেন। অপরাহ্ণবেলার ফুরফুরে বাতাস। কিছুই ভাবছেন না। বসে আছেন অলস ভাবে। এমন সময় ভৈরবী এলেন। মথুরবাবু গুছিয়ে বসে সসম্ভ্রমে বললেন, 'কী হয়েছে মা?'

'রামকৃষ্ণের আর একটি লক্ষণ দেখা দিয়েছে। শাস্ত্রে এটিকে বলে বিপরীত ক্ষুধা।'

'বিপরীত ক্ষুধা মানে?'

'দুপুরবেলা দু থালা ভাত যাবতীয় তরকারি দিয়ে খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বললে ভীষণ খিদে। ফলার মেখে দিলুম, চেটেপুটে সবটাই খেয়ে ফেললে। এখন বলছে আবার খিদে।'

মথুরবাবু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'কী হবে? এর পর তো অসুখ করবে!'

Scanned by CamScanner

'শাস্ত্রে আছে কোনও কোনও মহাসাধকের এমন হয়। কুণ্ডলিনীর অগ্নিতে সব ভস্মীভূত হয়। একটা গল্প শুনুন, গোপীরা যমুনার তীরে এসে দেখছে পারাপারের শেষ নৌকো চলে গেছে। মহা দুশ্চিন্তা। বাড়ি তো ফিরতেই হবে। এমন সময় ব্যাসদেব এসে হাজির। গোপীরা সব কেঁদে পড়ল। মুনি, তুমি যা হয় একটা কিছু করো, নয় তো কলঙ্কের একশেষ হবে।' এ-কথা তো ঠিক, আমরা কৃষ্ণের কাছে এসেছিলুম, আর আমাদের সময়জ্ঞান ছিল না। ব্যাসদেব বললেন, সে যা হয় একটা কিছু করা যাবে, এখন আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে, তোমরা যদি কিছু খাওয়াতে পার তা হলে একটা কিছু ব্যবস্থা হতে পারে। গোপীরা তাদের ভাণ্ড চেঁচেপুঁছে, ক্ষীর, নবনী যা ছিল সব ব্যাসদেবকে খাওয়াল। তিনি এইবার যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে বললেন, যমুনে! আমি যদি কিছু খেয়ে না থাকি, তা হলে তুমি দুভাগ হও। যমুনা দুভাগ হল। সেই পথে সবাই ওপারে গেলেন। ওপারে গিয়ে গোপীরা জিজ্ঞেস করছে, মুনিবর! একটু আগে আমরা আপনাকে কী খাওয়ালুম! ব্যাসদেব হাসতে হাসতে বললেন, ব্রহ্মার্পণং! আহার আমি করিনি, আমি ব্রহ্মে অর্পণ করেছি মাত্র। যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতো।'

মথুরবাবু বললেন, 'কী যে সব হচ্ছে, আমার মাথায় আসছে না। আমি বুঝি জমি-জিরেত খাজনা, মামলা। এখন কী হবে!'

'এরও উপায় আছে বাবা।'

'বলো কী উপায়?'

'ওর ঘরে থরে থরে নানারকম খাবার সাজিয়ে রাখব।'

'ভাল কথা, সেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

রামকৃষ্ণের ঘরে লম্বা একটা টেবিল এল। তার ওপর সাজানো হল চিঁড়ে মুড়কি, সন্দেশ, রসগোল্লা, লুচি, সরপুরিয়া, প্যাঁড়া। একটা আধটা নয়। থরে থরে।

ভৈরবী বললেন, 'বাবা, তুমি এই ঘরে দিন-রাত্তির থাকো আর যখন যা ইচ্ছে হবে তখনই তা খাও।'

রামকৃষ্ণ শিশুর মতো বললেন, 'এই সব আমার?'

'সব তোমার।'

রাত নামল পঞ্চবটীতে। আজ বেশ উৎসব উৎসব লাগছে। কুঠিবাড়িতে মথুরবাবু। ঘরে ঘরে ঝাড়লণ্ঠন। তাঁর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব। কলকাতার নব্যযুবক। ভাব আর ভক্তির চেয়ে যুক্তি আর বিজ্ঞানে বিশ্বাসী। ইংরেজ শ্রেষ্ঠ জাতি। ইংল্যান্ডেই মানুষের বসবাস। গামছাধারী পুরোহিত, শিখা, সূত্র, গঙ্গাস্নান, ব্যঙ্গের বিষয়। মাইকেল মধুসূদনের বন্ধুস্থানীয়, বঙ্কিমের যুক্তিবাদে শ্রদ্ধাশীল, ঈশ্বরচন্দ্র পণ্ডিত হলেও সমাজসংস্কারক হিসাবে গ্রহণীয়। এঁরা ভোজনের আগে পান করেন। পানের সময় রাজনীতি ও সাংবাদিকতার চর্চা করেন। কলেজকে বলেন কালেজ, হাউসকে বলেন হৌস। রানির কালীবাড়ির প্রতি আকর্ষণ নেই। গার্ডেন আর গ্যাঞ্জেস দেখেন। কথায় কথায় বলেন সিনিক বিউটি। ইংরেজি ধারায় দেশোদ্ধারের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ। কেউ কেউ ব্রাহ্মসমাজেও যান। কুঠিবাড়ির দিকেই কর্মচারীদের আজ বেশি আনাগোনা। বাবুদের নানা ফাইফরমাশ। মথুরবাবু কিন্তু রাশ টেনে ধরে আছেন। কোথাও বাড়াবাড়ি হতে দিচ্ছেন না। রামকৃষ্ণকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। তাঁর অভিভাবক।

ভৈরবী রামকৃষ্ণকে পঞ্চবটীতে নিয়ে এসেছেন। আজ তাঁকে চক্রদর্শন করাবেন। আগাম শিব পার্বতীকে বলছেন, প্রিয়ে, যে কোলিক এইরকম চক্র ভক্তিসহকারে দর্শন করে সে কোটি ব্রত, তীর্থ তপস্যা পান এবং যজ্ঞের ফল লাভ করে। অচলানন্দ চক্র তৈরি করেছেন। প্রতি সাধকের বাঁ পাশে অঙ্গ লগ্ন হয়ে বসেছেন তাঁর শক্তি। তান্ত্রিক বলেন লতা।

সব আয়োজন সম্পূর্ণ। ঘটাদি স্থাপিত। ভাণ্ডার থেকে প্রচুর মদ্যমাংসাদি এসেছে। মাতৃপদে স্বপুষ্প নিবেদিত হয়েছে। অতি গুহ্য বস্তু। কুমারীর প্রথম রজঃ। অচলানন্দের সন্ধানে সবই আছে। পাত্রে পাত্রে শোধিত মদ্য। এগুলি আর শুধু পাত্র নয় অভ্যর্চনাপাত্র। সমস্ত অঞ্চলটায় একটা থমথমে পরিবেশ তৈরি হয়েছে। রাতের অন্ধকারে রক্তাম্বর। ছল ছল পানপাত্র। রক্তজবা। মুদ্রা, যন্ত্র, ঘট। আগমে শিব বলছেন,

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যবেৎ পততি ভূতলে।
উদ্ধায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

পানের পর পান করে যাবে। ভূতলে পতিত না হওয়া পর্যন্ত বারবার পান করবে। পতিত হলে উঠে আবার পান করবে। এরূপ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

রামকৃষ্ণ স্থির হয়ে চক্রদর্শন করছেন। ভৈরবী বললেন, 'যোগীদের বলে বীর, যোগিনীদের বলে মদমন্থরা।'

চক্র ক্রমশ উল্লাসে মাতছে। কুলশক্তিরা করতালি দিয়ে গান গাইছে। গানের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। তারা নাচছে, পা টলে টলে যাচ্ছে। মদমত্ত যোগীরা প্রমদাদের গায়ের ওপর পড়ছে আর মদাকুলা যোগিনীরা পুরুষদের গায়ের ওপর পড়ছে। পরস্পর মদ্যপান করাচ্ছে। নিজের মুখের মদ্য আর চাট প্রিয়ার মুখে নিক্ষেপ করছে।

ভৈরবী, শিষ্য রামকৃষ্ণকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন। মাঝে মাঝে অঙ্গ স্পর্শ করে দেহের উত্তাপ পরিমাপ করছেন। ভৈরবী জানেন এরপর ওরা কী করবে। সুরতক্রিয়া। শুরু হল বিভিন্ন ভঙ্গিতে নরনারীর মিলন।

রামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে চলে গেলেন। নিঃসার দেহ। ভৈরবী সসম্ভ্রমে সরে গেলেন। রামকৃষ্ণ এখন দিব্যলোকে শিবশক্তির মিলন দর্শন করছেন। সেই কস্তুরী গন্ধ। অদ্ভুত একটা শব্দ বেরোচ্ছে, ভারী মধুর। অন্য কোনও সাধক এমন দিব্যসমাধি, দিব্যধ্বনি শোনেননি। শাস্ত্রে শুধু উল্লেখ আছে। এই শব্দটি হল কুণ্ডলিনী কুজন। ভ্রমর যখন পদ্মে বসে মধুতে চুর হয়ে যায় তখন এই রকম অধোস্ফুট গুঞ্জন করে। কুণ্ডলিনী সহস্রারের শতদল পদ্ম লেহন করছে, আর পরমানন্দে শিস দিচ্ছে। নরনারীর স্থূল মিলনে বরনারীদের ক্ষেত্রে এই শব্দটিই হয় শীৎকার।

রাত্রির শেষ যামে অচলানন্দ ধ্যান, পূজাদি শেষ করে পীঠ পরিত্যাগ করলেন। ভোর হল। রামকৃষ্ণ তখনও সমাধিতে। ভৈরবী সবিস্ময়ে দেখলেন একটি সাপ তাঁর কোলের ওপর দিয়ে মন্থরগতিতে চলে যাচ্ছে। পরক্ষণেই গাঢ় সবুজ একটি মৌটুসি পাখি মাথায় বসে অবিন্যস্ত চুলে ঠোঁট গুঁজে দিল।

সমাধিভঙ্গের পর ভৈরবী বললেন, 'বাবা! আমি তোমাকে এখন সিদ্ধ বলে ঘোষণা করতে পারি। আর মাত্র দু-একটি কঠিন সাধন বাকি।

মথুরবাবু বেড়িয়ে ফিরলেন। অচলানন্দ তাঁর দলবল নিয়ে নৌকোয় উঠছেন। কালীঘাটে যাবেন। ভৈরবী দেবমণ্ডলের ঘাটে ফেরার আগে মথুরবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন।

মথুরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'সারারাত জাগলেও আপনাদের কিছু হয় না কেন?'

ভৈরবী কী আর বলবেন, হাসলেন।

মথুরবাবু বললেন, 'কিছু বলবেন?'

ভৈরবী বললেন, 'যত তাড়াতাড়ি পারেন পণ্ডিতসভা আহ্বান করুন। সারা ভারতের পণ্ডিতদের আপনি ডাকতে পারেন। আমি প্রমাণ করে দোবো, রামকৃষ্ণ অবতার। অবতার ছাড়া কারও পক্ষে এ সব সম্ভব নয়!'

'কী সম্ভব নয়!'

'নরনারীর যৌন মিলন চোখের সামনে দেখলে মানুষ মাত্রেরই উত্তেজনা হতে বাধ্য। রামকৃষ্ণ চলে গেলেন গভীর সমাধিতে।'

মথুরবাবু বললেন, 'ঠিক আছে। যা হয় হবে।'

ভৈরবী দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, 'আমাকে বিশ্বাস নেই!'

'যথেষ্ট আছে, তবে দেশটা যে বাংলা দেশ!'

পল্লিতে ব্রাহ্মণী ভৈরবী সকলেরই খুব প্রিয়। সব বাড়ির অন্দরমহল তাঁর কাছে অবারিত। সকলেই তাঁর অনুগত। দু-তিনজন সেবিকা সদাসর্বদা তাঁর কাছেই থাকেন। ব্রাহ্মণী প্রথামত ভিক্ষায় বেরোন। নিয়োগী গৃহিণী বলেন, 'কী দরকার!'

ব্রাহ্মণী বলেন, 'ভিক্ষান্নের চেয়ে পবিত্র আর কী আছে!'

আজকে ডাল রাঁধছেন। ফোড়নের গন্ধে পাড়া মাত।

এমন সময় স্বয়ং রামকৃষ্ণ এসে হাজির। ঘরে ঢুকলেন না। চাঁদনিতে বসে বললেন, 'যা গন্ধ ছাড়িয়েছ, আজ তোমার কাছে খাব। ঝাল খাব, টক খাব।'

'হঠাৎ চলে এলে?'

'মথুরের কাছে অনেক মোসায়েব। কেবল বিষয়ের কথা।'

রামকৃষ্ণ বহুক্ষণ বসে রইলেন নির্জনে। ওপার থেকে শ্মশানে শবদাহের গন্ধ ভেসে আসছে। মাংস পোড়ার গন্ধ। শ্বাস টেনে টেনে এই গন্ধ নিতে ভীষণ ভাল লাগছে কেন। ধূপ, ধুনোর গন্ধের চেয়েও ভাল। কেন লাগছে, কে বলতে পারে!

ভৈরবীকে জিজ্ঞেস করলেন।

রামকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে ভৈরবী হাসতে লাগলেন। 'বাবা! তুমি ধীরে ধীরে অঘোরী হয়ে যাচ্ছ। মৃত্যু যে জীবনের চেয়ে সত্য। কে জন্মায় বাবা? জন্মায় তো মৃত্যু। জীব মৃত্যুর চেয়ে একটু দূরে জন্মায়, তারপর শামুকের মতো গুটি গুটি এগিয়ে যায় মা যেখানে চিতা জ্বেলে বসে আছেন, সেই দিকে। জীবনের ডিম পাড়তে পাড়তে। মাংস পোড়ার গন্ধের চেয়ে শুদ্ধ সাত্ত্বিক গন্ধ আর কী আছে! ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার, আমি সব পুড়ছে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ সব দগ্ধ হচ্ছে। বিশুদ্ধ নিরাকারে মিশে যাচ্ছে পঞ্চভূতের দেহ।'

Scanned by CamScanner

রামকৃষ্ণ একসময় চলে গেলেন। দক্ষিণেশ্বর প্রায় এক মাইলের পথ। গাছপালার মধ্যে দিয়ে ছায়া ছায়া পথ দিয়ে বৃক্ষলতার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে রামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতে ফিরে এসে হুঁস হারালেন। অদ্ভুত একটা ভাব আসছে। কখনও নিজেকে মনে হচ্ছে আকাশ, কখনও বাতাস, কখনও প্রশান্ত সমুদ্র।

ভৈরবী সেই মেয়েটিকে ডেকে পাঠালেন, যার নাম কাত্যায়নী।

ভৈরবী বললেন, 'আজ রাতে তোমাকে আমার প্রয়োজন হবে।'

'বলুন মা, আপনার আদেশ আমি গুরুর আদেশ বলে মনে করি।'

'তুমি আজ সারারাত আমার সঙ্গে পঞ্চবটীতে থাকবে।'

'আচ্ছা মা।'

'ঠিক সন্ধেবেলা আসবে। সঙ্গে ভাল শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ সব আনবে। তোমাকে আমি সাজাব।'

ঘরের দরজা বন্ধ করে, ডাল, তরকারি, ঘি ভাত নিয়ে ভৈরবী চললেন দক্ষিণেশ্বরে। রামকৃষ্ণ খেতে চেয়েছেন। নাটমন্দিরে কালীকীর্তনের দল বসেছে। গানে গানে মন্দির মুখরিত। পাখোয়াজের বজ্রবোল!

ভৈরবী এসে দেখলেন পঞ্চবটীমূলে একটি সোনার মূর্তি শায়িত। বাগানের মালী ভর্তাভারী বেদির নীচের জমিতে চুপ করে বসে আছে। হাতে একটা তালপাতা। বসে বসে মাছি তাড়াচ্ছে।

ভৈরবী দেখে আভূমি প্রণাম করে বললে, 'মনে হচ্ছে, খুব জ্বর, এখানে বসে আছি, গরম ভাপ আসছে।'

ভৈরবী একটা মোটা চাদর দিয়ে রামকৃষ্ণকে জড়িয়ে তুলে বসালেন। দাঁড় করিয়ে নিয়ে চলেলেন বকুলতলার ঘাটে।

ভর্তাভারী বললে, 'জ্বর গায়ে চান করাবে মা?'

ভৈরবী হাসতে হাসতে বললেন, 'জ্বর নয় বাবা। অন্য ব্যাপার!'

ভর্তাভারী বললে, 'পইঠেগুলো ধুয়ে দি মা। কাদায় পেছল হয়ে আছে।'

ভৈরবী বললেন, 'তা দাও।'

॥ দশ ॥

ভৈরবী বেশ কিছুক্ষণের জন্যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন।

সারাটা দুপুর রামকৃষ্ণ শিশুর মতো খেলা করে বেড়ালেন। একবার করে ছুটে ঘরে যান। থরে থরে সাজানো খাবার থেকে এটা ওটা তুলে তুলে খান। আবার ছুটে বেরিয়ে যান বাইরে। পীতাম্বর ভাণ্ডারীর ছোট ছোট ছেলেরা তাঁর খেলার সঙ্গী। কখনও গান হচ্ছে হাততালি দিয়ে। কখনও মাটি দিয়ে পুতুল গড়া। কখনও কাঠকয়লা দিয়ে ছবি আঁকা। পাল তোলা জাহাজ। পাখি। পণ্ডিত মশাইয়ের মুখ।

এমন সময় কোথা থেকে একটা ফড়িং উড়ে এল। রামকৃষ্ণ দেখছেন তার গুহ্যদেশে একটা লম্বা কাঠি বিদ্ধ রয়েছে। রামকৃষ্ণ প্রথমটায় যন্ত্রণায় হায় হায় করে উঠলেন। ছেলেরা ঠাকুরের যন্ত্রণা দেখে খেলা ছেড়ে তাকিয়ে রইল।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'দেখেছিস! কোনও দুষ্টু ছেলের কাজ।'

তাঁর চোখে জল। ছেলেরা বুঝতে পারছে না, কী করা উচিত!

হঠাৎ রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে হা হা করে হাসতে লাগলেন।

একটি ছেলে জিজ্ঞেস করলে, 'ঠাকুর! এই তুমি কাঁদছিলে এখন আবার হাসছ কেন?'

রামকৃষ্ণ হাসি থামিয়ে বললেন, 'সে তুই বুঝবি না। রামের দুর্দশা! হে রাম, তুমি নিজের দুর্দশা নিজেই করেছ।' আবার হাসতে লাগলেন।

উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় পেছনের গেট দিয়ে ভৈরবী প্রবেশ করলেন। কলাপাতায় মুড়ে কী একটা এনেছেন। বেলতলায় ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে রেখে পঞ্চবটীতে এসে দেখলেন রামকৃষ্ণ আসনে বসে পড়েছেন। বসামাত্রই যাঁর ধ্যান লেগে যায় তাঁকে আর জপ ধ্যানের নতুন কী নির্দেশ দেবেন। রামকৃষ্ণকে সাক্ষী রেখে নিজেই শুরু করলেন শাস্ত্রীয় আচারাদি। কারণ নিবেদন করলেন। মাছ ভাজা রাখলেন কলাপাতায়। আজ ভয়ঙ্কর রাত। রামকৃষ্ণের আজ কঠিনতম পরীক্ষার দিন। ভৈরবী সব ছকে রেখেছেন। আজ তন্ত্রোক্ত শিবাবলি দেবেন।

তন্ত্রে আছে, 'সাধক সন্ধ্যাকালে বিল্বমূলে প্রান্তরে বা শ্মশানে শিবারূপিণী দেবীকে মাংসা প্রধান নৈবেদ্য সমর্পণ করবেন। প্রথমত কালী। কালী! এই বলে আহ্বান করলে শিবারূপিণী দেবী উমা সপরিবারে পশুরূপ ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হন। ওই বলি দ্রব্য ভোজন করে শিবা ঈশানকোণে এসে মুখ তুলে সুস্বরে ধ্বনি করলে সাধকের মঙ্গল হবে, নতুবা অমঙ্গল।'

ভৈরবীর নির্দেশে রামকৃষ্ণ আসন ছেড়ে উঠে বেলতলায় গেলেন। ভৈরবী ঘাসের ভেতর থেকে সেই কলাপাতার মোড়কটি বের করলেন। খোলামাত্রই কয়েক খণ্ড মাংস বেরলো। নানা মাপের বড় বড় টুকরো। একটা লম্বা টুকরো আলাদা মুড়ে রেখে; বাকি টুকরো কলাপাতায় সাজিয়ে রামকৃষ্ণকে বললেন, 'চলো।'

ঝাউতলার প্রান্তরে রামকৃষ্ণ শিবাবলি দিয়ে চিৎকার করলেন, 'মা, মা, কালী, কালী।'

ফিরে এলেন পঞ্চবটীর পঞ্চমুণ্ডীর আসনে। মালা এক পাক ঘোরাতে না ঘোরাতেই গভীর ধ্যান ও দর্শন।

প্রথমে দেখছেন, নৃমুণ্ড স্তূপাকার, পর্বতাকার আর কিছুই নেই। সামান্য বাতাস নেই, শব্দ নেই। তার মধ্যে একা বসে আছেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ ওই অবস্থায় বসে থাকার পর দেখছেন, তাঁর শরীর হোমাগ্নির মতো জ্বলছে। এরপর একে একে আসতে লাগলেন বিভিন্ন দেবী, দেবতারাও এলেন, প্রথমে এলেন বালগোপাল, তারপরে বাগীশ্বেরী, এলেন শিব, কৃষ্ণ। এলেন মাতঙ্গী, কমলা, ভুবনেশ্বরী।

হঠাৎ দেখছেন, গঙ্গার মাঝখানটা আলোয় আলোকময়। এক অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি গঙ্গাগর্ভ থেকে উঠলেন। জলের ওপর দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে একেবারে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। অপরূপা সুন্দরী। পূর্ণগর্ভা। রামকৃষ্ণ বিমুগ্ধ হয়ে সেই রূপ দর্শন করছেন। দেখতে দেখতে ওই রমণী তাঁর সামনেই সুন্দর এক কুমার প্রসব করে অতি আদরে কোলে তুলে নিয়ে স্তন্যপান করাতে লাগলেন। পরক্ষণেই এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। রমণীর রূপ পালটে গেছে। কঠোর করালবদনা হয়ে শিশুটিকে গ্রাস করে আবার গঙ্গা গর্ভে প্রবেশ করলেন।

রামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তুমি?' মা উত্তর দিলেন, 'মোহিনীমায়া'!

এরপর এলেন শ্রীশ্রী রাজরাজেশ্বরী। সেই ষোড়শীমূর্তির অপূর্ব সৌন্দর্যে তাঁর চিদাকাশ প্লাবিত হল। সেই ত্রিসুরামূর্তির অঙ্গ থেকে রূপ-সৌন্দর্য গলে গলে চারদিকে পড়ছে। বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ভৈরবী দেখছেন রামকৃষ্ণ যেন পাথরের মূর্তি। মধ্যরাতে রামকৃষ্ণকে পঞ্চবটী থেকে নিয়ে গেলেন বেলতলায়।

রামকৃষ্ণ কী স্বপ্ন দেখছেন!

প্রদীপের আলোয় এক দিব্য সুন্দরী। ভৈরবী কাত্যায়নীকে ষোড়শী সাজিয়েছেন। স্নান করিয়েছেন। ধূপ আর ধুনোর ধোঁয়ায় চুল সুগন্ধী করেছেন। সর্বাঙ্গে কস্তুরী লেপন করেছেন। টানা টানা চোখে কাজল দিয়েছেন। কপালে সোনার টিপ। নাকে উজ্জ্বল পাথর বসানো নাকছাবি। স্বর্ণালঙ্কার। পায়ে পাঁয়জোড়। জরি বসানো বেনারসী। ঠোঁট দুটি তাম্বুল লাল। মধ্যরাতে মন টলিয়ে দেওয়ার মতো আবির্ভাব।

ছমছমে অন্ধকার। পত্রবেষ্টিত নিভৃত কানন। রহস্যময় বিল্বমূল। নদীর মৃদু আলাপন। একটি বেদি। দুটি আসন। পূজার আয়োজন। ভৈরবীর কঠিন আদেশ—বাবা! পূর্ণ দৃষ্টিতে এই নারীকে দর্শন করো!

রামকৃষ্ণ দেখছেন। দেবীদর্শনের মতো।

ভৈরবী এই বার একে একে সেই রমণীর বস্ত্র উন্মোচন করতে লাগলেন। রামকৃষ্ণের ভয়ঙ্কর পরীক্ষা। ধীরে ধীরে সেই যৌবনবতী সম্পূর্ণ নগ্নিকা। ভৈরবী তাকে বেদির আসনে স্থাপন করলেন। সম্মুখের আসনে নগ্ন সাধক।

হে সাধক! দেবীজ্ঞানে সর্বাঙ্গে বীজ প্রতিষ্ঠা করো। মস্তকে কামবীজ ক্লীঁ, চিবুকে বাগভব-ঐং, কণ্ঠে রমা, শ্রীঁ, স্তনদ্বয়েও শ্রীঁ, হস্ত স্পর্শ করে জপ করে যাও, হৃদয়ে মায়া হ্রীঁ, নাভিতে হ্রীঁ, যোনিতে ক্লীঁ ঐঁ। পাদ্যার্ঘ্য দাও, মুখে তাম্বুল। রামকৃষ্ণ ক্রোড়ে উপবেশন করে জপ ধরো।

উপবিষ্ট হওয়া মাত্রই সমাধিস্থ। শিষ্ণ অদৃশ্য। কূর্মাকৃতি। ঠিক সেই সময় শোনা গেল শিবার সুস্বর। উদ্যানের ঈশান কোণে। মন্দির চাতালে ছমছম শব্দ। মা ভবতারিণীর পদযুগলের পাঁয়জোড়ের শব্দ, যা একমাত্র ভাগ্যবানেই শুনতে পায়।

শেষ যামে রামকৃষ্ণের জ্ঞান ফিরল।

ভৈরবী বললেন, 'ক্রিয়া পূর্ণ হয়েছে বাবা। অপরে কষ্টে ধৈর্যধারণ করে এই অবস্থায় কিছুকাল জপ করেই জপ ছেড়ে দেয়, তুমি উপবেশনমাত্রই শরীরবোধশূন্য হয়ে সমাধিতে চলে গেল। শক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বাবা!' কাত্যায়নীর চিবুকে হাতে দিয়ে বললেন, 'যাঃ, তরে গেলি!'

এই বার ভৈরবী বের করলেন তাঁর পরীক্ষার শেষ অস্ত্র।

কলাপাতার মোড়ক খুলে বের করলেন মাংসখণ্ড।

রামকৃষ্ণ আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কী?'

ভৈরবীর শীতল উত্তর, 'গলিত আম মহামাংসখণ্ড।'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'নর মাংস?'

'হ্যাঁ বাবা, জিভ স্পর্শ করো।'

'আমি পারব না মা।' রামকৃষ্ণের করুণ মিনতি।

Scanned by CamScanner

'সে কী বাবা, এই দেখো আমি করছি।' ভৈরবী মাংসখণ্ডে কামড় বসালেন, তারপর রামকৃষ্ণের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিসের ঘৃণা!'

সত্যই তো কিসের ঘৃণা!' কিসের শুচি, অশুচি! বেদ, বেদান্তের উপলব্ধি, শ্রবণে, মননে। তন্ত্র যে করতে হয়! সাধক রামকৃষ্ণ 'মা মা', বলতে বলতে আবার ভাবাবিষ্ট। শ্রীশ্রী জদগম্বার প্রচণ্ড চণ্ডিকা-মূর্তির উদ্দীপন হল :

বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ॥

ভৈরবী সেই গলিত আম-মহামাংসখণ্ডটি রামকৃষ্ণের মুখে দিলেন। কোনও ঘৃণা নেই, বোধ নেই, বিভেদ নেই।

রামকৃষ্ণ আত্মভোলার মতো এগিয়ে চলেছেন সেই দিকে, যেখানে শিবাবলি দেওয়া হয়েছিল। সারারাত পড়ে আছে শৃগালের উচ্ছিষ্ট। হয়তো সাপ চলে গেছে, ব্যাঙ এসে থেবড়ে বসেছে। নিশাচর কীটপতঙ্গ নৃত্য করেছে। রামকৃষ্ণ নির্বিকার। তুলে তুলে খাচ্ছেন।

কুঠি বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ মনে হল গায়ে কে যেন হোমের আগুন ধরিয়ে দিলে। ভীষণ কষ্ট অথচ কি অসীম আনন্দ। হলধারী বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে রাজপুরোহিতের মতো মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলেন। রামকৃষ্ণকে দেখে তিন লাফে সরে গেলেন। হৃদয় দাঁতন, গাড়ু, গামছা নিয়ে এল।

'চলো, পুকুরে চলো।'

কিছুই শুনলেন না রামকৃষ্ণ। ঘরে গেলেন। ঝুড়ি চাপা লুচি ছিল। এক গোছা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। সামনেই বসে আছে তাঁর প্রিয় কুকুর কাপ্তেন। কাপ্তেনের গলা জড়িয়ে ধরে তাকে লুচি খাওয়াচ্ছেন, নিজেও খাচ্ছেন। মন্দিরে রাষ্ট্র হয়ে গেল, রামকৃষ্ণ আবার উন্মাদ হয়ে গেছেন। এবারে ঘোর উন্মাদ। বিষ্ঠা ভক্ষণ, শিবা উচ্ছিষ্ট নরমাংস আহার, যুবতী রমণীর কোলে সারারাত উপবেশন, জোড়া জোড়া স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম দর্শন, শিবজ্ঞানে কিশোরদের লিঙ্গ পূজা, আর স্বয়ং অর্ধেলিঙ্গ, মোটা একটা চাদর চাপা দিয়ে পঞ্চবটীতে পড়ে আছেন, দন্তধাবন, স্নান, ইত্যাদি সব বর্জন।

ভৈরবী হাসতে হাসতে বললেন, 'বাবারা! এখনও আরও একটু বাকি আছে। সেটি আজই হবে।'

'কখন হবে?'

'আজই হবে, বেলা বারোটার পর।'

'কোথায় হবে?'

'নাটমন্দিরে, সকলের সামনে।'

সকাল থেকেই এক ভৈরবী গঙ্গার ধারে চাঁদনিতে বসে ছিলেন। কেন বসেছিলেন বোঝা গেল মধ্যাহ্নে। ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁকে পাঁচ সিকা দক্ষিণা দিয়ে বসিয়ে রেখেছিলেন। কালীবাড়ির নাটমন্দিরে কুলাগার পূজার আয়োজন হয়েছে। কুমারীপূজা দিয়ে তন্ত্রসাধনার শুরু, কুলাগার পূজায় সমাপ্তি।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী গঙ্গার ধারের ভৈরবীকে এনে আসনে বসালেন। নহবতে দ্বিপ্রহরের সুরে সানাই বাজছে। মথুরবাবু আর পীতাম্বর ভাণ্ডারী ভীষণ ব্যস্ত, মণ, মণ চাল আর তিল আসছে। অন্নমেরু আসন্ন। নাটমন্দিরে রহস্য পূজার আয়োজনে ভিড় লেগে আসনে জ্যোতির্ময় শ্রীরামকৃষ্ণ। তন্ত্রধারিকা জ্যোতির্ময়ী ভৈরবী। আসনে রক্তাম্বরা আর এক ভৈরবী। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর শাস্ত্র সব মুখস্থ। তিনি বলছেন, 'শক্তির কুলাগারে প্রবাহিনী তিনটি নারী আছে। তার মধ্যে একটি হল চান্দ্রী, একটি সৌরী, আর একটি আগ্নেয়ী। সাধক মদনাগারে এই তিন নারীর পূজা করবেন। চান্দ্রী নারী জল, সৌরী নারী পুষ্প, আগ্নেয় নারী বীজ ক্ষরণ করে।

বীজমন্ত্রের উচ্চারণে নাটমন্দির ঝঙ্কৃত হতে লাগল, এঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ হুঁ ঐঁ জঁ বুলঁ ক্লিন্নে সর্বানি ভগানি বশমহ্বংনয় স্ত্রীঁ হ্রীং ক্লীঁ ব্লুঁ ভগমালিন্যৈ নমঃ। গন্ধাদি উপচার প্রদান করো। এই বার ওই মদনাগারে ইষ্টদেবতার পূজা করো। নিজ লিঙ্গের পূজা করো, ওঁ নম শিবায়।

ভক্তমণ্ডলী পূজার তেজ ও মন্ত্রে আবিষ্ট। দ্বিপ্রহরের রোদের তেজ সাধকের দিব্য তেজে ম্লান। রামকৃষ্ণ যেন উত্তপ্ত বিচ্ছুরিত একটি তাম্রমূর্তি। দূর থেকে এগিয়ে আসছে হরিনাম সংকীর্তনের একটি দল। এমন প্রায়ই আসেন ভক্তরা। তাঁরা নাচতে নাচতে আসছেন। মূল গায়ক যেন সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ। এতখানি নাক। তিলক ধারণ করেছেন। সামনে কোঁচা লুটিয়ে যাচ্ছে। দুটি হাত ওপরে হেলছে দুলছে।

কার ভাবে গৌর বেশে মজালে হে প্রাণ ;
প্রেমসাগরে উঠল তুফান, থাকবে না আর কুলমান।।

আহা! খোলের কী বোল ছুটেছে, কাঁচ ভাঙা মন্দিরা!

রোল উঠল কালীবাড়িতে, নীলকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠের দল।

ভৈরবী বলে উঠলেন, 'বাবা! এই শেষ পূজাতেও তুমি সিদ্ধ হলে। কুলাগার পূজা।'

মৃদঙ্গের তাকুম তাকুম বোলে রামকৃষ্ণ আর স্থির থাকেন! কীর্তন এসে গেছে মন্দিরের উঠানে। রামকৃষ্ণ লাফিয়ে নামলেন, দলে এসে নাচছেন আর দু হাত তুলে গাইছেন,

ব্রজমাঝে রাখাল সাজে চরালে গোধন
ধরলে করে মোহন বাঁশী মজলো গোপীর মন ;

ভৈরবী ব্রাহ্মণীও তো প্রেম রসের রসিক। একটু আগে ঘোর শাক্ত, এই বার ঘোর বৈষ্ণব। তিনিও নাচছেন, দোহার দিচ্ছেন,

ধরলে করে মোহন বাঁশী

হলধারী মন্দিরের অলিন্দে দাঁড়িয়ে মুঠো মুঠো বাতাসা হরির লুঠ দিচ্ছেন। মথুরবাবু ছুটে এসেছেন, অবাক হয়ে দেখছেন। এ কী পৃথিবী, না স্বর্গ!

নীলকণ্ঠ গানের ফাঁকে বললেন, 'আপনি সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ!'

ঠাকুর সুরে উত্তর দিলেন, 'ও কথা বলিস নে সই। শুনতে পারে রাই। আমি দাসের দাস। গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের কখনও গঙ্গা হয়!

নীলকণ্ঠ সুরে বললেন, 'আপনি যাই বলুন, আমরা দেখছি রামকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ!'

রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট, করুণ সুরে কাঁদো কাঁদো, 'বাপু, আমার আমি খুঁজতে যাই, কোথায় খুঁজে পাই!'

শ্রীরামকৃষ্ণ অঝোরে কাঁদছেন আর গাইছেন,

কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার ;
হয়ে পূর্ণকাম, বলব হরিনাম,
নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার।

'তোমার গান নীলকণ্ঠ, হয়ে পূর্ণকাম, বলব হরিনাম। নীলকণ্ঠ! বলব হরি নাম, হরি, হ, হ, হল...।'

হৃদয় ছুটে এসে সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের পাশে দাঁড়াল। কীর্তনের দল বেড়ে বেড়ে নাচছে আর হরিনাম করছে।

হঠাৎ সে বেরিয়ে এল। সেই তরুণ সন্ন্যাসী। তার দীপ্ত, তেজোময় শরীর। সে থাকে শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে। এই সন্ন্যাসীকে অবিকল তাঁরই মতো দেখতে। আগেও সে শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর ছেড়ে বেরিয়ে এসে তাঁকে উপদেশ করত। শাস্ত্র শোনাত, বোঝাত, সাধনের নির্দেশ দিত। সাধকের শরীরে সন্ন্যাসী গুরুর অবস্থান। শরীর ত্যাগ করে সন্ন্যাসী নির্গত হলেই রামকৃষ্ণ হয় জড়বৎ হয়ে যেতেন না হয় অজ্ঞান। আজ তিনি জড়বৎ হয়ে একপাশে পড়ে গেলেন। সন্ন্যাসী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'তন্ত্রের যে সব নির্দেশ তোমাকে পূর্বেই দিয়েছিলাম, এখন শাস্ত্রের সঙ্গে সব মিলিয়ে নিতে পারলে তো! যা করেছিলে আগে অন্তরঙ্গে, সেই সবই করলে একে একে বহিরঙ্গে। শাস্ত্রের মান্যরক্ষার জন্যেই ভৈরবী এলেন, এরপর একে একে আসবেন, জটাধারী, ন্যাংটা তোতাপুরী। শেষ হয়নি এই তো সবে শুরু।' শ্রীরামকৃষ্ণ বুঁদ হয়ে পড়ে আছেন একপাশে। ব্রহ্মাণ্ডের পৃথক পৃথক যাবতীয় শব্দ ও ধ্বনি একত্রীভূত হয়ে এক বিরাট প্রণবধ্বনি প্রতি মুহূর্তে জগতের সর্বত্র স্বতঃ উদিত হয়ে বিশ্বলোকে ছড়িয়ে পড়ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ধ্বনিতরঙ্গে রোমাঞ্চিত হচ্ছেন। অনাহতের দুয়ার খুলে গেছে। এই অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ পশু, পক্ষী, মনুষ্যেতর সমস্ত জীবজন্তুর ডাকের যথাযথ অর্থবোধ করতে পারেন।

সন্ধ্যাবেলা মথুরবাবু ভৈরবীকে বললেন, 'আমি কালই সেই পণ্ডিতসভার আয়োজন করেছি। আপনি প্রস্তুত?'

ভৈরবী বললেন, 'আমি সব সময় প্রস্তুত।'

মথুরবাবু বললেন, 'সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য গৌরী পণ্ডিতমশাই এখানেই আছেন, আর আসছেন শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণবচরণ। তাঁর সঙ্গে আরও সব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত থাকবেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ একপাশে বসেছিলেন আত্মভোলা হয়ে। তিনি মহানন্দে বললেন, 'বাঃ, বাঃ, বেশ হবে। আমার বিচার হবে পণ্ডিতদের আদালতে। আমার উকিল ভৈরবী। মথুর তোমার উকিল?'

মথুরামোহন হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার উকিল নয়, ব্যারিস্টার শ্রীরামকৃষ্ণ।'

'শুনেছি, ব্যারিস্টারের দক্ষিণা খুব বেশি হয়, তুমি ক' গিনি দেবে?'

'আমি তো সব দিয়ে বসে আছি। ভাবছি হরিশ্চন্দ্র হব। নিজেকেই দিয়ে দোবো। রাসমণির জামাই রামকৃষ্ণের দাস হয়ে মরতে চায়। নেবে তো আমাকে?'

রামকৃষ্ণের মুখে কথা নেই। সম্পূর্ণ ভাবস্থ। স্নেহমাখা অদ্ভুত সেই মুখ।

Scanned by CamScanner

রাত পোহাল। সারাটা রাত রামকৃষ্ণ গঙ্গার ধারে পোস্তার ওপর পায়চারি করলেন। বেলতলার আসনে গিয়ে বসেন, আবার উঠে আসেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর রাত কাটল গভীর ধ্যানে।

সভা বসবে নাটমন্দিরে, সকাল দশটায়। উদ্যোগ আয়োজন সমাপ্ত। নতুন গাড়ু, গামছা সাজানো রয়েছে পণ্ডিতদের জন্যে। উত্তরীয় আর পুষ্পমাল্যে বরণ করা হবে। প্রভূত দক্ষিণাও তাঁরা পাবেন। সভান্তে চর্ব-চুষ্য ভোজন। মথুরামোহনের ত্রুটিহীন এলাহি ব্যবস্থা। রামকৃষ্ণের প্রীতিসাধনই তাঁর জীবনব্রত। বাবা! তুমি যা চাইবে! আমি আছি। মোটা কার্পেটের ওপর সুদৃশ্য গালিচা। চারপাশে ঝোলানো হয়েছে সুগন্ধি পুষ্পমালিকা। কর্মচারীরা উঁকিঝুঁকি মারছে। ছোট ভটচাজের পরীক্ষা। সেই যে ভৈরবী বলেছিলেন, ইনি অবতার, এইবার বাঘাবাঘা পণ্ডিতরা এসে বেলুন চুপসে দেবে! অবতার বললেই অবতার! তা হলে সব পাগলই তো অবতার! অবিশ্বাসী সংসারীদের জল্পনার শেষ নেই। রামের পরে কৃষ্ণ জুড়লেই অবতার! আরে রাম আলাদা কৃষ্ণ আলাদা। অযোধ্যার সঙ্গে মথুরা জুড়ে মিলেই দক্ষিণেশ্বর! রাবণ বধ, কংস বধ, এ সবের প্রয়োজন নেই! কুরুক্ষেত্রে সদুর্শন না ঘুরিয়েই অবতার! তোমার রথ তো ওই বেণী সা-র ছ্যাকরা গাড়ি! তোমার গীতা তো ওই মা, মা বলে চিৎকার আর মাটিতে পড়ে মুখ ঘষা, দেখা দে মা, দেখা দে মা।

কালীবাড়িতে মহা উত্তেজনা। পণ্ডিতসভা আগেও হয়েছে, এটা আলাদা, পণ্ডিতদের বিচারসভা!

মথুরবাবু স্বয়ং অভ্যর্থনায় রয়েছেন। বৈষ্ণবচরণ আসবেন কলকাতা থেকে। তিনি আরও কয়েকজন পণ্ডিতকে আনবেন। আসতে দেরি করছেন। মথুরামোহন কিঞ্চিৎ উতলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ আজ একটু সেজেছেন। ভৈরবী সাজিয়ে দিয়েছেন, 'বাবা! আজ যে তোমার শাস্ত্রসভায় আবির্ভাবের দিন। ধুতিটা কোমরে রেখো। পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলে দিও না।'

'শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আমার বটুয়া!'

'আজও বটুয়া?'

'বাঃ, ওইতেই তো আছে আমার মুখশুদ্ধি, কাবাব চিনি। ওইটাই তো আমার সিদ্ধাই।'

দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন গৌরীপণ্ডিত। শাস্ত্রসম্মত সাজপোশাক। সভাতেই যাচ্ছেন।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'চলো, চলো। সভা বোধহয় শুরু হয়ে গেল!'

'এখনও বৈষ্ণবচরণ আসেননি। মথুরবাবু উতলা হয়েছেন।'

'চলো, চলো, আমরা তো আগে যাই।'

শ্রীরামকৃষ্ণ গৌরীপণ্ডিতকে নিয়ে আগেই সভাস্থলে চললেন। সভায় প্রবেশের আগে শ্রীশ্রী জগন্মাতা কালিকার মন্দিরে প্রবেশ করে ভক্তিভরে তাঁর শ্রীমূর্তিদর্শন ও শ্রীচরণবন্দনাদি করে ভাবে টলমল করতে করতে যেমন মন্দিরের বাইরে এলেন, অমনি দেখলেন সামনে বৈষ্ণবচরণ তাঁর পায়ে প্রণত হচ্ছেন।

দেখেই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে প্রেমে সমাধিস্থ হয়ে বৈষ্ণবচরণের কাঁধে চেপে বসলেন। বৈষ্ণবচরণ অভিভূত, কৃতার্থ, উল্লসিত। আবেগে কম্পিত। রোমাঞ্চিত।

'বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভু হইলা কেমন।
হুঙ্কারিয়া স্কন্ধে তাঁর কৈলা আরোহণ॥

সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন, ভক্ত বৈষ্ণবচরণ সেই মুহূর্তে দেবভাষায় রামকৃষ্ণবন্দনা রচনা করে রামকৃষ্ণ আরাধনায় বিভোর হলেন। চারপাশে ভিড় তৈরি হয়েছে। মথুরবাবু হতবাক, হতবাক গৌরীপণ্ডিত। এ কী দৃশ্য! এ কী লীলা! সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রসন্নোজ্জ্বল মূর্তি, যেন একটি জ্যোতির্বলয়। বৈষ্ণবচরণের কোনও হুঁশ নেই। অনর্গল স্তোত্র রচনা করে চলেছেন। মথুরবাবু, গৌরীপণ্ডিত, আর সকলে গোল করে ঘিরে আছেন। কারও চোখে পাতা পড়ছে না। কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ভঙ্গ হল। তিনি ধীরে এগোচ্ছেন সভাস্থলের দিকে। তাঁকে অনুসরণ করছেন আর সকলে।

সকলে আসন গ্রহণ করলেন; থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন ভৈরবী। টকটকে লাল গেরুয়া শাড়ি। উজ্জ্বল কপালে লাল টিপ। ঝলসানো রূপ। সভায় প্রবেশ মাত্রই সকলে সম্মোহিত।

ভৈরবী কিছু বলার আগেই গৌরীপণ্ডিত বলে উঠলেন, 'উনি পণ্ডিতজিকে যে ভাবে কৃপা বর্ষণ করলেন, তখন বৈষ্ণবজির সঙ্গে আমি আজ আর কোনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হব না। কারণ, উনি আজ দৈব বলে বলীয়ান। অবশ্যই আমি পরাজিত হব!'

ভৈরবী বললেন, 'আপনি সুপণ্ডিত, এই বঙ্গের আপনি একজন শ্রেষ্ঠ তার্কিক। তর্কযুদ্ধে কখনওই পরাজিত হন না। আপনি ভীত হচ্ছেন কেন?'

গৌরীপণ্ডিত বললেন, 'সাধিকে! আপনি ভুল সিদ্ধান্ত করছেন। তর্ক, বিচার, বাদানুবাদের তখনই প্রয়োজন হয় যেখানে দ্বিমতের উদ্ভব হয়। এ ক্ষেত্রে আমি আর বৈষ্ণবচরণজি একই মত পোষণ করি। আমাদের মধ্যে কোনও দ্বিমতের অবকাশ নেই।'

রামকৃষ্ণ সভামধ্যে পরিতুষ্ট এক বালকের মতো বসে আছেন। মাঝে মাঝে বটুয়া থেকে কাবাব চিনির এক একটি দানা বের করে মুখে ফেলছেন। এত বড় একটা সভা যে তাঁকে নিয়েই হচ্ছে, সে বোধ নেই। মুখে একটা মিষ্টি হাসি।

গৌরীপণ্ডিত তাঁর মনোভাব আরও পরিষ্কার করে বললেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বৈষ্ণবচরণের যে ধারণা, আমারও সেই একই ধারণা, অতএব তর্ক নিষ্প্রয়োজন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ গৌরীপণ্ডিতের ওপর বাহুতে আঙুল স্পর্শ করে সহজ সরল বালকের মতো বললেন, 'ও গৌরী, এই ভৈরবী, ওই বৈষ্ণবচরণ, এই শরীরটাকে বলছে অবতার!' নিজের বুকে হাত রেখে বললেন, 'কী বলছে বলো তো! এ কি কখনও হতে পারে! তোমার কী বোধ হয়, বলো দেখি?'

গৌরীপণ্ডিত গম্ভীর ভাবে বললেন, 'ওঁরা কিছু জানেন না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'দেখেছ! না জেনে কেমন সব বলছিল!'

গৌরীপণ্ডিত আরও গম্ভীর রূপ ধারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'অত আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই, আপনিও আপনাকে জানেন না। অতএব অন্যে আর কী করে আপনাকে জানবে বলুন? যদি কৃপা করে কারওকে জানান তবেই সে জানতে পারে!'

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের চেহারাটা কেমন হল! পণ্ডিতমশাইয়ের বকুনি খাওয়া পাঠশালের ছাত্রর মতো। ভয়ে ভয়ে বললেন, 'তা হলে তুমি কী বলতে চাইলে?'

গৌরী তীব্র গলায় বললেন, 'বৈষ্ণবচরণ আপনাকে অবতার বলে? তবে তো ছোট কথা বলে। আমার ধারণা, যাঁর অংশ থেকে যুগে যুগে অবতারেরা লোক-কল্যাণসাধনে জগতে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, যাঁর শক্তিতে তাঁরা ওই কার্য সাধন করেন, আপনি তিনিই।'

'সাধু, সাধু' রব উঠল সভায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ হা হা করে হাসতে হাসতে বললেন, 'ও বাবা! তুমি যে বৈষ্ণবচরণকেও ছাড়িয়ে যাও! কেন বলো দেখি! আমাতে কী দেখেছ!'

গৌরীপণ্ডিত সকলকে অবাক করে দিয়ে বললেন, 'শাস্ত্রপ্রমাণ আর নিজের প্রাণের অনুভব। এ বিষয়ে যদি কেউ বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করতে চান, তো আসুন, আমি দ্বৈরথে প্রস্তুত। আমি শাস্ত্রসহায়ে আমার ধারণা প্রমাণ করব।' তান্ত্রিক গৌরীপণ্ডিতের সেই তেজ প্রকাশিত হল, যে তেজে বাঁ হাতের তালুতে এক মণ কাঠ ধরে তান্ত্রিক হোম করেন।

মথুরবাবু বললেন, 'এ কী খেলা! সব যে উল্টে গেল! কোথায় আমরা আপনার সঙ্গে লড়াই করব, না আপনি আমাদের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে নামতে চাইছেন! প্রথমে তো আমিই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলুম, ভৈরবীমাতা যখন বললেন, রামকৃষ্ণ অবতার, তখন আমিই সংশয় প্রকাশ করেছিলাম, দশটির বেশি অবতার হয় কী করে!'

ভৈরবী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'এই বিদ্বজ্জনসভায় আমি শ্রীমদ্ভাগবতকে উপস্থিত করছি। তিনিই উত্তর দেবেন। প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ছাব্বিশ সংখ্যক শ্লোকে সূত মুনি বলছেন, অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সপ্তনিধের্দ্বিজাঃ। এরপর শ্রীমদ্ভাগবদ গীতাকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। শুনুন, শ্রীভগবানের কণ্ঠস্বর, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিঃ অধর্মস্য চ অভ্যুত্থানং ভবতি, তদা অহম আত্মানং সৃজামি।'

আবার 'সাধু, সাধু' রব উঠল সভায়।

ভৈরবী সভার দখল নিয়ে নিয়েছেন। তাঁর কণ্ঠে বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠছে শাস্ত্র।

ভৈরবী বললেন, 'ভক্তিশাস্ত্রে মহাভাবের কথা আছে। অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের কথা আছে। আপনারা গম্ভীরা লীলায় মহাপ্রভুর মহাভাবের বর্ণনা শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃতে পাঠ করেছেন। চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, ক্ষীণতা, মলিনতা, প্রলাপ, পীড়া, উন্মত্ততা, মোহ, মৃত্যু। মহাপ্রভু ভাবাবেশে গম্ভীরার ভেতরে মুখ ঘষছেন, মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার। ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার। এই দশদশার দু-চারটের বিকাশই দুর্লভ, চৈতন্যদেবের দেহে এই দশটি দশাই অনুক্ষণ প্রকট হত। মহাভাবের উনিশ প্রকার প্রকাশ ও সেইমতো অবস্থা একমাত্র শ্রীরাধিকা আর শ্রীচৈতন্যদেবের হত, আর হল ওই শ্রীরামকৃষ্ণে। আমি প্রত্যক্ষ করেছি মথুরবাবু করেছেন, কোনও কোনও ভাব প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা

Scanned by CamScanner

আপনাদেরও হয়েছে।'

বৈষ্ণবচরণ বললেন, 'আমি সেই সৌভাগ্যবানদের একজন। জীবের ভাগ্যক্রমে যদি কখনও জীবনে মহাভাবের আভাস উপস্থিত হয়, তবে ওই উনিশ প্রকার অবস্থার ভেতর বড় জোর দু-পাঁচটা অবস্থাই প্রকাশ পায়। জীবের শরীর ওই উনিশ প্রকার ভাবের উদ্দাম বেগ কখনওই ধারণ করতে সমর্থ হয়নি এবং শাস্ত্র বলে পরেও কখনও ধারণে সমর্থ হবে না।'

ভৈরবী বললেন, 'আপনি প্রকৃতই ভাগ্যবান। শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপা করে আপনাকে ধরা দিয়েছেন।

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষোদ্বেগদৈন্যার্তিমিশ্রিতম্।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে।।'

বৈষ্ণবচরণ বললেন, 'কী আশ্চর্য! উনি যখন আমার স্কন্ধে আরূঢ় হলেন, তখন আমি শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃতের এই শ্লোকটিই বলছিলাম। গৌরচন্দ্রস্য স্থলে রামকৃষ্ণস্য বলেছিলাম। ভাগ্যবান ব্যক্তিগণই গৌরচন্দ্রের, এই স্থলে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোদ্ভাবিত হর্ষ, ঈর্ষা, উদ্বেগ, দৈন্য ও আর্তি-মিশ্রিত বিলাপ আস্বাদন করেন। মহাপ্রভু এসেছেন রামকৃষ্ণ অবতার রূপে।'

মথুরানাথ ও উপস্থিত অন্য সকলে বৈষ্ণবচরণের কথায় একেবারে অবাক। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বালকের বিস্ময়ের ও আনন্দে মথুরবাবুকে বললেন, 'ও মথুর! এরা কী বলে গো? যা হোক, বাপু, রোগ নয় শুনে মনটায় আনন্দ হচ্ছে।'

রামকৃষ্ণ বটুয়া খুলে, মৌরি আর কাবাব চিনি নিয়ে মুখে ফেললেন।

ভৈরবী এই বার উঠে দাঁড়িয়েছেন। সাক্ষাৎ দেবী দুর্গা। তিনি বললেন, 'কোনও সংশয় আছে কি?'

সকলে সমস্বরে বললেন, 'আমরা নিঃসংশয়।'

সভা শেষ হল। পণ্ডিতমণ্ডলী বিদায় নিলেন।

মথুরামোহন কুঠিবাড়িতে এসে ভৈরবীকে বললেন, 'ভেল্কি লাগিয়ে দিলেন। মায়ের কী লীলা!'

শ্রীরামকৃষ্ণ অসহায়ের মতো বললেন, 'আমি এইবার কী করব?'

'তুমি এইবার পণ্ডিত পদ্মলোচনের কাছে একবার যাবে। তোমার অনুরোধে তিনি অন্নমেরুতে অবশ্যই আসবেন। শরীর খুবই খারাপ। বর্ধমান থেকে বায়ুপরিবর্তনের জন্যে আঁড়িয়াদহে গঙ্গার ধারে এসে বাস করছেন! আমি খবর পেয়েছি। হৃদয় তোমাকে নিয়ে যাবে।'

'পদ্মলোচন!' রামকৃষ্ণ খুব খুশি। সাচ্চা লোক। দণ্ডের মতো ঋজু, অনমনীয় চরিত্র এই মহপণ্ডিতের।

নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক পণ্ডিত পদ্মলোচন এই বঙ্গের এক সুখ্যাত মনীষী। বর্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত। ন্যায় দর্শনে সুপণ্ডিত হওয়ার পর কাশীধামে গুরুগৃহে দীর্ঘকাল থেকে বেদান্তে সুপণ্ডিত হয়েছেন। পণ্ডিতজির অদ্ভুত প্রতিভায় প্রীত হয়ে বর্ধমানরাজ তাঁকে প্রধান সভাপণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর সুযশ বঙ্গের সর্বত্র পরিব্যপ্ত।

তিনি সাধক। অতি উদার মতাবলম্বী। সদাচারী, ইষ্টনিষ্ঠ, উদার, নির্লিপ্ত এক তাপস। বেদান্তের সঙ্গে তন্ত্রের সাধনা করেন। সেই শক্তিতে যে কোনও পণ্ডিতসভায় তিনি অপরাজেয়। রামকৃষ্ণের এই পণ্ডিতপ্রবরের প্রতি আকর্ষণের কারণ তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্যে নয়, তাঁর ভক্তি, নিষ্ঠা আর উদারতার জন্যে। রাজসভায় একদিন ঘোর তর্ক। মহা কূটকচালে সমস্যা। শিব বড়, না বিষ্ণু বড়। তুলকালাম তর্ক। রাজা বললেন, প্রধান সভাপণ্ডিতকে আহ্বান করা হোক। এ সমস্যার সমাধান তিনিই করবেন। পদ্মলোচন এসে বললেন, 'আমার চোদ্দো পুরুষে কেউ কখনও শিবকেও দেখেনি, বিষ্ণুকেই দেখেনি। অতএব কে বড়, কে ছোট, আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে শাস্ত্রের কথা যদি শুনতে চাও তো এই বলতে হয় যে, শৈবশাস্ত্রে শিবকে বড় করেছে, বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিষ্ণুকে; অতএব যার যিনিই ইষ্ট, তার কাছে সেই দেবতাই অন্য সব দেবতার চেয়ে বড়।' তিনি এই বার উভয় শাস্ত্র থেকে সর্বদেবতাপেক্ষা প্রাধান্যসূচক শ্লোকগুলি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করে উভয়কেই সমান বড় বলে সিদ্ধান্ত করলেন। সব বিবাদের তৎক্ষণাৎ অবসান। সকলেই ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। এই ঘটনাটি জানার পর থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিতজির প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

আর পণ্ডিতজি! শুষ্ক বেদান্ত আর কঠিন তন্ত্র তাঁকে যা দিতে পারেনি শ্রীরামকৃষ্ণ তাই দিয়েছেন, স্নিগ্ধ ভক্তিরস। রামকৃষ্ণ তাঁর কাছে এক বিস্ময় মানব। তাঁর কণ্ঠে মা-র নামগান শুনে পণ্ডিতজি অশ্রু-সংবরণ করতে পারেন না। তার ওপর রামকৃষ্ণের ওই মুহুর্মুহু সমাধি। পণ্ডিতজি সমাধির দর্শন ও উপলব্ধি ধৈর্য ধরে শুনতেন, শাস্ত্রের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করতেন। মিলত না। তা হলে কোনটা সত্য? রামকৃষ্ণ অথবা শাস্ত্র! রামকৃষ্ণ তাঁর কাছে আলোর ভেতর একটা অন্ধকারের ছায়ার মতো, অপূর্ব আনন্দের ভেতর একটা অশান্তি। রামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ সত্য, অথচ শাস্ত্রে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

অবশেষে একটি ঘটনায় পণ্ডিত পদ্মলোচন একেবারে অভিভূত হয়ে শাস্ত্র ফেলে রামকৃষ্ণকেই গ্রহণ করলেন। জগদম্বা রামকৃষ্ণকে একদিন জানিয়ে দিলেন, পণ্ডিতজির সাধনলব্ধ শক্তির গোপন কথা। যে শক্তির জোরে সমস্ত পণ্ডিতসভায় পদ্মলোচন অজেয়। এতটাই গোপনীয়, যে তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত জানতেন না।

সেটি হল পণ্ডিতজির জলপূর্ণ গাড়ু ও গামছা। যেখানেই যেতেন গাড়ু আর গামছাটি সঙ্গে থাকত। কোনও প্রশ্নে আটকে গেলে, গাড়ু আর গামছাটি নিয়ে খানিক পায়চারি করতেন, তারপর গাড়ুর জলে মুখ ধুয়ে, গামছায় মুখ মুছে নিমেষে সমাধান করে দিতেন।

একবার দক্ষিণেশ্বরে মথুরবাবু পণ্ডিতদের তর্কসভার আয়োজন করেছেন। পণ্ডিতজি উপস্থিত। সঙ্গে সেই গাড়ু গামছা। রামকৃষ্ণ হৃদয়কে বললেন, শিগগির ও দুটো লুকিয়ে ফেল। একটি প্রশ্নে এসে সবাই আটকে গেছেন। মীমাংসা হচ্ছে না। পণ্ডিতজি উঠে পড়লেন। যথারীতি গাড়ু গামছার অন্বেষণ। রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, 'পাবে না, আমি লুকিয়ে রেখেছি।'

পদ্মলোচন বললেন, 'তুমি কী করে জানলে? কেউ জানে না এ কথা।'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'মা, আমাকে বলে দিয়েছেন। মা বললেন, ও ভক্তিমার্গের লোক, ওই গাড়ু, গামছার জন্যে শুকনো পাণ্ডিত্যে আটকে আছে। তুই পথ খুলে দে।'

পণ্ডিতজি কেঁদে ফেললেন। রামকৃষ্ণর হাত দুটো ধরে বললেন, 'তুমিই আমার ইষ্ট। আমি পণ্ডিতসভা আহ্বান করে প্রমাণ করব, রামকৃষ্ণ যুগাবতার।'

সেই সভাই হল, পণ্ডিতজি আসতে পারলেন না। খবর পাঠালেন, অতিশয় অসুস্থ। তোমরা সভা করছ করো তবে সূর্যকে দেখার জন্যে লণ্ঠনের প্রয়োজন হয় না।

রামকৃষ্ণ গিয়ে দেখলেন, পদ্মলোচন গঙ্গার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছেন। চমকে মুখ ফেরালেন,

'রামকৃষ্ণ! তুমি এলে?'

'কেমন আছ?'

'বুঝতেই পারছ। মানুষ গঙ্গার ধারে কখন আসে!'

'সময় হয়নি। আরও খানিকটা হাঁটতে হবে।'

'খুব সাধনভজন হচ্ছে। খবর পেয়েছি।'

'মথুরা অনুরোধ করেছে, দক্ষিণেশ্বরে উৎসব। হ্যাঁগো, তুমি যাবে না?'

'তোমার সঙ্গে হাড়ির বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসতে পারি! কৈবর্তের বাড়িতে সভায় যাব, এ আর বড় কথা কী? তবে একটাই কথা, তুমি এসে ভালই করেছ এই বিদায়বেলায়। আমি কালই কাশীধামে চলে যাচ্ছি ভাই। কাশীতে যে মরে তার আর পুনর্জন্ম হয় না। ভক্তির পথে তুমি আমাকে আরও একটু এগিয়ে দাও। জ্ঞান নয় ভক্তি। ভক্তেরই ভগবান, ভগবানেরই ভক্ত।'

পদ্মলোচন রামকৃষ্ণের হাত দুটো ধরলেন। চোখে জল। পশ্চিমে ছল ছল গঙ্গা।

রামকৃষ্ণ ভারাক্রান্ত মনে ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরের বিশাল আয়োজনে। মা অন্নপূর্ণা হবেন। নাটমন্দিরে চালের পাহাড়, তিলের পাহাড়। প্রসিদ্ধ কীর্তন গায়িকা সহচরী এসে গেছেন, এসে গেছেন রাজনারায়ণ, চণ্ডীর গান হবে, যাত্রা হবে, রাজা হরিশ্চন্দ্র।

রামকৃষ্ণ আনন্দে ডগমগ। এত লোক, এত আলো, এত ফুল! কুঠিবাড়িতে বাদ্যযন্ত্র বাঁধার আওয়াজ। এ কি দক্ষিণেশ্বর না অযোধ্যা! রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক! রাজনারায়ণ গলা সাধছেন, সহচরী চুল বাঁধছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঘুরে ঘুরে সব দেখছেন। মথুরামোহন মাঝে মাঝেই জিজ্ঞেস করছেন, 'বাবা! সব ঠিক তোমার মনের মতো হচ্ছে তো!'

রামকৃষ্ণ উত্তর দেবেন কী, দুটি হাত বুকের কাছে জোড়া করে মন্দিরের উঠোনে, বাগানে কিশোর বালকের মতো ঘুরছেন। ভাবের ঘরে আছেন। একবার শুধু মথুরামোহনকে বললেন, 'তুমি আমাকে সার্কাস দেখাবে? সেই যে দড়ির ওপর ছাতা মাথায় নৃত্যকী।'

'কেন দেখাব না, উইলসনের সার্কাস গড়ের মাঠে আসছে। আবার সায়েবরা বেলুন ওড়াবে। আচ্ছা, ভৈরবী মা কোথায়! অনেকক্ষণ দেখছি না!'

'সে তো দেবমণ্ডলের ঘাটে।'

'কেন তুমি নির্বাসনে পাঠালে! এখানে কী সমস্যা হল!'

'সে অনেক ব্যাপার।'

'হৃদয়!'

রামকৃষ্ণ হেসে সরে গেলেন। আলো, আলো, আলো, চতুর্দিকে

Scanned by CamScanner

আলো।

পরের দিন ভোরের সানাই শেষ হতে না হতেই ভিড় লেগে গেল উদ্যানে। দিগ্বিদিক থেকে এসেছেন সাধু, সন্ত, সজ্জন। কলকাতার হাল বাবুরা, বিবিরা এসেছেন জুড়ি গাড়িতে চেপে। সহচরীর কীর্তন শুরু হয়েছে। নাটমন্দিরে সে এক অপূর্ব দৃশ্য! একদিকে চালের সাদা পাহাড়, একটু ব্যবধানেই তিলের কালো পাহাড়। মাঝে মাঝে রুপোর টাকা আর গিনির স্তূপ। পাহাড় দুটি তৈরি হয়েছে সহস্র মণ চাল, সহস্র মণ তিল দিয়ে। মথুরবাবু বড়বাজারের আড়ত খালি করে দিয়েছেন। আট বছর আগে সেই মন্দির প্রতিষ্ঠার পর এতবড় উৎসব আর হয়নি। সকলের মুখেই এক কথা, 'বাবুর বাবু মথুরবাবু!'

মথুরামোহন এক ফাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন, 'আজ, তুমি আমার পাশ ছেড়ে কোথাও যাবে না। তুমি আমার শক্তি। তোমার জন্যেই এসব হচ্ছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ পরম সোহাগে মথুরামোহনের হাত দুটি চেপে ধরে বললেন, 'ও সেজবাবু। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব! তবে একটা কথা, যে যা বলে বলুক, তুমি আমাকে অবতার বলে প্রচার কোরো না। আমি মায়ের ছেলে।'

তুমিও মায়ের ছেলে। আমরা দুটি ভাই, এই সংসার মজার কুটি; আমরা খাই দাই আর মজা লুটি॥ মোণ্ডা খাজা খুরমা গজা মোদক-বিপণি শোভনম্।'

'এ আবার কী গান গো?'

'কত রকম আছে আমার কাছে! তুমি কি ভাবো, আমি শুধু মা, মা করে কেঁদে মরি। আমি রসেবশে থাকি। শুনবে আর একটা?'

'শোনাও।'

'তাহলে একটা আগমনী শোনো। আজকের আকাশ দেখেছ? শরতের আকাশ।

কে মা এলি গো গিরে দাদার বেটি।
দোনো ছোকরা বি সাৎ, দোনো ছুকরি বি সাৎ,
আর এক বেটা জুলপি কাটা,
বাঘটা কামড়ে নেচে টুটি॥'

মথুরামোহন হাহা করে হাসছেন। কর্মচারীরা ভাবছে, আজ তো হাসবারই দিন। রানি চলে যাওয়ার পর বাবু বড় বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন, তার ওপর ছোট ভটচাজের ওই পাগলামি!

চাল, তিল, ফলমূল, সোনাদানা নিয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা সব একে একে বিদায় নিচ্ছেন। ঘাটে সার সার নৌকো লেগে আছে। অঢেল খাওয়া-দাওয়া, অফুরন্ত ধুমধাম। সন্ধে হতে না হতেই বসল গানের আসর। মথুরামোহনের পাশেই শ্রীরামকৃষ্ণ। মথুরামোহন মনে মনে ভেবেই রেখেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বিচারক। ঠাকুরের ভাব, মুহুর্মুহু সমাধি দেখে গানের তারতম্যের বিচার হচ্ছে। নির্ধারিত হচ্ছে পাওনা। কেউ পাচ্ছেন বহুমূল্য শাল, কেউ রেশমি বস্ত্র, প্রচুর মুদ্রা। ছোট ঠাকুরের পরিতৃপ্তিতে মথুরামোহনের অকৃপণ পারিতোষিক দান।

তিন দিন ধরে চলল সেই উৎসব। কীর্তন, চণ্ডীর গান, যাত্রা পালা। অবশেষে সব সুনসান।

ভৈরবী দেবমণ্ডলের ঘাটে জাঁকিয়ে বসেছেন। গোটা পল্লি তাঁর দখলে। বীরাচারী তান্ত্রিক তিনি। কারও পরোয়া করেন না। ভেতরে প্রেমও আছে। কখনও শ্রীরাধিকা, কখনও মাতা যশোদা। নিয়োগী গিন্নির কাছে বেনারসী আর গয়না চেয়ে নিয়ে সাজেন। সাঁঝের বেলা সখীপরিবৃত হয়ে গান গাইতে গাইতে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে চলে আসেন।

তন্ত্রে সিদ্ধিলাভের পর রামকৃষ্ণের সম্পূর্ণ বালকভাব। সেইরকম দেহকান্তি, ভাব, আচার। জগৎটা শুধু আনন্দে ভরা। ভেদ-বিভেদ অদৃশ্য। সুজনি আর তুলসী এক। অমলিন হাসি, অদ্ভুত নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার, ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দময় অবস্থান। ভৈরবীর ধারণা, রামকৃষ্ণের তিনি সম্পূর্ণ অধিকারী। রামকৃষ্ণ একমাত্র তাঁর।

সোনার শেকলও শেকল। রামকৃষ্ণকে কে বাঁধবে। সাধিকা হলেও রমণী। রমণী মাত্রেই ভীষণ ভালবাসার পাত্রকে সম্পূর্ণ অধিকারে পেতে চায়। না পেলে ঈর্ষা আসে। তুমি তোমার মতে চলবে কেন? আমার মতই তোমার মত, আমার পথই তোমার পথ। রামকৃষ্ণ তুমি আমার সম্পদ, তুমি আমার ইষ্ট, তুমি আমার অবশিষ্ট।

রামকৃষ্ণ ভৈরবীর স্নেহ আর অধিকারবোধের আধিক্য দেখে মনে মনে ভাবেন, তুমি যে এলে, সে কী নিজের ইচ্ছেতে, না জগদম্বার নির্দেশে! তোমাকে সেজবাবু যখন জিজ্ঞেস করেছিল, ভৈরবী! তোমার ভৈরব কোথায়! তখন তুমি মায়ের পদতলে শায়িত শিবকে দেখিয়ে বলেছিলে, ওই তো। সেজবাবু বলেছিলেন, উনি তো অচল। তুমি বলেছিলে, অচলকে সচলই যদি করতে না পারি, তাহলে আমি কেমন ভৈরবী। তাহলে, তোমার সচল ভৈরবকে আবার অচল করতে চাইছ কীসের মোহে! আমাকে যে সব পথ ধরে একবার করে যেতে হবে। বাদ্যযন্ত্র যেমন বাদনের জন্যে, আমার এই নরশরীরও তেমনি সাধনের জন্যে। তুমি তো ভাগবতে সুপণ্ডিত! পড়োনি, অবধূতের চব্বিশ গুরু।

ভৈরবী তুমি বীরাচারী, তোমার যে এখনও ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি। রামকৃষ্ণ এইবার তোমাকে কিছু দেবে। ধরে নাও সেইটিই আমার গুরুদক্ষিণা। তুমি শুধু আমার পাশে থেকে দেখো। সব একে একে আসছেন। এলেন জটাধারী। সঙ্গে তাঁর রামলালা। জীবন্ত জাগ্রত বালক শ্রীরামচন্দ্র। ভৈরবী দেখলেন রামকৃষ্ণ জটাধারীর কাছে দীক্ষা নিলেন। তন্ত্র সাধনার সময় যা হয়েছিল এ ক্ষেত্রেও তাই হল। গোপালমন্ত্রে সিদ্ধকাম জটাধারীর দেওয়া ইষ্টমন্ত্রেও তাঁর প্রদর্শিত পথে সাধন করে কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের বালগোপালমূর্তির দিব্যদর্শন পেলেন। দেখলেন,

যো রাম দশরথকা বেটা,
ওহি রাম ঘট-ঘটমে লেটা।
ওহি রাম জগৎ পসেরা,
ওহি রাম সবসে নেয়ারা।

অনুক্ষণ বালক শ্রীরাম তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। পঞ্চবটীতে, গঙ্গায়, তাঁর ঘরে। সঙ্গ ছাড়ে না। নানা দুষ্টুমি, বকাঝকা, মান অভিমান। ভৈরবী খুশিই হলেন। রামকৃষ্ণ ভাবমুখে। ভৈরবীও বাৎসল্য রসে সিক্ত। শেষে এমন হল, জটাধারী দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করবেন, রামলালা যাবেন না। তুমি যাও, আমি রামকৃষ্ণের কাছে থাকব। রামকৃষ্ণের কাছে বিগ্রহটিকে রেখে জটাধারী চোখের জলে বিদায় নিলেন। ভৈরবী এই সাধনে তাঁকে সাহায্য করলেন, কারণ বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনে তিনিও অভিজ্ঞা। তাঁর গলাতেও ঝুলত রঘুবীর শিলা। রামকৃষ্ণ দর্শনের প্রথম দিনেই চিনতে পারলেন রামকৃষ্ণই সেই ইষ্ট। দ্বিপ্রহরে শিলাটিকে বিসর্জন দিলেন গঙ্গায়।

ভৈরবী জিজ্ঞেস করলেন, 'এবারে কী?'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'এবার মধুরভাবে তাঁকে দেখব। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে। আমি শ্রীরাধা হব।'

'তুমি ব্রজগোপী হবে! আমিও তো মাঝে মাঝে সেই ভাব আরোপ করি নিজের ওপর। তখন তো তোমাকেই কৃষ্ণ দেখি।'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'বেশ তো, আমরা দুজনেই ব্রজগোপী হব।'

মথুরবাবু বললেন, 'খুব ভাল কথা, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল বেনারসী শাড়ি, ঘাগরা, ওড়না, কাঁচুলি, পরচুল, আর একপ্রস্থ ডায়মনকাট অলঙ্কার। ঠাকুর ব্রজগোপী হলেন। ভাবের এমনি তন্ময়তা, রামকৃষ্ণের দেহে অদ্ভুত এক রূপান্তর এল। চলন, বলন, হাসি কটাক্ষ, অঙ্গভঙ্গী, সব মেয়েদের মতো। কোথায় রামকৃষ্ণ। এ যে যুবতী গোপবালা। পরিস্ফুট স্তন। কখনও দুগ্ধ নিঃসারি। লিঙ্গস্থলে যোনি। সেই যোনি আবার মাসে তিন দিন পুষ্পিতা।

ভৈরবী হৃদয়কে বললেন, 'কী আশ্চর্য ব্যাপার। এমনও হয়। ওই দেখো বাগানে ফুল তুলছে, কে বলবে পুরুষ! যেন সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকা। এগোবার সময় যতবার পা ফেলছে মেয়েদের মতো বাঁ পাটা আগে পড়ছে। কোথায় আমার ভৈরব! হল না, আমার কিছুই হল না।'

হৃদয় বললেন, 'শোনো, সেদিন কী হয়েছে জানো। মথুরাবাবু মামাকে জানবাজারে নিয়ে গেছেন। আমিও গেছি। মামা ভেতরে মেয়ে মহলে। কিছুক্ষণ পরে মথুরাবাবু আমাকে ডাকছেন, বলো তো হৃদয়, ওই মেয়েদের মধ্যে তোমার মামা কোনটি। বিশ্বাস করো, প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ আমি চিনতে পারিনি।'

আবার শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে মহাভাবের লক্ষণ ফুটছে। রোজ শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউকে সাজাচ্ছেন। মা ভবতারিণীকে সাজিয়ে কাত্যায়নীর কাছে ব্রজবালাদের মতো প্রার্থনা করছেন কেঁদে কেঁদে, আমি শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে চাই। সোচ্চারে বলছেন,

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাগ্রোগিন্যধিশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

হৃদয় ভৈরবীকে বললে, 'দিনের বেলায় তুমি দেখো, রাতের বেলায় আমি। মামার গায়ে হাত দিতে আমার ভয় করে। পুরুষ না রমণী! রাতটা আমি চালিয়ে দোবো। দিনের বেলায় তুমি। তুমি রমণী, মামাও রমণী!'

ভৈরবী এখন রামকৃষ্ণের মা। রামকৃষ্ণের শরীরে এখন শ্রীমতীর বিরহ জ্বালা। মহাপ্রভুর যেমন হয়েছিল। রোমকূপে বিন্দু বিন্দু রক্ত, ঘামের মতো। প্রচণ্ড উত্তপ্ত। ভৈরবী অতি যত্নে সর্বাঙ্গে চন্দন লেপন করছেন, সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই। শ্রীরামকৃষ্ণ পড়ে আছেন সংজ্ঞাহারা। দেহের সমস্ত গ্রন্থির জোড় খুলে গেছে। মথুরবাবু মাঝে মাঝে এসে দেখে যাচ্ছেন, আর

Scanned by CamScanner

ভাবছেন, ভৈরবী মা না থাকলে কী হত ! কে এমন সেবা করত দক্ষ হাতে ! ভীষণ উৎকণ্ঠা তাঁর, শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর থাকবে তো !

শ্রীরামকৃষ্ণ অবশেষে শ্রীমতীর দর্শন পেলেন। 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্বস্বহারা, নিরুপমা, অশেষ মহিমা ও মাধুরীমণ্ডিতা, নাগকেশর পুষ্পের কেশর সকলের ন্যায় গৌরবর্ণা। রামকৃষ্ণ বসে আছেন। হঠাৎ দেখছেন, অপূর্ব রূপলাবণ্য তাঁর, পূর্ণযুবতী, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। পরনে জরির পেশোয়াজ, কাঁচুলি, ওড়না। অলঙ্কারে বিভূষিতা। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশজাল। সেই চুলের কিছু নেমে এসেছে কপালে। গালের দু পাশে। অপূর্ব সুন্দর মুখ। রামকৃষ্ণের দিকে অনিমেষে তাকিয়ে আছেন। মুখে মৃদু হাসি। উভয় হাতের আঙুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে চাপ দিচ্ছেন সেই শ্রীমূর্তি।

রামকৃষ্ণ চিনতে পেরেছেন। শ্রীমতী ! বলামাত্রই শ্রীমতী রামকৃষ্ণের দেহে মিলিয়ে গেলেন। জ্ঞান হারালেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের সারা পিঠ পুড়ে গেছে। আগুনের মতো লাল, গোল গোল ছাপ। মথুরামোহন মা জগদম্বার সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছেন, মা, এ কী করলে, রক্ষা করো মা, দেখো মা, তোমার পরমভক্তের প্রাণসংশয় যেন না হয়।

এর পরেই দেখা দিলেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। 'নীলবর্ণ ঘাসফুলের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট।' দর্শন দিয়েই রামকৃষ্ণের শরীরেই মিলিয়ে গেলেন শ্রীমতী রাধারানির মতো। এই সাধনকালে তিনি ব্রজগোপীদের দর্শনও পেলেন। পঞ্চবটী তখন বৃন্দাবন। সুঠাম, সুললিতা ব্রজাঙ্গনাদের সমাবেশে রামকৃষ্ণ। 'গোপীদের কাছে খাওয়া, খেলা, কাঁদা, আবদার।'

রামকৃষ্ণের গর্ভধারিণী চন্দ্রাদেবী মথুরবাবুর অন্নমেরু দর্শনে এসে নহবতের দ্বিতলে আছেন। ভৈরবীকে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'ও মা, কী বুঝছ !'

ভৈরবী হেসে সাহস দেন, 'যা হচ্ছে, তা পরে আর হবে কি না জানি না দিদি !'

মথুরবাবু সুযোগ পেলেই বৃদ্ধা জননীর খোঁজখবর নিতে আসেন। তিনি রামকৃষ্ণের জননী ! তদারকির কোনও ত্রুটি যেন না হয়। মথুরামোহন জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠাকুরমা, এতদিন হল, তুমি তো আমার সেবা কিছু নিলে না। তুমি যদি সত্যি আমাকে আপনার বলে ভাব, তাহলে তোমার যা ইচ্ছে আমার কাছে চেয়ে নাও। তোমার মথুর এখনও বেঁচে আছে।'

বৃদ্ধা অতিশয় বিব্রত। সামনে সুপুরুষ, অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী জমিদার মথুরামোহন। তিনি তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে। চন্দ্রদেবী খতিয়ে দেখছেন মনে মনে তাঁর কীসের অভাব ! শেষে বললেন, 'বাবা ! তোমার কল্যাণে আমার তো কোনও অভাব নেই।' নিজের পেটরাটা খুলে মথুরামোহনকে দেখাতে দেখাতে বললেন, 'বাবা। এই দেখো আমার এত কাপড়। আর খাওয়াদাওয়া ! তোমার ব্যবস্থায় সারা দিনই তো খাচ্ছি। আর বাবা, তুমি আমাকে গঙ্গার ধারে এত সুন্দর জায়গায় রেখেছ ! আমার কীসের অভাব বাবা !'

মথুরবাবু সহজে ছাড়ার পাত্র নন। তিনি জেদ ধরলেন, 'কিছু একটা নিতেই হবে।'

বৃদ্ধা আবার ভাবতে বসলেন। হঠাৎ তাঁর মুখ উজ্জ্বল হল। একটা অভাব খুঁজে পেয়েছেন অবশেষে। হাসতে হাসতে বললেন, 'বাবা ! মনে পড়েছে এতক্ষণে, আমার মুখে দেবার গুল ফুরিয়ে গেছে, তুমি এক আনার তামাক পাতা, ওই যে দোক্তা পাতা, আনিয়ে দাও। অনেক দিন চলে যাবে।'

বিষয়ী মথুরবাবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। চোখে জল এসে গেছে। ধরা ধরা গলায় বললেন, 'এমন মা না হলে কী অমন ছেলে হয় !' মথুরবাবু পা ছুঁয়ে প্রণাম করে চলে গেলেন।

আবার এক যোগাযোগ। রামকৃষ্ণ বসে আছেন তাঁর প্রিয় পঞ্চবটীতে। কেউ কোথাও নেই। হৃদয় দিবানিদ্রায়। মা নহবতে। ভৈরবী দেবমণ্ডলে। রামকৃষ্ণের সামনে এক বিশালকায় সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন। হাতে সুদীর্ঘ চিমটা, ঝকঝকে লোটা আর একটি চর্মাসন। মোটা চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি আবার কে এলে গো !'

দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত নাগা, ন্যাংটা সন্ন্যাসী তোতাপুরী। রমতা সাধু আমি। আকাশ আমার ছাত, সম্বল এই চিমটে, লোটা, বাঘ ছালের আসন। সাগ্নিক। অগ্নির সেবা করি। পরমহংস। যখন যেখানে মন চায় চলে যাই। কোথাও তিন রাতের বেশি থাকি না। মধ্যভারত থেকে পুরী, পুরী থেকে গঙ্গাসাগর, সেখান থেকে এখানে।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'এসেছ যখন বসে পড়ো আমার পাশে। এমন জায়গা আর পাবে কোথায় !'

তোতাপুরী রামকৃষ্ণকে দেখছেন। অনুভব করছেন। তিনি সিদ্ধ সাধক। নর্মদার নির্জন গুহায় দীর্ঘকাল একান্ত সাধনায় নির্বিকল্প সমাধিতে সিদ্ধিলাভ করেছেন। ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়েছে। মায়াকে চিনতে পেরেছেন। নিত্য আর অনিত্যের বোধ পাকা হয়েছে। চিনতে পারছেন রামকৃষ্ণকে। অতি উচ্চ আধার।

'বেটা', ব্রহ্মজ্ঞান নেবে ? নির্বিকল্প সমাধির স্বাদ নেবে ! আমি তোমাকে দিতে পারি।'

ভৈরবী শুনে খুব অসন্তুষ্ট হলেন, 'এ পর্যন্ত আমি তোমাকে কিছু বলিনি। এইবার আমি তোমাকে বাধা দেবো। আমি চাই না যে, তুমি বেদান্তের শুকনো পথে যাও। তুমি প্রেমে থাকবে, ভক্তিতে থাকবে, রূপে, রসে, গন্ধে থাকবে, আনন্দে থাকবে, মান, অভিমানে থাকবে, জড় সমাধিতে তোমার কি হবে ! ওই ল্যাংটা তোমাকে নাচালে আর তুমি নেচে গেলে !'

রামকৃষ্ণ শান্ত গলায় বললেন, 'তুমি বললে কি হবে গো, মা যে আমাকে অনুমতি দিলেন, যেমন তোমার কাছে তন্ত্রের বেলায় দিয়েছিলেন।'

ভৈরবী আর একটিও কথা না বলে উঠে গেলেন। অভিমান ! রামকৃষ্ণের মুখে খেলে গেল মৃদু হাসি।

তোতাপুরী ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন পঞ্চবটীতে। রামকৃষ্ণকে বললেন, 'কেয়া মিলা ?'

'হ্যাঁ, মা বললেন, যাও। এ-ও বললেন, তুমি নাকি আমার জন্যে এসেছ।'

'ও ভি হো সেকতা।'

বেশ গা ছমছমে রাত। তোতাপুরী তাঁর এক অদ্ভুত দর্শনের কথা বললেন। ধুনি জ্বালিয়ে ধ্যানে বসবেন এমন সময় ঝড় নেই কিছু নেই গাছের ডালপালা ভীষণ দুলে উঠল। একটা গাছ থেকে নেমে এল বিশাল আকৃতির এক মানব। নেমে এসেই বসে পড়ল ধুনির পাশে। তোতাও উলঙ্গ, মানুষটিও উলঙ্গ। তোতা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, কে তুমি ? সেই পুরুষটি বললে, আমি দেবযোনি ভৈরব, এই দেবস্থান রক্ষা করি।

তোতাপুরী বললেন, খুব ভাল কথা, তুমি আর আমি এক—তুমিও ব্রহ্মের এক প্রকাশ, আমিও তাই। এসো, বসো, ধ্যান করো।

সেই পুরুষ হা হা করে হেসে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'হ্যাঁ, উনি এইখানে থাকেন। বহুবার আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। ওই যে দেখছ উত্তরে কোম্পানির বারুদখানা, ওরা এই বাগানটা নিয়ে নেবে বলেছিল। শুনে আমার খুব মন খারাপ, কোথায় বসে সাধনভজন করব ! মথুরবাবু মামলা করলে। সেই সময় একদিন ওই ভৈরবকে গাছে বসে থাকতে দেখলুম। আমাকে সঙ্কেতে জানালেন, কোম্পানি জায়গা নিতে পারবে না। মামলায় হেরে যাবে। আর ঠিক তাই হল।'

তোতাপুরী বললেন, 'কাল তোমার সন্ন্যাস দীক্ষা।'

কেউ জানল না। না চন্দ্রাদেবী, না ভৈরবী। ছেলে সন্ন্যাসী হচ্ছে, শুনলে বৃদ্ধা মা দুঃখ পাবেন, আর ভৈরবী শুনলে বলবেন, সে কি, তন্ত্রে পূর্ণাভিষেকের সময়, আমি তো সবই করিয়ে দিয়েছি।

তোতাপুরী বললেন, 'সমঝ গিয়া। সব গোপনেই হবে।'

দিবসের তৃতীয় প্রহরে, পঞ্চবটীর নিভৃত কোণে শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া সম্পূর্ণ হল। নিজের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানও করলেন। মস্তক মুণ্ডন হল। শ্রীরামকৃষ্ণ কুঠিবাড়ির দিকে এলেন না। আত্মগোপন করে রইলেন সাধনকুটিরে। সকলের খুবই কৌতূহল, কি হচ্ছে ! সাহস নেই আসার। বিশাল নাগা নাঙ্গা সন্ন্যাসী। রেগে গেলে চিমটে নিয়ে তাড়া করেন। ধুনির জ্বলন্ত কাঠ ছুড়ে মারেন।

রাত প্রায় শেষ। শুভ ব্রাহ্ম মুহূর্তে সাধনকুটিরের দরজা বন্ধ করে আচার্য তোতাপুরী শুরু করলেন বিরজা হোম। সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ একে একে সব ত্যাগ করতে লাগলেন, শিখা সূত্র, বস্ত্র, উপাধি, নামরূপ। সব বিসর্জন দিলেন হোমাগ্নিতে। ব্রহ্মজ্যোতির প্রতীক গেরুয়া ধারণ করলেন।

তোমার নতুন শরীরের কী নাম হবে ? রামকৃষ্ণ, আচ্ছা নাম। রাম অওর কৃষ্ণ, দোনো মিলাকে রামকৃষ্ণ।

নির্জন, রুদ্ধদ্বার, প্রায়ান্ধকার সেই সাধন কুটিরে গুরু আর শিষ্য। উজ্জ্বল গৈরিকে, দিব্যরূপে রামকৃষ্ণ অপরূপ। গুরু তোতাপুরী ত্রিসূপর্ণ মন্ত্র পাঠ করছেন। শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ আহুতি প্রদান করছেন হোমাগ্নিতে,

'পরব্রহ্মতত্ত্ব আমাতে আবির্ভূত হউক। পরমানন্দ লক্ষণোপেত বস্তু আমাকে প্রাপ্ত হউক। অখণ্ডৈকরস মধুময় ব্রহ্মবস্তু আমাতে প্রকাশিত হউক..।'

নামরূপের দৃঢ়পিঞ্জর সিংহবিক্রমে ভেদ করে বেরিয়ে এসো রামকৃষ্ণ। নামরূপাত্মক জগৎ লুপ্ত। তুমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে নিমগ্ন হও হৃদি রত্নাকরের অগাধজলে। তোমার আত্মা দিয়ে আত্মস্বরূপকে জানো।

Scanned by CamScanner

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্ ।

হচ্ছে না, কিছুতেই মন যাচ্ছে না নির্বিকল্প সমাধিতে । সব যাচ্ছে, যেতে চাইছেন না মা ভবতারিণী ।

রামকৃষ্ণ অসহায়ের মতো বললেন, 'হোতা নেহি ।'

গুরু তোতাপুরী ভীষণ উত্তেজিত হয়ে, ভীষণ ক্রোধে বললেন, 'কেঁও হোগা নেহি, হোগা নেহি কেঁও ।'

তোতাপুরী ঘরের চারপাশে তাকালেন । কোণের দিকে একটুকরো ভাঙা কাঁচ । একটা দিক ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ । তোতাপুরী সেইটিকে তুলে নিলেন । তীক্ষ্ণ দিকটা সজোরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রূমধ্যে বিদ্ধ করে বললেন, 'হিঁয়া, হিঁয়া । সমস্ত মনটাকে গুটিয়ে এই বিন্দুতে নিয়ে এস । হিঁয়া রাখো ।'

ভ্রূমধ্যের সেই সূক্ষ্ম যন্ত্রণাস্থলে মনকে নিবিষ্ট করে শ্রীরামকৃষ্ণ নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্মে যাবেন কি, আবার কালীরূপ ! মা হাসছেন । সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানখড়্গ বের করে মনে মনে মা ভবতারিণীকে দুখণ্ড করে ফেললেন । তখন মনে আর কোনও বিকল্প রইল না । হু হু করে উঠে গেল সমগ্র নামরূপ রাজ্যের ওপরে । সম্পূর্ণ সমাধি ।

শিষ্যের সামনে গুরু । রামকৃষ্ণ 'কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ' । শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না । ভাস্বর, স্থির একটি মুখ । এক সার পিঁপড়ে পিঠ বেয়ে উঠছে । অনেকক্ষণ বসে রইলেন তোতাপুরী । অবশেষে নিঃশব্দে উঠে ঘরের বাইরে এসে দরজায় তালা দিলেন । কেউ হঠাৎ এসে যেন বিরক্ত না করে ।

একদিন গেল, দুদিন গেল. তিনদিন গেল । তালাবন্ধ ঘর । ভেতরে কোনও সাড়াশব্দ নেই ।

চতুর্থ দিনে তোতাপুরী তালা খুললেন । শিষ্যকে আসনে যে-ভাবে বসিয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই উপবিষ্ট । দেহে প্রাণের প্রকাশমাত্র নেই, মুখ কিন্তু প্রশান্ত, গম্ভীর, জ্যোতির্ময় । অভিজ্ঞ গুরু বুঝলেন, বহির্জগৎ সম্পর্কে শিষ্য এখনও সম্পূর্ণ মৃতকল্প । নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো চিত্ত ব্রহ্মে লীন । যে অবস্থায় উপনীত হতে তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল চল্লিশ বছরের কঠোর সাধনার, রামকৃষ্ণের লাগল মাত্র তিনদিন । তোতাপুরীর সামান্য সন্দেহ তখনও । শুরু হল তন্ন তন্ন পরীক্ষা । বুকে কান পাতলেন, হৃদস্পন্দন নেই । নাকের কাছে সূক্ষ্ম সুতো ধরলেন । শ্বাস নেই । শরীরে আঘাত করলেন বার বার । কাঠের পুতুল ।

গুরু তোতাপুরী বাইরে এসে একটি কথাই বললেন, 'য়হ ক্যা দৈবী মায়া ।'

সমাধি ভাঙানোর প্রক্রিয়া শুরু হল । এইভাবে একুশ দিন পর্যন্ত থাকা যায় । তারপর দেহ চলে যায় । তোতা প্রক্রিয়া শুরু করলেন । 'হরিওম্'-মন্ত্রের সুগভীর আরাবে পঞ্চবটী ঝঙ্কৃত হল ।

কুঠিতে বসে মথুরবাবুর স্বগতোক্তি, এই দীনের কি ভাগ্য !

হৃদয় ভৈরবীকে বললে, 'শুনছ ?'

ভৈরবী বললেন, 'শুনছি !'

হলধারী বললেন, 'এতদিনে একজন প্রকৃত গুরু পেয়েছে । মেয়ে সেজে ঘুরছিল । আত্মজ্ঞানবিহীন হয়ে । তোতাজির সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করে বুঝেছি, সিদ্ধ মহাপুরুষ ।'

হরি ওম্, হরি ওম্ মন্ত্রে রামকৃষ্ণ নির্বিকল্প থেকে নেমে এলেন রূপ ও রসের জগতে । শিষ্যপ্রেমে মুগ্ধ তোতা বললেন, 'হো সকতা । দেখা ! রামকৃষ্ণ তুমি পরমহংস । রামকৃষ্ণ পরমহংস । জগতে এই তোমার পরিচয় ।'

॥ এগার ॥

তিনদিনের জায়গায় এগারো মাস শিষ্য রামকৃষ্ণের কাছে থেকে গেলেন গুরু তোতাপুরী । অদ্বৈত সাধনার চূড়ান্ত হল । যাওয়ার সময় রামকৃষ্ণকে বলে গেলেন, 'বেটা ! তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না । এসেছিলুম বেদান্ত নিয়ে যাচ্ছি ভক্ত হয়ে । তোমার কাছে শিখে গেলুম, নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য । জ্ঞান, অজ্ঞান, চৈতন্য, অচৈতন্য, বিদ্যা মায়া, অবিদ্যা মায়া, ভ্রম, সংশয়, শূন্য, পূর্ণ, সবই ব্রহ্মে অবস্থিত । সমুদ্রের ঢেউ সমুদ্রেতেই আছে । সমুদ্রের ঢেউ, ঢেউয়ের সমুদ্র নয় । তুমি হাততালি দিয়ে হরিনাম করছিলে একদিন, আমি বলেছিলুম, আরে, কেঁও রোটি ঠোকতে হো ? তুমি সেদিন বলেছিলেন, দূর শালা, আমি ঈশ্বরের নাম করছি । এসেছিল গুরু, চলে যাচ্ছে বন্ধু । ধর্মের জগতে এমন হয়নি, হবেও না । এই চকচকে লোটাটা দেখিয়ে বলেছিলুম, রোজ মাজতে হয়, সাধনের মতো, তবেই না ঝকঝকে । সঙ্গে সঙ্গে তুমি বলেছিলেন, লোটাটা যদি সোনার হয় । রামকৃষ্ণ ! তুমি সোনার লোটা । বলো তো কোন কোন পরাজয়ে জয়ের অধিক আনন্দ ? শিষ্যের কাছে গুরুর, পুত্রের কাছে পিতার ।'

তোতা চলে গেলেন পঞ্চবটীর পাঠ চুকিয়ে । রমতা সাধু, বহতা পানি । তীর ছুঁয়ে গেল । মনটা খুব খারাপ । আরও খারাপ হল, মথুরামোহন যখন এসে বললেন, 'ঠাকুর, জগদম্বা বোধহয় বাঁচবে না ।'

জগদম্বা মথুরামোহনের দ্বিতীয় স্ত্রী ।

মথুরামোহন অত্যন্ত সুপুরুষ, কিন্তু দরিদ্রের সন্তান । রানি রাসমণির সঙ্গে অদ্ভুত মিল । রাসমণিও দরিদ্রের কন্যা ।

মথুরের রূপ আর গুণ দেখেই নিজের তৃতীয় কন্যা করুণাময়ীর বিয়ে দিলেন । করুণাময়ীর অকালমৃত্যুতে ছোট মেয়ে জগদম্বার সঙ্গে আবার বিয়ে দিলেন । পাশে মথুর না থাকলে রাসমণি অতিশয় অসহায় । মথুরের বিষয়বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, পরিচালন ক্ষমতা, সততার গুণগ্রাহী ছিলেন রানি । স্বামীর মৃত্যুর পরে মথুরের সাহায্যেই রাসমণির বিকাশ । রাসমণির প্রয়াণের পর জমিদারিতে দক্ষিণ হস্ত মথুরেরই একাধিপত্য । মথুরামোহন স্ত্রীকে যেমন ভালবাসেন সেইরকম সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কেও সচেতন । রামকৃষ্ণের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবার জন্যে জমিদারিতে থাকার খুবই প্রয়োজন ।

রোগীর অবস্থা দেখে ডাক্তার-বৈদ্যরা জবাব দিয়ে গেছেন । দুরারোগ্য গ্রহণী রোগ ।

মথুরামোহন উন্মাদপ্রায় । জানবাজার থেকে ছুটে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে । ঠাকুরকে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে পঞ্চবটীতে দর্শন পেলেন । ঠাকুরের পা দুটি জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আমার যা হবার তা তো হতেই চলেছে ; কিন্তু বাবা ! আমি যে তোমার সেবার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হতে চলেছি !'

রামকৃষ্ণ মথুরকে হাত ধরে তুলে পাশটিতে বসালেন । মথুরের পিঠে হাত রেখে ভাবাবিষ্ট রইলেন. কিছুক্ষণ, তারপর আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'ভয় নেই মথুর । যাও, জগদম্বা ভাল হয়ে গেছে ।'

মথুর জানেন, রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ দেবতা ।

তিনি ছুটলেন জানবাজারে । মন আলোড়িত । গিয়ে কি দেখবেন । মৃত অথবা জীবিত ! এখন-তখন অবস্থা দেখেই এসেছিলেন । ঢুকেই দেখছেন সকলের খুশি খুশি ভাব । সেবিকা বললে, আশ্চর্য ব্যাপার ! অবস্থার সাংঘাতিক পরিবর্তন । মনেই হচ্ছে না দিদিমণির কোনওকালে অসুখ করেছিল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ জগদম্বা দাসীর অসুখ নিজের শরীরে টেনে নিলেন । সমস্ত রোগলক্ষণ তাঁর নিজের শরীরে ফুটে উঠল । অসহ্য পেটের যন্ত্রণা, আমাশা । তবু আনন্দ, তবু উল্লাস, শাস্ত্র আলোচনা, সঙ্গীত । ন্যাংটা তুলে দিয়ে গেছে অদ্বৈত ভূমিতে । ভৈরবী তন্ত্রের মাধ্যমে এনে দিয়েছেন অষ্টসিদ্ধি । দেহবিযুক্ত হতে একটিমাত্র পলকের প্রয়োজন । রোগ জানুক আর দেহ জানুক, মন তুমি আত্মারাম ।

ভৈরবী কিন্তু খুবই অখুশি । রামকৃষ্ণ তাঁর অবাধ্য সন্তান । অপর দুই শিষ্য, চন্দ্র আর গিরিজা তাদের তন্ত্রলব্ধ সিদ্ধাইয়ের ব্যবহার করছে । চন্দ্র গুটিকাসিদ্ধ । মন্ত্রপূত গুটিকা ধারণ করে অদৃশ্য হতে পারে । অদৃশ্য অবস্থায় যত্রতত্র যেতে পারে । গিরিজারও অসীম ক্ষমতা । ইচ্ছে করলেই পিঠ দিয়ে জ্যোতি বের করতে পারে । সিদ্ধাই থাক । প্রয়োগ করলে সিদ্ধাই এবং সাধক দুজনেরই বিনাশ । রামকৃষ্ণ স্বেচ্ছাচারী । তবে রামকৃষ্ণকে আমি ছাড়ছি না সহজে ।

ঠিক হয়েছে রামকৃষ্ণ কামারপুকুরে যাবেন । শরীর সারাতে । বর্ষা সমাগমে গঙ্গার জল ক্রমশই ঘোলা ও লবণাক্ত হচ্ছে । পেটের রোগীর পক্ষে ক্ষতিকারক । মা যাচ্ছেন না । তিনি গঙ্গাকূলেই জীবনের শেষ দেখতে চান । সঙ্গে যাবেন হৃদয় আর ভৈরবী । মথুরবাবুর স্ত্রী জগদম্বা জানেন, কামারপুকুরে ঠাকুরের সংসার শিবের সংসার । সেখানে গিয়ে বাবার যেন কোনও কষ্ট না হয় । যা যা প্রয়োজন হতে পারে, এমন কী প্রদীপের সলতে পর্যন্ত গুছিয়ে বেঁধেছেঁদে সঙ্গে দিয়ে দিলেন ।

আট বছর পরে কামারপুকুরে আসছেন গদাধর । সবাই উদগ্রীব । কত কথাই শোনা গেছে । এবার চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জনের পালা । সবাই অনুভব করার চেষ্টা করছেন, এই গদাধর সেই গদাধর কি না ! না, কোনও অহঙ্কার নেই । মুখে জগদ্গুরুসুলভ কোনও গাম্ভীর্য নেই । অযাচিত ধর্মোপদেশ করার চেষ্টা নেই, কিন্তু মুখে অদ্ভুত এক দিব্যপ্রভা । হাসি স্বর্গীয় । খুব কাছের মানুষ আবার খুব দূরের মানুষও বটে । আগের মতো কাছে গিয়েও সহজ হতে পারা যায় না । বিষয়-কথা, তুচ্ছ-কথা মনেই আসে না । কাছে গেলে অশান্ত জীবনে কেমন একটা শান্তি নেমে আসে । কামারপুকুর গ্রামে একজন এসেছেন, এই বোধ সর্বত্র । পূর্ণতার উপস্থিতি,

Scanned by CamScanner

কোনও উৎসব ছাড়াই উৎসবের আনন্দ।

সঙ্গে এসেছেন গুরুমাতা ভৈরবী। সকলেরই ভেতরটা ছটফট করছে, চলো, চলো কাছে যাই। ধর্মদাস লাহার বিধবা কন্যা, সরল হৃদয়া, ভক্তিমতী প্রসন্ন, বাল্যসখা, তার ছেলে গয়াবিষ্ণু লাহা, সরল বিশ্বাসী শ্রীনিবাস শাঁখারী, পাইনদের বাড়ির মেয়েরা, ঠাকুরের ভিক্ষামাতা কামারকন্যা ধনী। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু রান্না করে নিয়ে আসছে। গদাধর ভালবাসে খেতে। যারা 'তুই' বলে সম্বোধন করত, তারা একটু অস্বস্তি বোধ করছে।

গ্রামের পথে বেরোলেই ভিড় জমে যাচ্ছে। পাঁচিলে মানুষ, দাওয়ায়, দাওয়ায় মানুষ! রামকৃষ্ণ মাকে ডাকছেন, তোমার কাছে ভক্ত চেয়েছিলাম বলে কী এত ভক্ত দিতে হয় মা! একদিন দ্বিপ্রহরে আহারান্তে রামকৃষ্ণ বসে আছেন। কয়েকজন প্রতিবেশিনী এসেছে। সব গোল হয়ে বসেছেন। ধর্মের নানা প্রসঙ্গ চলেছে। হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবেশ, দেখছেন, তিনি মীনরূপে সচ্চিদানন্দসাগরে পরমানন্দে ভাসছেন।

রামকৃষ্ণের এমন ভাব প্রায়ই হয়। সকলের মধ্যে থাকতে থাকতে হঠাৎ চলে গেলেন কোন সুদূরে। মেয়েরা গ্রাহ্য না করে নিজেদের কথা বলেই চলেছে। একটু গোলও হচ্ছে। মেয়েদের মধ্যে একজন হঠাৎ বললে, 'এই চুপ, চুপ, উনি এখন মীন হয়ে সচ্চিদানন্দসাগরে সাঁতার কাটছেন।' কেউ বিশ্বাস না করলেও সবাই নীরব হল।

রামকৃষ্ণের ভাব চলে যাওয়ার পর সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্যে একজন জিজ্ঞেস করলে, 'ও বলছিল, তুমি না কি সচ্চিদানন্দসাগরে মীন হয়ে সাঁতার কাটছিলে?'

যে মহিলা ওই কথা বলেছিল, রামকৃষ্ণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তুমি ঠিক বলেছ।'

হৃদয়কে ডেকে রামকৃষ্ণ বললেন, 'হৃদে, এই আমার কামারপুকুর। এখানে সবাই সাধক, সবাই সাধিকা।'

রামকৃষ্ণকে না জানিয়েই জয়রামবাটী থেকে সারদাকে আনা হল। বিয়ের পর রামকৃষ্ণকে তিনি একবার মাত্র দেখেছিলেন। তখন তাঁর বয়েস মাত্র সাত। এই দ্বিতীয় দর্শন। বয়েস চোদ্দ। বাড়ন্ত গড়ন। সুঠাম যুবতীই বলা চলে। ভৈরবী প্রমাদ গণলেন। এ তো ভয়ঙ্কর আকর্ষণ, শিশিরভেজা ফুল। সারদা প্রণাম করলেন। ভৈরবী কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'এসো। আমাকে তুমি মা বলবে। আমি তোমার আর এক শাশুড়ি।'

সারদা নিঃশব্দে মাথা নেড়ে চলে গেল। হৃদয় অন্তরালে গিয়ে মামিকে বললে, 'খুব সাবধান। তন্ত্র, মন্ত্রের ব্যাপার! মাথায় সবসময় আগুন জ্বলছে।'

হৃদয়ের কাছে সারদা অনেকটা সহজ হতে পারে। সারদা যখন কুমারী তখন হৃদয় পায়ে পদ্ম দিয়ে পুজো করেছিল। রামকৃষ্ণকে ভয় করে। কখন কোন জগতে আছে বোঝা যায় না। হৃদয় কিন্তু বন্ধুর মতো। সারদা রান্নার জোগাড় করছে।

রামকৃষ্ণ কতই বা খাবেন, কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে। পরিপাটি। ডালে ফোড়ন চাই। মৌরলা মাছের গরগরে ঝাল চাই। বাটি পোস্ত চাই। সুষনি শাক। তবে এসবই হল ইচ্ছা। বেশিরভাগ দিনই শিঙ্গি মাছের ঝোলভাত।

দক্ষিণেশ্বর, আঁড়িয়াদহ গ্রামে ভৈরবীর প্রবল প্রতিপত্তি ছিল। কামারপুকুরে সবাই রামকৃষ্ণকে নিয়েই ব্যস্ত। তুমি কত বড় তান্ত্রিক, কত বড় পরমহংস আমরা জানতে চাই না। তুমি আমাদের কামারপুকুরের একমাত্র গদাধর। তোমার শৈশবলীলায় আমরা যা দেখেছি তাইতেই আমরা তোমার চিরপ্রেমিক। আর নতুন তুমি কী দেখাবে ঠাকুর!

ভৈরবী এই প্রেমের ব্যূহ ভেদ করে রামকৃষ্ণের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব জাহির করতে পারছেন না। যত একা হচ্ছেন, ততই অভিমান, চাপা একটা ক্রোধ। সবচেয়ে রাগ সারদার ওপর। ঘুরছেন ফিরছেন, কান আর চোখ পড়ে আছে রামকৃষ্ণ-সারদার দিকে। কোনও ধর্মীয় বা সাংসারিক প্রসঙ্গে হৃদয় যদি একবার বলেছে, 'যাই, মামাকে জিজ্ঞেস করে আসি!' অমনি ভৈরবীর মুখঝামটা, 'ও আবার বলবে কী? ওর চোখ তো আমিই ফুটিয়েছি!'

হৃদয় সঙ্গে সঙ্গে, ওরে বাপরে! বলে পালিয়ে আসে। হৃদয় প্রথম থেকেই ভৈরবীকে সহ্য করতে পারে না। দক্ষিণেশ্বর হৃদয়ের নিজের এলাকা ছিল না, কামারপুকুর তার নিজের এলাকা। এইবার সে দেখে নেবে। ঈর্ষার ত্রিভুজে নির্বিকার রামকৃষ্ণ। জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম কাজটি তাঁকে করে যেতে হবে, সংসারে, সমাজে নারীর প্রতিষ্ঠা, পরিবারে পরিবারে ধর্মের জাগরণ। হাজার বছর ধরে সন্ন্যাসীর ধর্ম তো তৈরিই হয়ে আছে—বৈরাগ্য, মোক্ষ, মুক্তি। গৃহীদের জন্যে কে কী করেছে! শাস্ত্রে নারীর সমান অধিকার থাকবে না কেন! গৃহ দুর্গে বসে সাধন হবে না কেন? সংসার না থাকলে কোথা থেকে আসবে জটাধারী, তোতাপুরী? সংসার শ্মশান নয়, সংসার তীর্থ। সংসারের যন্ত্রণাই গৃহীকে ঈশ্বরের পথ দেখাবে। নির্মোহ, অন্তর বৈরাগী করবে। এই প্রেম, এই বন্ধনের মধ্যেই আছেন শিব, আছে শান্তি, পরমানন্দ। কেবল শিখতে হবে সেই রূপান্তরের কৌশল। অবিদ্যামায়াকে বিদ্যামায়ায় রূপান্তরের কৌশল।

তোতা বলেছিল, 'রামকিযেন, আমি কিমিয়া বিদ্যা জানি।'

সেটা কী?

'তোমাকে সোনা করে দিতে পারি।'

তোতা! তোমার কিমিয়া বিদ্যা আমি সংসারীর ওপর ফলাব। সোনার মানুষ তৈরির মন্ত্র কানে কানে দিয়ে যাব। তামা তামাই থাক, সোনা সোনা। মানুষগুলো সব সোনার মতো হোক। সোনার পিতা, সোনার মাতা। তবেই না সোনার ছেলে পৃথিবীতে আসবে। পিতা ক্ষুদিরামের পূজার আসনটি চোখে পড়ছে। রঘুবীরের সামনে পাতা। মা দক্ষিণেশ্বরে তবু রামকৃষ্ণ দেখতে পাচ্ছেন, মা পুজোর জোগাড় করছেন। একটু পরেই বাবা এসে আসনে বসবেন। একটুক্ষণের মধ্যেই বিভোর হয়ে যাবেন পূজায়।

হঠাৎ রামকৃষ্ণের মনে হল, কি যেন একটা নেই। একটা গন্ধ!

রামকৃষ্ণ রান্নাঘরের সামনে গিয়ে বললেন, 'কী গো! আজ তোমরা ডাল রাঁধলে না!'

সারদা ঘোমটা টানলেন। সারদার মেজ জা বললেন, 'কখন হয়ে গেছে!'

রামকৃষ্ণ বিস্মিত হয়ে বললেন, 'সে কী ফোড়নের গন্ধ পেলুম না তো!'

সারদা বললে, 'আজ ফোড়ন ছিল না।'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তারপর?'

সারদা বললে, 'দিদি বললে, নেই তো কী হবে! অমনিই করে ফেল।'

রামকৃষ্ণ খুব দুঃখের গলায় বললেন, 'সে কি গো! তোমাদের এই ফোড়নের গন্ধের বেন্নুন খেতে দক্ষিণেশ্বরের মাছের মুড়ো, পায়েসের বাটি ফেলে এলুম, তোমরা সেইটাই বাদ দিয়ে দিলে! এক পয়সার পাঁচফোড়ন তোমরা আনিয়ে নিতে পারলে না। যাতে যা লাগে তা বাদ দিলে চলে!'

মেজ বউদি পাঁচফোড়ন আনিয়ে ডালে ফোড়ন দিলেন। সুগন্ধে গৃহ আমোদিত। রামকৃষ্ণ গন্ধ নিতে নিতে বললেন, 'বাঃ, এতক্ষণে হল!'

দুপুরে আহারে বসেছেন দুজনে। রামকৃষ্ণ আর হৃদয়। ভৈরবী নিজের রান্না নিজেই করেন, অন্যের করা পছন্দ হয় না। খেতে খেতে খুব মজা করছেন। একটা তরকারি মুখে দিয়ে বলছেন, 'ও হৃদু, এটা যে রেঁধেছে সে রামদাস বদ্যি।'

মেজ বউদির রান্নার খুব নামডাক। ভীষণ ভাল রাঁধেন। আর রামদাস বদ্যি ডাকসাইটে চিকিৎসক। হৃদয় তখনই কোনও উত্তর করল না।

রামকৃষ্ণ আর একটি তরকারি মুখে তুলে বললেন, 'ওরে হৃদু, এটা শ্রীনাথ সেন।'

ইচ্ছে করেই বললেন। জানেন, ওটি সারদার রান্না। শ্রীনাথ সেন হাতুড়ে ডাক্তার।

এইবার হৃদয় মুখ খুলল, 'তা বটে, তবে জেনে রাখো, তোমার হাতুড়ে বদ্যিই ভাল। সবসময় পাবে, তোমার হাত টিপতে, গা টিপতে। রামদাস বদ্যির ভিজিট জানো? ষোলো টাকা! লোকে আগে যায় শ্রীনাথের কাছে। হাতুড়েই ভাল।'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তা বটে, তা বটে।'

ভৈরবী অনেকক্ষণ ধরে একটা কিছু রাঁধছিলেন। সেইটি নিয়ে এসে বললেন, 'এইবার এইটা একটু চেখে দেখ।'

পাতে, পাতে দিলেন। একটু মুখে দিয়েই রামকৃষ্ণের মনে হল ব্রহ্মতালু ফেটে যাবে, এত ঝাল। ঘাম বেরিয়ে গেল।

হৃদয় লাফ মেরে বললে, 'এটা তরকারি না আগুন!'

ভৈরবী বললেন, 'কই, রামকৃষ্ণ তো কিছু বলছে না। মুখটা কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে!'

'মামার মুখ উজ্জ্বল হয়েছে ঝালে।'

'যাঃ, তুই আমাকে দেখতে পারিস না, তাই। যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা।'

একটু পরেই মেয়েরা সব খেতে বসেছেন। ভৈরবী সকলকেই একটু একটু দিলেন। সারদাকে বললেন, 'বলো তো মেয়ে কেমন হয়েছে?' সারদা ভয়ে ভয়ে বললে, 'খুব ভাল হয়েছে মা।' নাকের জল টানতে টানতে কথা কয়টি বলতে পারল কোনওরকমে।

স্বামী সম্পর্কে যা শুনেছিল সারদা, তা ভুল। যখন শাসন করেন তখনও কত স্নেহ! সব কথাই বুঝিয়ে দেন, ভাল কোনটা, মন্দ কোনটা। উচিত কোনটা, অনুচিত কোনটা! অন্য সময়ে একেবারে বালক। বালিকা সারদার

Scanned by CamScanner

খেলার জুটি যেন। পুতুল খেলা যায়, পুণ্যিপুকুর করা যায়। দিগন্তবিস্তারি মাঠে দৌড়নো যায় দুজনে। বর্ষার জলে কাগজের নৌকো ভাসানো যায়। কখনও কালী, কখনও কৃষ্ণ, কখনও শ্রীমতী, কখনও তুরীয়। কাছে গেলে কেমন একটা আনন্দ হয়। যখন স্পর্শ করেন শীতল একটা শান্তি নেমে আসে। সারারাত কত গল্প। একটাও বিষয়ের কথা নেই, দেহবোধের কথা নেই। কেবল ভগবানের কথা। আর মাঝে মাঝেই সেই ভাবে চলে যাওয়া, যাকে বলে সমাধি।

সারদা শুনেছিল, যারা সাধু হয় তারা স্ত্রীকে ত্যাগ করে। মহাপ্রভু করেছিলেন, কই তার স্বামী তো তন্ত্রসাধক, পরমহংস, স্ত্রীকে ত্যাগ করলেন না তো, বরং এমনভাবে গ্রহণ করলেন প্রেম দিয়ে, স্নেহ দিয়ে যা একমাত্র ভগবানই পারেন। সারারাত কত কথা, গল্প, গান! সব কথাই ভগবানের কথা। তারই মাঝে রঙ্গরসিকতা। কখনও পরেরদিন কী রান্না হবে তার কথা, 'কাল একটা পাঁচমিশুলি ডাল কোরো, এমন সম্বরা দেবে যেন শুয়োর গোঙায়।'

সারদা ভাবে, এ কেমন মানুষ! কোনও দুঃখ নেই, নিরানন্দ নেই, সদানন্দ। পাঁচ বছরের ছেলের সঙ্গেই বা কী, আর বুড়োর সঙ্গেই বা কী—সকলের সঙ্গে মিশেই আনন্দে আছেন। মাঝে, মাঝে আবার বালকের মতো খাই খাই। এটা খাই, সেটা খাই। স্বামী, বন্ধু, সন্তান, গুরু, একাধারে সব।

একদিন রাতে হঠাৎ গুরুভাব এল, 'শোনো, দুটো দিকই তোমাকে রাখতে হবে। চরিত্র, ধর্ম, সংসার। মানুষ আসে সংসারে, থাকে সংসারে, সংসার থেকেই চলে যায়। সংসারকে করতে হবে শিবের সংসার। সত্য আর সেবাই ধর্ম। কোনওদিকে শিথিল হলে চলবে না। দৈনন্দিন গৃহস্থালি কর্ম, দেব-দ্বিজ-অতিথিসেবা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, কনিষ্ঠদের প্রতি স্নেহপরায়ণতা, পরিবারের সেবায় আত্মসমর্পণ, এ সবই ধর্মের অঙ্গ। শোনো সারদা, যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন—এটা মেনে চলবে। তোমাকে আমি সব শেখাব, কেমন করে রান্নাঘরে কৌটো সাজাতে হয়, নৌকোয় বা গাড়িতে নিজের মালপত্র সম্পর্কে কীভাবে সতর্ক থাকতে হয়, এমনকী প্রদীপের পলতেটি কেমন করে রাখতে হয়। সবার ওপরে বৈরাগ্য আর ভগবদ্‌ভক্তি। শেয়াল কুকুরের মতো কতকগুলো কাচ্চা-বাচ্চা বিইয়ে কী হবে! ওসব না হলে আছ ঠাকুরনটি, থাকবেও ঠাকুরনটি।'

ঘুমিয়ে পড়লেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মধ্যরাতের চাঁদের আলো প্রশান্ত মুখের ওপর এসে পড়েছে, যেন ঈশ্বরের আলতো হাত। সারদা দেখছেন, এত সুন্দর! পিঠ ছাপানো চুল এলো করে সারদা মাথা রাখল নিজের বালিশে। সারাদিনের পরিশ্রম। সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম। এইবার রামকৃষ্ণ দেখছেন, কালো সরোবরে একটি শ্যাম পদ্ম, শেষরাতের চাঁদের আলো। ঝিনুকের মতো কপালে একটি টোকা মেরে বললেন, 'কি সই! ঘুমোলে! প্রেমের কথা কারে কই!'

আজ সকাল থেকেই ব্রাহ্মণী ভৈরবী অতিশয় ক্ষিপ্ত। যাকে তাকে যা-তা বলছেন। চিৎকার করছেন। কাজের ভুল ধরছেন। সারদাকে অন্তত তিনবার বললেন, লজ্জাই নারীর ভূষণ। সারদা ভয়ে রান্নাঘরে মেজদির আড়ালে লুকোলেন। অবশেষে ভৈরবী ধরলেন রামকৃষ্ণকে। কর্কশ গলায় বললেন, 'তোমার পতন হয়েছে।'

রামকৃষ্ণ রহস্য করে বললেন, 'কেন, আমি তো তোমার সামনে খাড়া দাঁড়িয়ে আছি!'

ভৈরবীর ক্রোধ আরও বাড়ল, 'দেহের পতন নয়, মনের পতন। তোমার মনের আঁট নষ্ট করে দিয়েছে জয়রামবাটীর ওই মেয়েটা। ছিঃ ছিঃ রামকৃষ্ণ! এতটা পথ এসে শেষে ব্রহ্মচর্য হারাবে? হারিয়ে ফেলেছ কি না তাই বা কে জানে! বন্ধ ঘরে সারারাত গুজুর গুজুর, ফুসুর ফুসুর। সারা দিন মেয়েদের দঙ্গলে!'

রামকৃষ্ণ শান্ত গলায় বললেন, 'সারদার চেয়ে যুবতী মেয়ের কোলে তুমি আমাকে বসিয়েছ, নর নারীর মৈথুন দেখিয়েছ। তখন তুমি কী দেখেছিলে, কী বলেছিলে?'

'তখন তুমি ছিলে সাধক, এখন তুমি গৃহী। যত শেয়ানাই হও, কাজলের ঘরে থাকলে গায়ে কালি লাগবেই।'

'ঠিকই বলেছ আমি মা কালীর ঘরেই থাকি। আমার গর্ভধারিণী মা, মা ভবতারিণী আর সারদা সব এক। তোতাকে বলেছিলুম আমার বউ আছে। তোতা বলেছিল, ভালই তো, তোমার অদ্বৈতজ্ঞান তুমি পরীক্ষা করে নিতে পারবে। আত্মায় লিঙ্গভেদ নেই। যে নির্বিকল্পে উঠেছে সে পরমহংস।

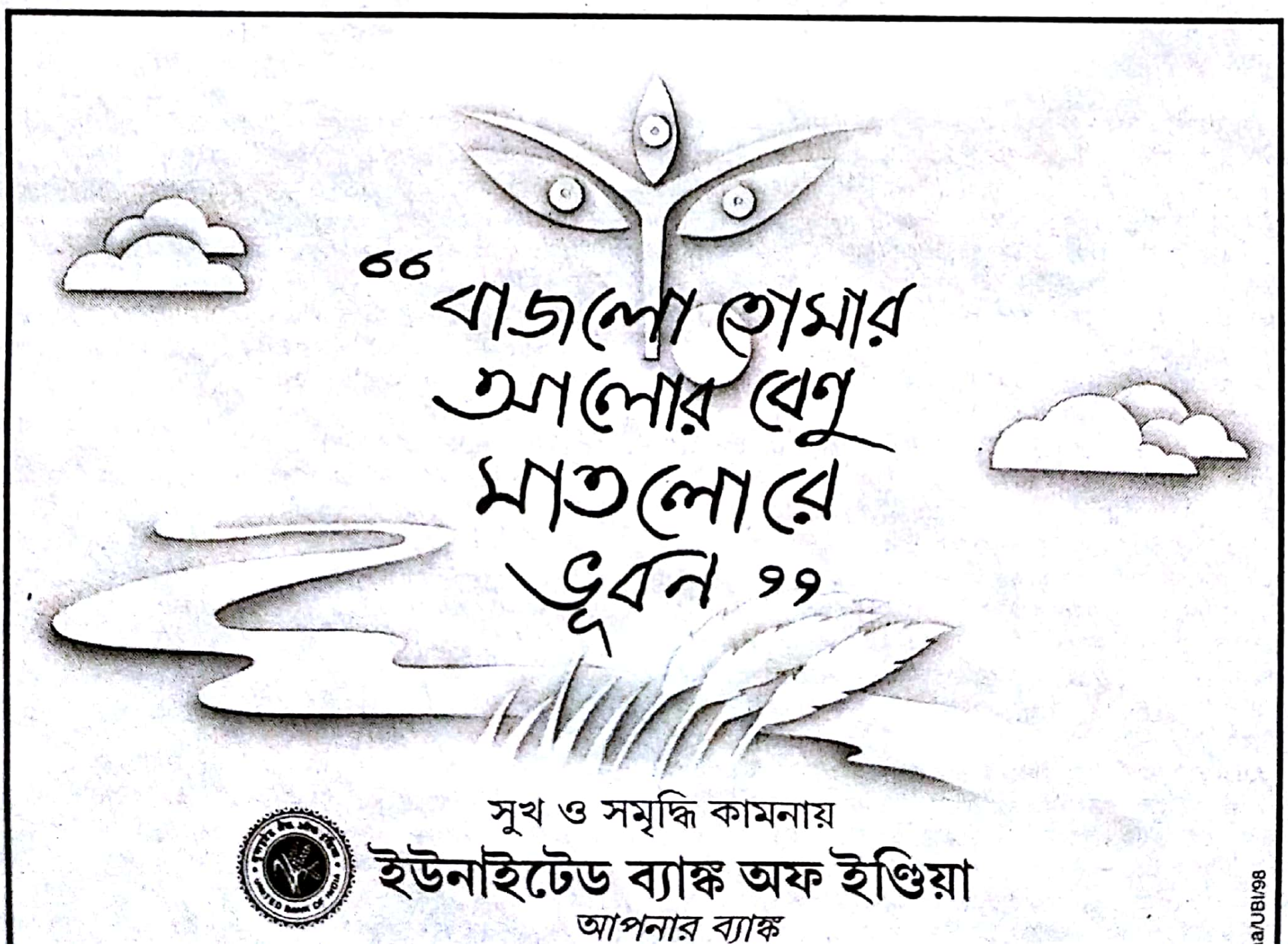

Scanned by CamScanner

ভাসে কিন্তু ডোবে না। পালকের জল পলকে ঝরে যায়। রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ। সারদা আমার পরমহংসত্বের পরীক্ষা। তুমি বিদুষী, ভক্তিমতী, সিদ্ধসাধিকা, আমার গুরু তুমি, তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি ভালবাসি, সেই সম্পর্কটা তুমি নষ্ট করতে চাইছ। তোমার বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়েছে।'

ভৈরবী নীরবে প্রস্থান করলেন।

দুপুর নাগাদ চিনু শাঁখারী এলেন পরমভক্ত। ঠাকুরের অকৃত্রিম সুহৃদ। তিনি রঘুবীরের প্রসাদ পেলেন। তারপর গ্রামের সামাজিক আচার মেনে নিজের এঁটো পাতা তুলে জায়গাটি পরিষ্কার করতে গেলেন। কোথা থেকে ভৈরবী এসে আদেশের গলায় বললেন, 'থাক,·থাক ওসব তোমাকে করতে হবে না, আমরাই তুলে নেবো।'

চিনু ইতস্তত করছেন, ভাবছেন, এটা তো নিয়ম নয়। ভৈরবী বার বার বাধা দেওয়ায় বিব্রত চিনু পালিয়ে বাঁচলেন। এঁটো পরিষ্কার করার জন্যে ভৈরবী এগিয়ে গেলেন। ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়েরা সব দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা, 'এ কী করছেন, এ কী করছেন,' বলে শোরগোল তুললেন। ব্রাহ্মণ হয়ে নীচ জাতির উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করা ভয়ঙ্কর এক সামাজিক অপরাধ। গোলমাল শুনে হৃদয় ছুটে এল।

কড়া গলায় বললে, 'সরে যাও। তুমি এঁটো পাতা ছোঁবে না।'

ভৈরবী জেদী গলায় বললেন, 'আমি জাত মানি না। বৈষ্ণবের আবার জাত কী রে।'

'এটা তোমার দক্ষিণেশ্বর নয়, কামারপুকুর, এখানে সবাই জাত মানে।'

'তোর জাতের মুখে আগুন।'

ভৈরবী পাতা তোলার জন্যে নিচু হচ্ছেন।

হৃদয় বললে, 'তুমি ছুঁয়ে দেখো, তোমাকে ঘরে থাকতে দোবো না। দূর করে দোবো। আমাদের শান্তির সংসারে কোথা থেকে এক অশান্তি এসে জুটেছে।'

ভৈরবী বললেন, 'তাড়া না! আমার থাকার জায়গার অভাব? ওরে শীতলার ঘরে মনসা শোবে।'

হৃদয় ক্ষিপ্ত হয়ে বললে, 'দেখি, শীতলার ঘরে মনসা কী করে শোয়।'

হৃদয়ের পায়ের কাছে একটা মাটির খুরি পড়েছিল। ভৈরবীর দিকে সজোরে সেইটা ছুড়ে দিল। সেটা গিয়ে লাগল ভৈরবীর ডান কানে। তিনি বসে পড়লেন। ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে। ভৈরবী কাঁদছেন। হৃদয়ের আচরণে সবাই হতবাক। রমণী তায় সাধিকা। রামকৃষ্ণের গুরু! তাঁকে এই ভাবে আঘাত করা যায়!

রামকৃষ্ণ এলেন ঘটনাস্থলে, 'এটা তুই কী করলি হৃদে! আমাদের পরিবারের কেউ এমন নীচ কাজ করতে পারে! তুই এই ভক্তিমতী সাধিকার রক্তপাত করলি! বঙ্গদেশে এমন বিদুষী তান্ত্রিক আর আছেন! ইনি আমার জন্যে কি না করেছেন! এইবার গ্রামের লোক সব ছুটে আসুক। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় পরিবারের মান সম্মান ধুলোয় লুটোক! হৃদে! এর ফল তোকে একদিন পেতেই হবে।'

রামকৃষ্ণর কথায় ভৈরবী শান্ত হলেন। সারাটা দুপুর বাড়িটা থমথমে হয়ে রইল। সারদার চোখে জল। অনুতপ্ত হৃদয়কে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। হয়তো শিহড়ে নিজের বাড়িতেই চলে গেল। ভৈরবী জল স্পর্শ করলেন না। সারাটা দিন বসে রইলেন গাছতলায়।

রামকৃষ্ণের মুখে চিন্তার ছায়া। সর্বাধিক আঘাত তিনিই পেয়েছেন। ইদানীং তাঁর স্পর্শকাতরতা এতটাই বেড়েছে, ঘাসে পা দিতে কুণ্ঠা হয়। ঘাসের লাগবে। ফুল, বেলপাতা ছিঁড়তে পারেন না। মাঝ গঙ্গায় এক মাঝি আর এক মাঝির পিঠে চড় মারল, সেই আঘাত লাগল নিজের পিঠে। পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে উঠল। ভৈরবীকে কত যত্নে নিয়ে এলেন, তার এই অনাদর। সংসার সন্নাসীর স্থান নয়। সর্বত্র 'আমি'র সংঘর্ষ। হৃদয়ের অহঙ্কার, মুরুব্বিয়ানা এতটাই বেড়েছে, যে নারীর গায়ে হাত তুলতে সাহস পায়! কতবার সে কৃষ্ণকিশোরের কথা শুনেছে! আচারী ব্রাহ্মণ, ভাঙ্গিকে বললে, 'বল, শিব, তাহলেই শুদ্ধ হয়ে যাবি।' তখন তার হাতে জল খেলে। মহাপ্রভুর নামে সব নাচে, অথচ জাতিভেদ। এই ধর্মভেদ আর জাতিভেদের বিরুদ্ধে তোমার কিছু করার আছে রামকৃষ্ণ? আছে। যত মত তত পথ আমি দেখেছি। নিজে করে দেখেছি, এইবার দেখাব, কর্মভেদ আছে, জাতিভেদ বলে কিছু নেই। ভৈরবীর রক্তপাতে নতুন শাস্ত্র লেখা হবে।

কয়েক দিন সব থমথমে। উদাসীন ভৈরবী একান্তে অতীত জোড়া লাগাবার চেষ্টা করছেন। সেই দক্ষিণেশ্বর, বকুলতলার ঘাট, হৃদয়ের আহ্বান, রামকৃষ্ণ সন্দর্শন, দেবমণ্ডলের ঘাট, গভীর নিশীথে একে একে চৌষট্টি তন্ত্রের সাধন, রামকৃষ্ণে শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন, ধর্মসভা। তাহলে! এ মোহ কেন! রামকৃষ্ণকে দেখে রঘুবীর শিলা বিসর্জন দিয়েছিলুম। রামকৃষ্ণ আমার জীবন্ত বিগ্রহ। তাকে আমি অনুগ্রহ করব কী! এ তো তারই অনুগ্রহ! সংসার আবর্তে মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলুম, সর্বত্র নিজের অধিকার খাটাতে চেয়েছিলুম সন্ন্যাস ধর্ম ভুলে। বিপথ থেকে পথে তুলে দিলেন গুরুরূপী শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ। মনে করিয়ে দিলেন, রমতা সাধু বহতা পানি, একই জায়গায় আটকে থেকো না। ভেসে এসেছিলে, ভেসে চলে যাও। তোমার রামকৃষ্ণও আবদ্ধ থাকবে না। সামনে তার অনন্ত ধর্মের পথ।

কামারপুকুরের সকাল। ভৈরবী প্রচুর ফুল তুলে, নিজের হাতে বড়, ছোট, অনেক মালা গাঁথলেন। চন্দন ঘষলেন। রামকৃষ্ণ মুখ তুলে তাকালেন, 'কি গো?'

ভৈরবীর মুখ বিষণ্ণ সকালের মতো, 'তোমাকে আজ সাজাব। অনুমতি দাও।'

ভৈরবী খুব কাছে, কিন্তু বহু দূরে। বন্ধন খুলে গেছে। নহবতের একই সানাই, একই ফুঁ, রাগিণী ভিন্ন।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'চলে যাচ্ছ বুঝি!'

ভৈরবী একে একে সব মালায় রামকৃষ্ণকে সাজালেন। চন্দন পরালেন। তাঁর আয়ত দুই চোখে টলটলে জল। তান্ত্রিক কিন্তু প্রেমিক যে!

ভৈরবী বললেন, 'একবার উঠে দাঁড়াবে, আমার সোনার গৌরাঙ্গ!'

রামকৃষ্ণ আবার বললেন, 'তুমি চললে?'

দু গাল বেয়ে জল পড়ছে ভৈরবীর, স্রোতে ভাসতে ভাসতে কাছে আসা, আবার দূরে চলে যাওয়া। সময়ের নৃশংস স্রোত। ভৈরবী বললেন, 'তোমাকে তো আমি বাইরে প্রণাম করতে পারব না, অন্তরে প্রণাম করছি। তোমরা সবাই আমাকে ক্ষমা কোরো। অনেক দুঃখ দিয়েছি, এবার সব আনন্দে থাকো। আমাকে তাড়াতে হয় না, আমি নিজে আসি, আবার নিজেই চলে যাই। যেমন তোমার জীবনে এসেছিলুম একদিন। কে এল, কোথা থেকে এল, যেমন জানো না, কে গেল, কোথায় গেল, তাও জানবে না।'

ভৈরবী তাঁর ঝোলাঝুলি কাঁধে তুলে নিলেন। সকলের দিকে তাকালেন একবার। কেউ কোনও বাধা দিল না। কারও মুখে কোনও কথা নেই। রামকৃষ্ণ নিঃশব্দে একটি মালা তাঁর হাতে দিলেন। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলেন একপলক। ছায়া সরে গেল। উড়ে গেল তন্ত্রের ধুলো। ক্ষণকালের জন্যে রামকৃষ্ণের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হল। হলধারী বলেছিলেন, 'ওরে, একে বলে গলিত হস্ত। কিছুই ধরে রাখতে পারবি না, তাই তর্পণের জলও আঙুল গলে পড়ে যায়।'

রামকৃষ্ণ ধরতে পারেন না, ধরাতে পারেন, বৈরাগ্যের আগুন। সেই আগুন, যে আগুনে বিষয় ভস্মীভূত হয়। সব অহঙ্কার ছাই হয়ে যায়। দূরের পথ খুলে যায়। সেই পথে!....

Scanned by CamScanner